সূচি

গোমতীর উপাখ্যান	৯
কামী মাইখুলুম উপাখ্যান	২৮
শ্বেত হস্তীর উপাখ্যান	৩২
অপূর্ব বিচার	৩৮
সুখী রায় ও কুসুপ চান	৪৪
কওয়াই কেন্দারায়	৫০
কলাবতী কন্যা	৫৮
চোন্তাইয়ের চার আনা কামাই	৬৬
কুনোব্যাঙের শাস্তি	৭১
ট্রং কুমারের কাণ্ড	৮১
পাঁজী শেয়ালের শাস্তি	৮৫
ওয়াক্সা রাজা	৯০
জুয়াংফা	৯৬
তিন মাথার কাহিনী	১০৩
রাজা মেঘবর্ণের দান	১০৬
নাউই	১১২
কর্মলেখা	১২১
দাবেং পণ্ডিতের আক্কেল সেলামী	১২৩
পুণ্য ফল	১২৬
মদ ও ভূতের কাহিনী	১৩১
মুকুট কাহিনী	১৩৬
শক্তি পরীক্ষা	১৩৯
ঘুঘু পাখির বংশ বিস্তার কাহিনী	১৪৩
ভাগ্য পরীক্ষা	১৪৫
বীর জ্যোতিষী	১৫৪
ছাতিম গাছ	১৫৭

গোমতীর উপাখ্যান

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। তখন নাকি সত্যযুগ। সে যুগে ত্রিপুরা রাজ্যে পরাচি নামে এক মহা প্রতাপশালী রাজা রাজত্ব করতেন। রাজ্যের উত্তর প্রান্তে ছিল লংতরাই পর্বত। পর্বতের পাদদেশে ছিলো 'কাইস্কক' নামে একটি বিশাল গ্রাম। এই গ্রামে বাস করতো দাংগুই চোন্তাই। চোন্তাই মানে পুরোহিত। তার ছিলো দুই মেয়ে, গোমতী আর কসমতি। গোমতী বড় আর কসমতি ছোট। গোমতী টকটকে গৌরবর্ণ, অপরদিকে কসমতি গাঢ় শ্যামলা বর্ণ। রূপে গুণে দুইবোন ছিলো অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী হলে কী হবে? তাদের মা ছিলো না। কস্‌মতিকে প্রসবকালে তাদের মা মারা গিয়েছিলো। পিতার লালনে পালনে পিঠোপিঠি দুইবোন বড় হয়েছে।

গোমতী ও কসমতি একটুখানি বড় হয়ে উঠতেই তাদের বাবা দাংগুই চোন্তাই ফি বছর কেবল জুম কেটে পুড়িয়ে দেয়। তারপর গোমতি আর কসমতি লেগে যায় জুমের কাজে। দাংগুই চোন্তাই তেমন কোনো কাজ করে না। তার কাজের মধ্যে ছিলো লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পূজো অর্চ্চনা করা। বিশাল গ্রাম। অতবড় গ্রামে পুরুতগিরি করাটাও অবশ্য চাট্টিখানি কথা নয়। আজ রোয়াজা বাড়ি, কাল কার্ব্বারী বাড়ি, পরশু তাইমাং বাড়ি, তারপরে, চৌধুরী বাড়ি, মুড়াসিং বাড়ি, রিয়াংবাড়ি ধাবেংবাড়ি, পোমাং বাড়ি, দেওয়ান বাড়ি আর নারানদের বাড়ীর পূজো তো প্রতিদিন লেগেই আছে। এভাবে লোকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দাংগুই চোন্তাই পূজো অর্চনা করে আর এতে দানদক্ষিণা বাবদ যা পায় তা-ই দিয়ে সংসার চালায়। দুই মেয়ের দিকে একটুখানি সে নজর দেবে তাও সময় পায়না দাংগুই চোন্তাই।

এদিকে গোমতী আর কসমতি দুইবোনে মিলেমিশে ঘরের কাজও করে আর জুম ক্ষেতের কাজও করে তাদের জুমে কোনো গাইরিং (টং ঘর) নেই। রোদ বৃষ্টির দিনে সারাক্ষণ খোলা আকাশের নীচে থাকতে হয় নতুবা কোনো গাছের তলায় বসে থাকতে হয়। রোদের দিনে উত্তপ্ত হাওয়ায় শরীর পুড়ে কয়লা হয় আর বৃষ্টি বাদলের দিনে চুরচুরে ভিজে। লোচায় লোচায় (অবিরাম) বৃষ্টি। এমনি শাওনের এক বৃষ্টির দিনে বড়বোন গোমতী বলে উঠে – আর কতো সহ্য করা

যায়। এ মুহূর্তে কেউ যদি গাইরিং তুলে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিতো তা হলে সে যক্ষ-রক্ষ, দৈত্য দানব যা-ই হোক তাকেই বিয়ে করতাম। কিন্তু আমার সে পোড়া কপাল তাতেই হবেই বা কী ?

এখন হলো কী। জুমের ক্ষেতের কাছেই ছিলো একটি পাহাড়। ওই পাহাড়ের গুহায় ছিলো বনদেবতা। গোমতীর প্রতিজ্ঞার কথা বনদেবতা শুনলো। আর শুনলো সে বনের বসবাসকারী পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা ছড়া ঝর্ণা সবাই। গোমতীর রূপ দেখে বনদেবতা একেতো মুগ্ধ হয়েছিলো। তার উপর প্রতিজ্ঞার কথা শুনে আর চুপ করে থাকতে পারলো না। নিজের যাদুমন্ত্র বলে জুম ক্ষেতের অদূরে একটা সুন্দর গাইরিং তৈরী করে ফেললো। তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিলো। তারপর বিরাট এক অজগর সাপের রূপ ধরে কুন্ডলী পাকিয়ে গাইরিংয়ের এক কোণায় শুয়ে রইলো।

হঠাৎ জুমের অদূরে একটা গাইরিং দেখতে পেয়ে দু'বোন খুবই অবাক হলো। ব্যাপার কী। কই, আগে তো এখানে কোন গাইরিং ছিলো না। লোচায় লোচায় বৃষ্টি। শীতে কাঁপছে দু'বোন। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে গোমতী ছোটবোন কসমতির হাত ধরে বললো – কসমতি, আর তো সহ্য হয় না। চল, ওই গাইরিংয়ে গিয়ে উঠি। কপালে যাই ঘটে ঘটুক। এ বলে দু'বোন ভয়ে ভয়ে গাইরিংয়ে গিয়ে উঠলো। গনগনে আগুন, কিছু শুকনা লাকড়ী, চারিদিকে বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখে দু'বোনে আগুন পোহাতে বসলো আর তাদের ভিজে কাপড় আগুনে শুকোতে লাগলো।

দু'বোন আরাম করে আগুন পোহালো। কসমতি শীষ দিয়ে গুনগুনিয়ে গান ধরলো কিছুক্ষণ। অমনি তার নজরে পড়লো গাইরিং এর কোণায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে বিরাট এক অজগর সাপ। দু'বোনে অজগর সাপ দেখে ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো। তাদের চেঁচামেচিতে অজগর সাপটা একটুখানি নড়েচড়ে মানুষের গলায় বলে উঠলো – ওহে গোমতী সুন্দরী। তোমরা ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না। এ গাইরিং আমিই তৈরী করেছি। আগুনও করে দিয়েছি শুধু তোমাদের জন্যে। আমি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছি। এখন তুমি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা রাখলেই হয়।

এবার গোমতী পড়লো মহাফ্যাসাদে। একে তো সত্য যুগ বলে কথা। তার উপর সে একান্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কি আর করবে। কাজেই অজগর সাপটাকে সে বরণ করে নিলো স্বামীরূপে। কিন্তু কসমতি কিছুতেই তাতে সায় দিতে পারলো না। গন্ধর্ব মতে গোমতীর সাথে অজগর সাপের বিয়ে হলো। দিনের বেলায় অজগর সাপটা

চলে যায় তার গুহায় আর রাতের বেলায় ফিরে আসে গাইরিংয়ে। সঙ্গে করে নিয়ে আসে চাল ডাল নুন শুটকী তরিতরকারী মায় কাপড়চোপড়। কিন্তু তাতে কী, কসমতি কিছুতেই সাহসে কুলাতে পারে না অজগর সাপের কাছে ঘেযতে। অথচ বড় বোন গোমতী সাপটাকে না দেখলে দু'দণ্ড স্থির থাকতে পারে না।

কসমতির বেহাল অবস্থা দেখে গোমতী বললে – কসমতি, আমার অদৃষ্টের লিখন। কী করা যায় বলো। জুম ক্ষেতের কাজ আমি একা সামলাবো। তুমি বরং গাইরিংয়ে থেকো। রাঁধাবাড়া করো। জল তুলো। আর তোমার বোনাইকে ডেকে একবেলা খেতে দিও। কী আর করা।

কসমতি রাঁধে বাড়ে আর বোনাইকে খেতে ডাকে।

বোনাই গো বোনাই
বোনাই খেতে আয়।
কলা পাতায় মোচা ভাত
সুবাস বয়ে যায়॥
লাউয়ের খোলায় শীতল পানি
প্রাণ জুড়িয়ে যায়।
বোনাই খেতে আয়॥

এই বলে গাইরিংয়ের মেঝেতে ভাত পানি রেখে দিয়ে কসমতি ভয়ে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে গাইরিং ছাদে গিয়ে লুকিয়ে থাকতো। আর অজগর সাপটি শ্যালিকার মধুর কণ্ঠের ডাক শুনে গুহা থেকে বেরিয়ে গাইরিং এ খেতে আসতো। সাপটা লুটেপুটে খেয়ে চলে গেলে পর কসমতি ছাদ থেকে নীচে নেমে এসে বড় বোন গোমতীকে ডাকতো খাবারের জন্যে।

এমনি করে দিন কাটে। শাওন গেলো, ভাদর গেলো। এলো আশ্বিন মাস। ততদিনে ভয়ে ভাবনায় কসমতির বুকে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। জুমের ধান গাইরিং এ তোলা হয়েছে। ফসলের প্রাচুর্য্যে ধরনীতে সাজ সাজ রব উঠেছে। লোকালয়ের পরিবেশ ক্রমে ক্রমে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এমনি সময়ে দাংগুই চোন্তাই পুরুতগিরির কাজের ফাঁকে জুমে এসে হাজির হলো মেয়ে দুটোকে দেখতে। মেয়ে দুটোকে দেখে বললে– হ্যাঁরে, তোরা অত শুকিয়ে গেলি কেন রে। কাজের চাপ বেশী ছিল বুঝি ?

গোমতী বলে উঠে – কই না তো। আমরা তো ঠিকই আছি। গোমতী তার অজগর স্বামীর কথা বাবাকে কিছুই বললো না। কিন্তু কসমতি ? সে এক সময় চুপিসারে বাবাকে সব কথা খুলে বললো। সে এও বললো যে, অজগর সাপের

ভয়ে সে খেতে পারে না। রাতে ঘুম হয় না।

সব শুনে দাংগুই পুরোহিত মেয়েকে শান্তনা দিয়ে বলে – ও, এই ব্যাপার। বেশ তো ভারি জামাই হয়েছে আমার। আচ্ছা করে জামাই হবার সাধ মিটিয়ে দিচ্ছি। তবে তুই গোমতীকে কিছুতেই জানতে দিবি না। সামনের পূর্ণিমা লগ্নে আমি সব ব্যবস্থা করছি। এই বলে দাংগুই চোন্তাই জুম ছেড়ে চলে গেলো।

কিছুদিন পর এলো সেই পূর্ণিমা লগ্ন। সারা গ্রামের লোকজন উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো। কামী মাইখুলুম পূজো হবে প্রতিটি গৃহে। গ্রামের ধান নারানের বাড়িতে হবে সবচেয়ে বড় আয়োজন। গোমতীকে যেতে হবে নারানের বাড়িতে পাট রাঁধুনী হয়ে। পাহাড়ের গুহায় গিয়ে অজগর স্বামীর কাছে অনুমতি চাইতে গেলো গোমতী। হাজার হোক স্বামী বলে কথা। অজগর স্বামী গোমতীকে মূল্যবান বস্ত্র ও নানা অলংকার দিয়ে বললে – প্রিয়ে, তুমি যাও। তবে একটা কথা। যখন তুমি দেখবে তোমার দেহের পরিহিত বস্ত্র ও অলংকার আপনা আপনি খসে মাটিতে পড়ে গেছে, তখন তুমি ভাববে আমার বিপদ হয়েছে। তখন তুমি আর দেরী না করে চলে আসবে। অজগর স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গোমতী চলে গেলো নারানের বাড়িতে। যাবার সময় কসমতিকে বলে গেলো যেন সময় হলে তার বোনাইকে ডেকে খেতে দেয়।

গোমতী চলে যাবার পর দাংগুই চোন্তাই তার পুরুতগিরি সেরে চলে এলো জুমে। এসেই কসমতিকে বললো – এবার ডাক দিকি আমার সাধের জামাইকে। রোজ যেমন করে ডাকিস ঠিক তেমনি করে ডাকবি কিন্তু। ব্যাটা যেন কিছুতেই টের না পায়। বাপের আদেশ পেয়ে কসমতি বললে – বাবা, এইতো কিছুক্ষণ আগে তাকে ডেকে এনে খাইয়ে দিয়েছি। এখন আবার ডাকলে আসবে বলে তো মনে হয় না। দাংগুই চোন্তাই নাছোড়বান্দা। অজগর ব্যাটাকে তার চাইই-চাই। অগত্যা কসমতি কী আর করবে ফের ডাকতে হলো অজগর সাপটাকে। এদিকে দাংগুই চোন্তাই একটা ধারালো তরবারি হাতে নিয়ে লুকিয়ে রইলো সিঁড়ির মুখে। কসমতি সুর করে ডাকে –

বোনাইগো বোনাই
বোনাই খেতে আয়।
কলা পাতায় মোচা ভাত
সুবাস বয়ে যায় ॥
লাউয়ের খোলায় শীতল পানি
প্রাণ জুড়িয়ে যায়
বোনাই খেতে আয় ॥

কসমতি একবার ডেকে চুপ করে রইলো। কিন্তু অজগর সাপটি এক ডাকে এলো না। বাপ বললে আবার ডাক। কসমতি আবার ডাকলো। না দ্বিতীয়বার ডাকেও অজগর সাপটি এলোনা। অধৈর্য্য হয়ে উঠলো দাংগুই চোন্তাই। কসমতিকে গালি দিয়ে বললে যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ ডাকতে থাকবি। ব্যাটাকে আজ আমার চাইই চাই। তৃতীয় বারের মতো কসমতি কান্না জড়িত কণ্ঠে – অজগর সাপটাকে ডাকলো। কসমতির কান্না জড়িতকণ্ঠ শুনে আর থাকতে পারলো না। গুহা ছেড়ে ধীরে ধীরে পাহাড় বেয়ে উঠে এলো অজগর সাপটা। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠলো গাইরিংয়ের উপর। আর যায় কোথায়। দাংগুই চোন্তাই বিদ্যুৎ গতিতে এলোপাতারি কোপ বসিয়ে দিলো অজগর সাপের উপর। একখণ্ড নয়, দু'খণ্ড নয়। একেবারে সাতখণ্ডে টুকরা টুকরা করে ফেললো। তারপর বাঁশের কুটুরীতে ভরে ফেলে দিয়ে এলো এক ঝর্ণায়।

এদিকে হলো কী। নারানের বাড়িতে তখন খাওয়া দাওয়ার পর্ব প্রায় চুকিয়ে গেছে। পাট রাঁধুনী গোমতী সবে খেতে বসেছে, অমনি তার দেহের বস্ত্র ও অলংকারপাতি আপনা আপনি খসে মাটিতে পড়ে গেলো। মাথায় রইল তার খাওয়া দাওয়া। হু হু করে কেঁদে উঠলো গোমতী। সবাই হায় হায় করে উঠলো। ব্যাপার কী। গোমতী কাঁদে কেন ? নারাণ শুনে ছুটে এলো। হাতজোড় করে ভুলক্রুটির মাফ চাইলো। না, গোমতী কিছুতেই কিছু বলছে না। খসে পড়া অলংকারপাতি কুড়িয়ে নিয়ে রিসাই (বক্ষবন্ধনী কাপড়) করে বেঁধে নিলো। তারপর কান্না জড়িত কণ্ঠে নারাণের কাছে বিদায় নিয়ে জুমের পথে হাঁটা দিলো। কসমতি তখন জুমে একা রয়েছে। বাপ দাংগুই চোন্তাই অজগর সাপকে মেরে ফের গ্রামে ফিরে গেছে। পাগলিনী প্রায় গোমতী জুমে গিয়ে প্রথমে গুহায় গেলো। না, অজগর সাপটি সেখানে নেই। এরপর গাইরিংয়ে উঠে ছোট বোন কসমতিকে জিজ্ঞেস করলো – কসমতি! তোমার বোনাই কোথায় ? কসমতি আমতা আমতা করে বললে – দিদি আজ বোনাই খেতে আসেনি। কোথায় গেছে তাও জানিনা। গোমতীর আর তর সয় না। তাড়াতাড়ি খাবার গুছিয়ে নিয়ে স্বামীকে ডাকতে শুরু করলো।

সাঁই গো সাঁই,
সাঁই খেতে আয়।
কলা পাতায় মোচা ভাত
সুবাস বয়ে যায় ॥
লাউয়ের খোলায় শীতল পানি
প্রাণ জুড়িয়ে যায়
সাঁই খেতে আয় ॥

কিন্তু কোথায় সাঁই ? সাঁই তো আর আসে না। গোমতী বারেবার ডাক পাড়ে কিন্তু সবই বৃথা। স্বামী আর খেতে আসে না। গোমতীর বড় সন্দেহ হলো কসমতির উপর। গোমতী স্বামী কথা জিজ্ঞেস করতেই কসমতির মুখে 'রা' শব্দটিও নেই। কেবল মাটির দিকে চেয়ে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে মাটি খুঁড়ে।

এদিকে তাদের পোষা কুকুরটি গোমতীকে পেয়ে কাপড়ে কামড় দিয়ে একবার টানে আবার ঝর্নার ধারে গিয়ে কী যেন দেখে ঘেউ ঘেউ ডাক পাড়তে থাকলো। কুকুরটা দু'একবার এমনি করতেই গোমতী পিছু নিলো। যেতে যেতে ঝর্ণার ধারে গিয়ে দেখে সেখানে স্বামীর খণ্ডিত দেহ পড়ে আছে। সারা ঝর্নার পানি রক্তে লাল হয়ে আছে। স্বামীর এরূপ দশা দেখে বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলো গোমতী। লোচায় লোচায় (অবিরাম) নামলো চোখের অশ্রুধারা। থামার কোন লক্ষণ নেই। কাঁদছে তো কাঁদছেই। সে এক অফুরান কান্না যেন মনে হয় সারা দুনিয়ার জল বুঝি ভর করেছে আজ গোমতীর দু'চোখে। ক্রমে ক্রমে চোখের জলে ঝর্না রূপান্তরিত হলো ছড়া নদীতে। গোমতীর হাটু ডুবে যায়। ক্রমে কোমর। তারপর বুক অবধি। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে বোন কসমতি – দিদি দোহাই তোমার। আর কেঁদোনা। তুমি যে জলে ডুবে যাচ্ছো। গোমতীর কান্না থামে না। কসমতির বুক হাহাকার করে উঠলো দিদির জন্যে। হাতজোড় করে বললে দিদি, তুই যদি জলে ডুবে যাস তা হলে আমি বড্ড একা হবো। আমাকে আদর করে কে ঘুম পাড়াবে! আমিই বা তখন কোথায় গিয়ে আশ্রয় পাবো।

গোমতী সত্যি সত্যি ছোটবোন কসমতিকে ভালোবাসতো। ছোটবোনের আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে বললে – ওরে ছোট, বিধাতার লিখন না যায় খণ্ডন। এ পৃথিবীতে আমার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। শুধু তোর জন্যে শান্তিতে মরতে পারছি না। শোন,আমি জলে ডুবে মরার পর তুই এ রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে চলে যাবি। সেখানে গিয়ে দেখবি বিশাল তেপান্তরের মাঠ। তেপান্তরে রয়েছে বিশাল বিশাল বটগাছ। বটগাছের ডালে চড়ে দিন কাটাবি। ফলমূল খেয়ে জীবন বাঁচাবি। সময়ে সময়ে তেপান্তরের মাঠে ত্রিপুরা মহারাজার বিন্দিয়া দল (পাখী শিকারীর দল) যাবে পাখী শিকার করতে। তখন তুই গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে, ও ডাল থেকে এ ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে গান করবি : -

বিরিংফাং দেকসিনি

সুকইদুক তংসিনি

বঙ্গানুবাদ : বটবৃক্ষের সপ্ত ডালে
ঝুলে সপ্ত গিলা
লতা বিরল নারী তেমনি আমি
সপ্ত সন্তান জন্মে

সাসিনি বমা বানি রীংনাইমা	যেথা এমনি নারীর সন্ধান পেতে কাটবে আয়ুষ্কাল
আং তৗই বুরীই করই।	যার গুনেতে গৃহে জ্যোতি প্রসন্ন কপাল॥

কসমতিকে ক্য়টি কথা বলার পর গোমতী ডুবে গেলো চোখের জলে। চারিদিকে শুধু জল থৈ থৈ করছে। কসমতির বুক হাহাকার হয়ে উঠলো। গোমতীর চোখের জলে ঝর্না হয়ে গেলো নদী। নামাঙ্কিত হলো গোমতী নদী। আর গোমতী যে স্থানে দাঁড়িয়ে ডুবে গিয়েছিলো সেখানে সৃষ্টি হলো অতলস্পর্শী এক বিরাট কুণ্ড। এ কুণ্ডের নামাঙ্কিত হয়েছিলো 'ডম্বুর।'

এদিকে গোমতী জলে ডুবে যাবার পর কসমতি দিদির উপদেশ মতো রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে তেপান্তরের মাঠে চলে গেলো। বিশাল বিশাল বটগাছ দেখলো। তারপর সাত রাস্তার মোহনায় দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল এক বট গাছে চড়ে দিন যাপন করতে লাগলো।

কিছুদিন যাবার পর একদিন সত্যি সত্যি তেপান্তরের মাঠ মহা হৈ চৈ শব্দে মুখরিত হয়ে উঠলো। ত্রিপুরা মহারাজার বিনন্দিয়া দল এসেছে পাখী শিকার করতে। দু'জন বিনন্দিয়া। একজন অন্ধ অন্যজন বধির। সেই বটগাছের তলায় এসে দাঁড়ালো। তাদেরকে দেখে কসমতি দিদির কথা মতো সাত ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে গান করতে লাগলো।

বটবৃক্ষের সপ্তডালে –
ঝুলে সপ্ত গিলালতা
বিরল নারী তেমনি আমি
সপ্ত সন্তান জন্মে যেথা।
... .
... ...

কসমতির গান, অন্ধ ও শিকারী কানে শুনতে পেলো। আহা, কী অপূর্ব কণ্ঠস্বর। কিন্তু অন্ধের কারণে দেখতে পেলো না। এদিকে বধির শিকারী চোখে দেখতে পেলো। আহা-হা। কী অপরূপ সুন্দরী কন্যা। কিন্তু কী গান করলো তা শুনতে পেলো না। অন্ধ শিকারী অবাক হয়ে গান শুনে আর বধির শিকারী নিষ্পলক নয়নে রূপের সুধা পান করে।

এমন বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে ও শুনে অন্ধ বধির সবার অজান্তে যুক্তি করতে

বসলো। বধির শিকারী বললে অন্ধ ভাই, আমাদের দেখা ও শোনা এ বিস্ময়কর ঘটনা যদি মহারাজার দরবারে রাজ সকাশে বয়ান করতে পারি তা হলে আমরা সহস্র রাং (মুদ্রা) পুরষ্কার পেতে পারি। তখন আমাদের আর দুঃখ থাকবে না। এভাবে অন্ধ ও বধির বিনন্দিয়া যুক্তি পাকালো। দলে আর কেউ জানতে পারলো না।

তিনদিন তিন রাত্তি পাখী শিকার করার পর বিনন্দিয়া দল রাজধানীতে ফিরে গেলো। পাখির মাংস না হলে ত্রিপুরা মহারাজা আহার করতে পারতেন না। শিকারী লব্দ পাখির মাংস দিয়ে মহারাজা খুব করে তৃপ্তি সহকারে আহার করলেন। পরের দিন যথারীতি পাত্রমিত্র বেষ্টিত হয়ে দরবার আহবান করলেন। দরবারে নানান কথা আলোচিত হলো। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, আরো কতো কী আলোচিত হলো। কিন্তু বধির ও অন্ধ বিনন্দিয়া কিছুতেই নিজেদের কথা উপস্থাপন করতে পারছিলো না। এক সময় সাহস করে বধির ও অন্ধ-বিনন্দিয়া রাজ সকাশে গিয়ে দাঁড়ালো। এতে সেনাপতি হৈ হৈ করে উঠলেন। এত বড় স্পর্ধা তোমাদের। সামান্য বিনন্দিয়া হয়ে রাজ সকাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে। ত্রিপুরা মহারাজা পরাচি, সেনাপতিকে থামিয়ে দিয়ে বিনন্দিয়াদের উদ্দেশ্য করে বললেন – কী হে বিনন্দিয়া বধির ও অন্ধ। খুব তো পাখী শিকার করে আনলে। এবার পুরস্কার চাও বুঝি।

বধির ও অন্ধ বিনন্দিয়া হাত জোড় করে বললে – না, মহারাজা। পুরস্কারের কথা পরে হোক। তবে এবার আমরা তেপান্তরের মাঠে পাখি শিকার করতে গিয়ে যে বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে ও শুনে এলাম তা দরবারে উপস্থাপন করার অনুমতি হোক - মহারাজ।

মহারাজ পরাচি বললেন, খুবই উত্তম। তা তোমরা কী দেখে ও শুনে এলে বলো।

বধির বিনন্দিয়া হাত জোড় করে বললে – মহারাজ! তেপান্তরের মাঠের সাতরাস্তার মোহনায় দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল বটগাছে পাখী শিকার করতে গিয়ে দেখি সেখানে একটি পাখীও নেই। পাখির বদলে সে গাছে রয়েছে এক পরমা সুন্দরী কন্যা। গাছের সাত ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে কী যেন গাইছে। মহারাজ, আমি বধির মানুষ কিছুই শুনতে পাইনি। তবে ...। মহারাজ মা বাপ। অপরাধ যেন মার্জিত হয়। এমন সুন্দরী কন্যা আপনার রাজপুরীতেও নেই।

ত্রিপুরা মহারাজা পরাচি বধির বিনন্দিয়ার কথা শুনে গর্জে উঠলেন। বললেন – বটে। তো সে কন্যা কী গাইছিলো শুনি। অন্ধ বিনন্দিয়া এবার তুমি বলো।

অন্ধ বিনন্দিয়া ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে – মহারাজ, মা বাপ। আমি অন্ধ মানুষ, চোখে দেখিনি। তবে সে কন্যা যা গেয়ে শোনালো তা হলো –

বটবৃক্ষের সপ্ত ডালে
ঝুলে সপ্ত গিলালতা
বিরল নারী তেমনি আমি
সপ্ত সন্তান জন্মে যেথা
এমনি নারীর সন্ধান পেতে
কাটবে আয়ুষ্কাল
যার গুণেতে গৃহে জ্যোতি
প্রসন্ন কপাল ॥

মহারাজ। অপরাধ যেন মার্জনা হয়। এমন মিষ্টি গলা আপনার রাজ্যে আর কোথাও শুনিনি। "যার কণ্ঠস্বর শুনে কোকিল গান করতে ভুলে যায়, ভোমরা উড়তে গিয়ে দিশা হারায়, ঝর্নার কলতান থেমে যায়, এমন কন্যা কেবল রাজ পুরীতে মানায়।"

বধির ও অন্ধ বিনন্দিয়ার মুখে বিস্ময়কর কাহিনী শুনে ত্রিপুরা মহারাজা পরাচি বড়ই কৌতুহলী হয়ে উঠলেন বললেন– শোন, বধির ও অন্ধ বিনন্দিয়া, যদি তোমাদের কথা সত্যি হয় তা হলে তোমরা পাঁচ সহস্র করে রাং পুরস্কার পাবে। আর যদি বানোয়াট হয় তাহলে গর্দান যাবে।

এরপর মহারাজা রাজ্যের বুড়ো মহামন্ত্রীকে তেপান্তরের মাঠে পাঠালেন সত্যাসত্য যাচাই করতে। তিনদিন পর মহামন্ত্রী রাজধানীতে ফিরে এসে বললেন – মহারাজ। বিনন্দিয়াদ্বয়ের কথা সত্য। আমি স্বয়ং সেই পরমা সুন্দরী কন্যাকে দেখে এলাম। মহামন্ত্রীর কথা শুনে মহারাজা আর স্থির থাকতে পারলেন না। স্বয়ং হাতীর পিঠে চেপে বসলেন সেই পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখতে। সঙ্গে নিলেন বহু সৈন্য সামন্ত। মহারাজা গিয়ে দেখলেন এবং শুনলেন। কন্যার অপরূপ রূপ লাবণ্যে, কণ্ঠের মাধুরীকতায় একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন মহারাজ। কাছে গিয়ে ডেকে বললেন – ও গো সুন্দরী কন্যা, কে তুমি। কি তোমার নাম ধাম। তুমি দেবী, মানবী না অপস্বরী। এ তেপান্তরের মাঠে এখানেই বা কী করছো ? আমি এ দেশের মহারাজা। বলো, আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি।

মহারাজাকে দেখে কসমতি বড় বোন গোমতীর কথা মনে পড়লো। মুখে তার কথা বেরুচ্ছে না কী বলবে। শেষে খুব কষ্টে গেয়ে উঠলো –

"বট বৃক্ষের সপ্ত ডালে

ঝুলে সপ্ত গিলালতা
বিরল নারী তেমনি আমি
সপ্ত সন্তানজন্মে সেথা

... ...

মহারাজা গান শুনলেন। বড়ই মধুর গান। বললেন – অতি উত্তম, হে সুন্দরী কন্যা। আমি অপুত্রক। একটা পুত্র সন্তানের জন্য আমি বড়ই লালায়িত। তোমার কথা যদি বাস্তবে প্রতিফলিত হয়, তাহলে তোমাকে আমি রাজরানী করবো। তুমি গাছ থেকে নীচে নেমে এসো। আমি তোমাকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে এসেছি। দিদির কথা বারেবার স্মরণ করতে করতে কসমতি মহারাজার কথায় সায় দিয়ে গাছ থেকে নীচে নেমে এলো।

ত্রিপুরা মহারাজা তখন হাতীর পিঠে চড়িয়ে কসমতিকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। এরপর মহাধূমধাম করে বিয়ে করলেন।

এদিকে হলো কী, মহারাজার ছিলো আরো ছয় রানী। কসমতিকে রাজরানী করতে দেখে তারা মুখে কিছু বলতে পারলো না বটে কিন্তু অন্তরে অন্তরে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিলো। সবার মুখে ছোটরানীর গুনপনার সুখ্যাতি আর ধরে না। এমনি করে দিন যায়। কসমতির পোয়াতির লক্ষণ দেখা দিলো। কসমতি মা হতে চলেছে শুনে রাজ্যের লোক খুশীতে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো। মহারাজাকে সবাই আঁটকুড়ো বলে ডাকতো। এতদিনে বুঝি সেই অপয়া নাম ঘুচলো।

এদিকে মহারাজার মনে কতো কী রঙিন স্বপ্ন। এতোদিন পর বুঝি তাঁর আশা পূরণ হলো। মহারাজার সন্তান হবে। রাজ্যের ভবিষ্যৎ মহারাজা হবে। আনন্দে আটখানা হয়ে মহারাজা দু'হাতে গরীব দুঃখীদের মাঝে দান খয়রাতি করতে লাগলেন। মহারাজা অন্যান্য ছয় রানীদের ডেকে বললেন যাতে কসমতিকে কোনভাবেই অবহেলা করা না হয়। মহারাজার ব্যস্ততা দেখে ছয়রানী বললে – মহারাজ! আপনার অত ভাবনা কিসের। আমরা আছি কী জন্যে। ছোটরানীর ভাগ্যে আমরাও তো ভাগ্যবতী হবো। সন্তানের মুখ দেখবো। কসমতির দায়দায়িত্ব আপনি আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন মহারাজ।

ক্রমে ক্রমে কসমতির সন্তান প্রসবের দিনক্ষণ কাছে এসে উপস্থিত হলো। মহারাজা তাৎক্ষণিক খবর পাবার আশায় ছোটরানীর একহাতে সোনার চেইন বেঁধে দিয়ে চেইনের অপর প্রান্ত দরবার হলে বেঁধে রাখলেন। সবাইকে বলে দিলেন ছোটরানীর প্রসব বেদনা শুরু হলে যেন সোনার চেইনে টান দেয়। দু'একদিন যেতে না যেতেই মহারাজা দররার করছেন অমনি সোনার চেইনে

টান পড়লো। মহারাজা তড়িঘড়ি দরবারের কার্যক্রম মূলতবি রেখে ছোটরানীর মহলে চলে গেলেন। **কিন্তু** কোথায় প্রসব বেদনা, কোথায় কী ? ছোটরানী বললে সে সোনার চেইন টানেনি। শুধু শুধু পণ্ডশ্রম। মহারাজা প্রতিদিন দরবার আহবান করেন, বার বার সোনার চেইনে টান পড়ে। ততবার দরবার ছেড়ে উঠে ছোটরানীর মহলে চলে যান কিন্তু গিয়ে দেখেন সবই বানোয়াট। এমনি করে মহারাজার মন বিরক্তিতে ভরে উঠলো।

আসলে এসব ছিলো হিংসুটে ছয়রানীর কারসাজি। মহারাজার মন যাতে বিগড়ে যায় তাই ছিলো তাদের ষড়যন্ত্র।

একদিন সত্যি সত্যি কসমতির প্রসব বেদনা উপস্থিত হলো। বার বার সোনার চেইনে টান দেয়া হলো। মহারাজ্য আর এলেন না। কসমতি ছয়রানীকে জিজ্ঞেস করলো – দিদি, আঁতুর ঘর কোথায় ? তাইতো, আঁতুর ঘরতো নেই। বললো ছয়রানী। চরম প্রসব বেদনা শুরু হলো। কসমতি জিজ্ঞেস করে কোথায় আঁতুর ঘর আর ছয়রানী বলে – ভাই এ ঘরতো মহারাজার বিশ্রামাগার, এ ঘর মহারাজার চারণ কক্ষ, এ ঘর ধূমপান কক্ষ, এ ঘর রাজ করঙ্গিনীর কক্ষ, এ ঘর পাশা খেলার কক্ষ, এ ঘর প্রমোদ কক্ষ, এ ঘর চিত্রাংকন কক্ষ, এ ঘর সাজন কক্ষ, এ ঘর পাদুকা কক্ষ, এ ঘর মহারাজার চিত্তবিনোদন কক্ষ ইত্যাদি বলে ছয়রানী ছোটরানী কসমতিকে সন্তান বিয়োনোর কোন জায়গাই দিলো না। অতবড় বিশাল রাজপুরীতে হতভাগী কসমতির সন্তান বিয়োনোর কোন ঠাঁইই মিললো না। একসময় একেবারেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো। তখন হিংসুটে ছয়রানী কসমতির চোখে সাতপট্টি কাপড় বেঁধে ঘোড়া হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো দূরে এক নদীর তীরে। সেখানে কসমতি ছয়ছেলে ও এক মেয়ে সন্তান প্রসব করলো। কিন্তু প্রসব করলে কী হবে, হিংসুটে ছয়রানী সব কটাকে নদীর জলে ফেলে দিলো। আর তার বদলে গাছ বাঁশের টুকরায় রক্তের ছোপ লাগিয়ে রেখে দিলো কসমতির পাশে। সাতপট্টি কাপড় চোখে বাঁধা কসমতি কিছুই জানতে পারলো না।

ছয়রানী তাদের কার্যসিদ্ধি করে কসমতিকে রাজপুরীতে নিয়ে এসে সেবা যত্ন করতে লাগলো। মহারাজাকে খবর দেয়া হলো। মহারাজা অতিশয় খুশীতে আটখানা হয়ে কসমতির কক্ষে চলে এলেন। মহারাজা আসা মাত্রই ছয়রানী বিলাপ করতে লাগলো – হায় হায় মহারাজ! আমরা এ কী দেখলাম। কসমতির পেটের সন্তান কিনা গাছ বাঁশের টুকরা। কী অলক্ষুণের কাণ্ড কারখানা। কসমতি কোন মানবী হতে পারে না। এ ডাইনী। ডাইনীর পেটে কেবল এ ধরনের সন্তান জন্ম হতে পারে। মহারাজ। কসমতিকে রাজপুরীতে রাখলে আমাদের সবার

অমঙ্গল হতে পারে। আপনি এর বিহীত ব্যবস্থা করুন মহারাজা। সব জেনে শুনে মহারাজা কসমতির মাথা মুড়িয়ে ছেঁড়াবস্ত্র পরিয়ে দিয়ে রাজপুরী থেকে বের করে দিতে প্রাসাদ রক্ষীদের আদেশ দিলেন। মহারাজার আদেশ পেয়ে প্রাসাদ রক্ষীগণ এক বিশাল ঝিলের ধারে ভাঙা এক কুঁড়েঘরে কসমতীকে রেখে দিলো। সেখানে সে রাজপুরীর হাঁস চড়াবে। তখন থেকে কসমতি মহাদুঃখে জীবন কাটাতে লাগলো। কালে কালে রাজ্যের লোকেরা কসমতিকে ভুলে গেলো। শুধু ভুলে গেলেন না একজন। তিনি বৃদ্ধ চোন্তাই। চতুর্দশ দেব মন্দিরের পুরোহিত। এদিকে হয়েছিলো কী, হিংসুটে ছয়রানী যে নদীতে কসমতির সন্তানদের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো সেটা ছিলো কসমতির বড়বোন গোমতীর আত্মবিসর্জন দেয়া চোখের জলে গড়া গোমতী নদী। কসমতির সন্তানদের জলে ফেলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোমতী সেগুলো আদর করে কোলে তুলে নিয়েছিলো আর যতন করে বোনের সন্তানদের লালন পালন করতে লাগলো। মাঝে মাঝে মিষ্টিসুরে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতো। এমন মিষ্টি সুরে ঘুম পাড়ানো গান নদীর আশে পাশের গ্রামের লোক প্রায়ই শুনতো কিন্তু কেউ বলতে পারতো না নদীর জলের ভেতর কে এমন করে গায়। অনেকে মনে করলো ভূতের ব্যাপার। কেউ বলতো ডাইনীর ছেলে ধরা গান। কেউ নদীর ধারে কাছে যেতে সাহস পেতো না ডাইনীর ভয়ে। ধীরে ধীরে রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়লো এই অদ্ভুত খবরটা। এক কান দু'কান হতে হতে খবরটা একদিন ত্রিপুরা মহারাজার দরবারে উঠলো। একদিন মহারাজা সরেজমিনে তদন্ত করতে এলেন। এসে তিনিও মিষ্টিসুরে ঘুম পাড়ানী গান শুনলেন কিন্তু কোন হদিস করতে পারলেন না। এভাবে অদ্ভুত রহস্যটা সবার কাছে হেঁয়ালী হয়ে রইলো।

দেখতে দেখতে সাতটি বছর কেটে গেলো। একদিন শীতের সকালে গ্রামের লোকজন দেখতে পেলো গোমতী নদীর চিক্‌চিক্ করা বালুচরে অপূর্ব সুন্দর ছয়টি ছেলে পাশা খেলছে আর তাদের পাশে বসে এক সুন্দরী কন্যা আপন মনে চরকায় সুতা কাটছে।

চিদুক চিসিনি
খগ্রি কলসিনি
এ্যাং এ্যাং
কুরু এ্যাং

বঙ্গানুবাদ : ষোল সতেরো
কড়ি সপ্ত বারো
এ্যাং এ্যাং
কুরু এ্যাং

নদীর বালুচরে অপরূপ সাতটি সন্তানকে খেলা করতে দেখে রাজার সিপাইরা খেয়ে এলো ধরতে। এমন সময় নদীর জলের ভেতর থেকে কে যেন গেয়ে

উঠলো –

ককবরক : ফাইদি আয়ুংরক ফাইদি
রাজানি বিনন্দিয়া ফাইদুক
তাখুম বেংনাইমা নামা কেকাইতি
হানি দুগুনো মানদুক ॥

বঙ্গানুবাদ : শোন বাছারা শোন ওরে
রাজার সিপাই তেড়ে আইসে
হাঁস চড়ানী মা তোমাদের
দুঃখ সায়রে ভাসছে।

জলের ভেতর থেকে সতর্কবাণী গান শোনা মাত্রই সাতটি সন্তান অমনি ঝুপঝাপ লাফিয়ে পড়লো জলে আর নিমিষেই হারিয়ে গেলো। রাজার সিপাইরা এ সব আজব কাণ্ড দেখে তাজ্জব বনে গেলো। জলের তলা থেকে ভেসে এলো ঘুম পাড়ানী গান :

থুদি আয়ুংরক থুদি (আজ আর খেলা নয়, বাছারা এখন ঘুমো)

সিপাইরা এমন আজব কাণ্ড দেখে আর দেরী না করে খবর নিয়ে গেল মহারাজার কাছে। অতিশয় কৌতুহলী হয়ে মহারাজা একদিন লোক লস্কর নিয়ে তাবু গাড়লেন জলের ধারে। পরদিন ভোর সকালে নিজের চোখে দেখলেন ছ'টি ছেলে আর একটি মেয়ে নদীর বালুচরে দেখছে :

চিদুক বাই চিসিনি
খগ্রী কলসিনি
এ্যাং এ্যাং,
কুরু এ্যাং ...

আবার জলের ভেতর থেকে সতর্কবাণী – গান শোনা গেলো

ওলে ওলে আয়ুংরক
রাজা সাক বাইথাং ফাইদুক
নামা কেকাতি কক রীংয়া
নাফা তেনেসা খা করই
ফাইদি আয়ুং রক ফাইদি ॥

বঙ্গানুবাদ : শোন বাছারা শোন, রাজা স্বশরীরে আজ বিদ্যান, তোমাদের দুঃখিনী

মা কথা বলতে জানে না। আর তোমাদের পিতা, সেতো ভোলামন। এসো বাছারা এসো।

রাজার সৈন্যরা যেই ধরতে যাবে অমনি নিমেষে লাফিয়ে পড়লো জলের নীচে। নিঃসন্তান মহারাজা ফুটফুটে এক কন্যা ও ছ'টি ছেলেকে দেখে বিষম মায়ায় পড়ে গেলো। এ সন্তানদের তাঁর চাইই চায়। সৈন্যদের আদেশ দিলেন নদীর জল সেঁচে ফেলতে। মহারাজার আদেশ পেয়ে সৈন্যরা লেগে গেলো জল সেঁচতে। নদীর উজানে বিরাট বাঁধ দেয়া হলো। হাজার হাজার সৈন্য জল সেঁচতে লাগলো নীচের দিকে। সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। অবিরাম জল সেচনে নদীর নিম্নাঞ্চল প্রায়ই শুকিয়েছে অমনি সবার চোখের সামনে ছ'টি ছেলে ও একটি মেয়ে এক লাফে বাঁধের উজানে গভীর জলে তলিয়ে গেলো।

এমন অপ্রত্যাশিত কাণ্ড দেখে সবাই 'ধর ধর' করে চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু হতভম্ব সৈন্যরা কে কাকে ধরে? অস্থির হয়ে মহারাজা আবার উজান নদীর জল সেঁচতে আদেশ দিলেন। শত সহস্র সৈন্য আবার উজান নদীর জল সেঁচতে শুরু করলো। সেঁচতে সেঁচতে যখন প্রায় শুকিয়ে এসেছে অমনি ওরা সাতজন চোখের নিমিষেই এক লাফে নদীর ভাটির জলে লাফিয়ে তলিয়ে গেলো। মহারাজা পাগল প্রায় অধৈর্য্য হয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলেন – আবার সেঁচে ফেলো নদীর জল। যেমন করে হোক ওদেরকে আমার চাইই চাই॥

মহারাজার উত্তেজনা দেখে নদীর জলের তলা থেকে দৈব বাণী হলো – 'শোন মহারাজা, তোমার রাজ্যশুদ্ধ লোক মিলে জীবনভর চেষ্টা করলেও নদীর জল এতটুকুও কমবে না আর ওরা সাতজনকে তুমি ধরতে পারবে না। তবে ওদেরকে আমি বলে দিচ্ছি – ওরা কাল সকালে তেপান্তরের সাত রাস্তার মোড়ের সেই বটগাছের সাতটি ডালে বসে থাকবে। তখন তুমি যদি তাদের আশা পূরণ করে খুশী করতে পারো তা হলে ওরা তোমার হয়ে থাকবে।

দৈববানী শুনে মহারাজা খুশী হলেন। তাঁর তো আর ধন দৌলতের কমতি নেই। শিশুদের খুশী করতে কতক্ষণ লাগে। জল সেঁচা বন্ধ হলো। মহারাজা দ্রুত গতিতে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। পরের দিন অঢেল মণি মাণিক্য, সোনাদানা, আর ধনদৌলত নিয়ে হাজির হলেন তেপান্তরের মাঠের সাতটি রাস্তার মোড়ে। এসেই দেখতে পেলেন সত্যি সত্যিই এক কন্যা ও ছ'টি ছেলে বটগাছের সাতটি ডালে বসে আছে।

মহারাজা অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করে সৈন্যদের আদেশ দিলেন চারিদিকে কড়াপাহারা মজবুত করতে যাতে ওরা পালাতে না পারে। এমনিতেই ব্যাপার

স্যাপার দেখে রাজ্যের লোকজন এসে গিজ গিজ হয়ে আছে চারিদিকে। সূঁচ বেরিয়ে যাবার পথটিও আর নেই।

মহারাজা বটগাছের নীচে গিয়ে ওদেরকে বললেন – শোন বাছারা। আমি এদেশের মহারাজা। আমার ধনদৌলতের অভাব নেই। সৈন্য সামন্তেরও অভাব নেই। আমার দেশের প্রজারা ধনে, মানে, যশে, খ্যাতিতে, নির্বিঘ্নে, সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করে। কিন্তু আমি এক দুঃখী মানুষ। আমার কোন ছেলে পুলে নেই। আমি নিঃসন্তান। প্রজারা আমাকে আটকুঁড়ো মহারাজা বলে। তোমরা আমার সন্তান হবে। কীসে তোমাদের খুশী করাতে পারি বলো।

ছেলে ছ'টি কিছু বললো না। মেয়েটিই মহারাজাকে উদ্দেশ্য করে বললো – হে মহান রাজন। আমরা আমাদের মাকে পেতে চাই। মাকে পেলেই আমরা আপনার সন্তান হয়ে প্রাসাদে গিয়ে থাকবো।

মেয়েটির কথা শুনে কোলাহল মুখরিত জনসমাবেশ মুহূর্তেই নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। এ কেমন কথা। সোনা নয়, মণি মাণিক্য নয়। ওরা ওদের মাকে চায়। কে সে ভাগ্যবতী ?

মহারাজা বললেন – অতি উত্তম কথা। তাই হবে। এবার বলো কে তোমাদের মা?

মেয়েটি বললে – মহান রাজন! আমাদের মাকে আমরা কোনদিন দেখিনি। আমাদেরকে জন্ম দিয়েই মা হারিয়েছেন। তবে একটি কথা। আমরা আমাদের মুখে সাতপট্টি কাপড় বেঁধে রাখবো। যে নারীর বুকের দুধ এই সাতপট্টি কাপড় ভেদ করে মুখে গিয়ে পড়বে সেই আমাদের মা। এখন আপনি আমাদের মাকে এনে দিন। আমরা মায়ের দুধ খাবো। মহারাজা পরাচি দেখলেন – এতো বিষম ফ্যাসাদ। কাকে আনাবেন তিনি। ভেবে কূল পেলেন না। শেষে ভেবে চিন্তে ছয়রানীকে আনালেন। ছয়রানী এসে বটের ডালে বসা কিশোরীর মুখে বুকের দুধ সিঞ্চালো। কিন্তু কিশোরী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভাইদের উদ্দেশ্যে বললে –

'দাদারা শোন ওরে
মা তো আসে নিরে ॥

মহারাজা এবার মন্ত্রী, কোটাল, পাত্রমিত্র, নারান, জমিদার, দফাদার সবার ঘরনীদের তলব করলেন। সৈন্যরা মহারাজার এত্তালা নিয়ে তড়িৎ গতিতে পুরবাসী নারীদের জড়ো করলো। সবাই একে একে বুকের দুধ সিঞ্চালো। কিন্তু প্রতিবারই কিশোরীটি মুখ ফিরিয়ে বলে – 'মা তো আসেনি রে ॥

মহারাজা পড়লেন মহা ফাঁপড়ে। এবার ঢালাও হুকুম দিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের সব

নারীকে হাজির করতে। যে নারীকে কিশোরীটি মা বলে ডাকবে মহারাজা তাকেই পাটরানীর মর্যাদা দেবেন। মহারাজার আদেশ পেয়ে সৈন্যরা ছুটে চললো চারিদিকে। ঢোল সহরৎ করে মহারাজার আদেশ রাজ্যময় প্রচার করে দেয়া হলো।

মহারাজার আদেশ জানতে পেরে এবার কাতারে কাতারে নারী এসে জড়ো হতে লাগলো তেপান্তরের মাঠের সেই বটতলায়। যারা আসতে নারাজ সৈন্যরা তাদের ধরে বেঁধে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে এলো। এমনি করে রাজ্যের সব নারী এলো আর গেলো কিন্তু কিশোরীটি কেবল মাথা নেড়ে বলে 'মা তো আসেনি রে।

মহারাজা এবার যার পর নেই বিষম ভাবনায় পড়লেন। এদিকে হাঁস চরানী কসমতির কথা কারোর মনেই আসেনি। গ্রহ বিপাকে পড়ে মহারাজা তো ভুলছেনই, রাজ্যশুদ্ধ লোকও তাকে ভুলেই গিয়েছিলো। এমনকী দুঃখ পেতে পেতে কসমতি নিজেও বোধহয় নিজকে মানুষ বলে ভাবতে ভুলে গিয়েছিলো। সে শুধু জানে হাঁস চড়াতে। নিত্যি নিত্যি হাঁসের সাথে চলতে ফিরতে গিয়ে সে নিজেও বোধহয় তাদের একজন বলে জানে।

মহারাজা বিপাকে পড়ে হুঙ্কার দিয়ে মন্ত্রী, কোটাল, পাত্রমিত্র, দফাদার, চোপাদার, নগরপাল, দ্বারপাল সবাইকে আদেশ দিলেন – কোন অজুহাত নয়। যে করেই হোক, যেমন করেই হোক, খুঁজে আনতে হবে ওদের মাকে। নইলে কারোর রক্ষা নেই। মহারাজার কঠোর আদেশ শুনে সবাই চোখে সরিষা ফুল দেখলো। কোথায় যাবে। কাকে আনবে। মন্ত্রী ভাবে, কোটাল ভাবে, নগরপাল ভাবে, ভাবে সিপাহী সান্ত্রী। কিন্তু কোন কুলকিনারা খুঁজে পায়না। শেষে বুড়ো মন্ত্রী সাহস করে ক্ষীণ কণ্ঠে মহারাজাকে বললেন – মহারাজ, অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। রাজ্যের সব নারীকে তো আনা হয়েছে। যুবতী, বুড়ী, বিবাহিতা, অবিবাহিতা, লোরা, খোঁড়া, বেঙ্গুর, আঁতুর, কালা, কানা, বোবা, হাবা, ট্যারা ম্যারা, দাসীবান্দী সবাইকে তো আনা হয়েছে। রাজ্যে আর কোন নারী আনতে বাকী নেই। এখন মহারাজার আদেশ হয়তো অন্য দেশ আক্রমণ করে নারী সংগ্রহ করতে পারি।

এমন সময় চতুর্দ্দশ দেব মন্দিরে বৃদ্ধ চোন্তাই মহারাজার সকাশে উপনীত হয়ে হাত জোড় করে বললেন, মহান রাজন ? একটু খানি ঘাট হয়েছে। মহারাজার হাঁস চরানী দাসী কি করে যেন বাদ পড়ে গেছে বলে মনে হয়। হুকুম হয় তো তাকে আনা যেতে পারে।

হাঁস চরানী দাসী কসমতির কথা ততক্ষণে মহারাজার স্মরণে আবছাভাবে জেগে উঠলো। তবে সে যে তাঁর ছোটরানী ছিলো এ কথা আদৌ মনে এলো না।

মহারাজা হাঁস চরানী দাসী কসমতিকে নিয়ে আনতে হুকুম করলেন। তড়িৎ গতিতে মহারাজার সিপাইরা হুড়মুড় করে টেনে হিঁচড়ে-গলা ধাক্কা দিতে দিতে কসমতিকে নিয়ে এলো। তার অপরাধ, রাজ্যের সব নারী এলো। এতক্ষণ কেন সে আসেনি।

হাঁস চরানী দাসী কসমতির পরনে শত ছিন্ন রিনাই[৩]-রীসা[৪] । গা ভর্তি ময়লা ও পাঁচড়া। জটবাঁধা চুলে উকুন ভর্তি। উন্মাদীনি প্রায়। শরীরে নারীসুলভ অবয়ব বলতে কিছু নেই। দুধের বাঁট শুকিয়ে গিয়ে চামড়ার সাথে মিশে আছে। তারপরও মহারাজার হুকুমে বটের তলায় কিশোরীর সামনে দাঁড় করিয়ে দিলো মহারাজার সিপাইরা।

ভয়ে বিহ্বল হয়ে হাঁস চরানী-দাসী কসমতি, কিশোরীর মুখে বাঁধা সাতপট্টি কাপড়ের উপর বুকের দুধ সিঞ্চালো। এমনি দুধের ফোয়ারা ছুটে গিয়ে সাতপট্টি কাপড় ভেদ করে কিশোরীর মুখের ভেতর গিয়ে পড়লো। আর অমনি আনন্দে কিশোরীটি চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো –

শোন দাদারা শোন ওরে
সত্যিকারে মা আমাদের আইসে রে ॥

সবাই অবাক হয়ে এই আজব কাণ্ড দেখলো। মহারাজা অবাক, মন্ত্রী অবাক, পাত্রমিত্র অবাক, রাজ্যশুদ্ধ লোক সবাই অবাক।

এরপর ছয় ভাই একবোন বটগাছ থেকে নেমে এসে হাঁসচরানী দাসী কসমতিকে মা ডেকে প্রণাম করলো। আর প্রণাম করলো মহারাজাকে। মহারাজাকে বললে – মহান রাজন ! আমাদের আশা সিদ্ধি হয়েছে। এবার চলুন, কোথায় যেতে হবে।

মহানন্দে ত্রিপুরা মহারাজা পরাচি তাদের বুকে জড়িয়ে চুম্বন করলেন। তারপর আম্বারী সজ্জিত শ্বেতহস্তীর পিঠে চড়িয়ে প্রাসাদে নিয়ে এলেন।

এদিকে হলো কী। হায়রে কপাল মন্দ, চোখ থাকতে অন্ধ। গ্রহের ফের আর কাকে বলে। এতসব কাণ্ড ঘটে যাবার পরও হাঁসচড়ানী দাসী কসমতিকে কেউ খোঁজ নিলোনা। সবাই যে যার পথে চলে গেলো। কসমতিকে কেউ একজন একটি কথাও পুঁছ করলো না। কিছুক্ষণ সম্বিৎহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আপন মনে নিজের কাজে চলে গেলো কসমতি ॥

এদিকে রাজপ্রাসাদ ঘিরে মহাসমারোহে উৎসবের ধুম পড়ে গেছে। রাজ্যশুদ্ধ লোক এসে যোগ দিলো উৎসবে। সাত দিন, সাত রাত ধরে উৎসব হলো। কেউ প্রাণ খুলে নানান ঢংয়ে গান করলো, কেউ বিচিত্র ভঙ্গিমায় নাচলো, কেউবা মদ

খেয়ে হেসে খেলে আমোদ ফূর্তি করলো। মহারাজা চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সব ধরনের উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে রাজ্যশুদ্ধ লোকদের আপ্যায়ন করলেন। সবাই মহারাজার জয়ধ্বনি ও গুণকীর্তন করতে করতে যে যার বাড়িতে চলে গেলো।

উৎসব পর্ব শেষ হলে পর মহারাজা প্রফুল্ল চিত্তে রাজকার্যে মনোনিবেশ করলেন। এখন আর তিনি আঁটকুঁড়ো নন। দস্তুরমত তিনি এখন ছয়পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের পিতা।

একদিন নৈশভোজের পর মহারাজা শুতে গেলেন নিজ কক্ষে। তাঁর কক্ষের পাশে ছিলো সন্তানদের শোবার কক্ষ। তিনি শুনতে পেলেন কন্যাটি ভাইদেরকে বলছে দাদারা আমার ঘুম আসছে না। একটি গল্প শুনতে চাই। ভাইদের মধ্যে সবার যে বড় সে বললো, কী আর গল্প বলবো আমাদের দুঃখের কাহিনীই বলি, তোমরা শোন। এ কাহিনী আমাদের বড় মাসীমা একবার আমাকে শুনিয়েছিল। কন্যাটি সায় দিয়ে বললে, তাহলে তাই বলো বড়দা। বড়ভাই তখন ধীরে ধীরে তাদের কাহিনী বলতে লাগলো। তাদের বড়মাসীমা গোমতী আর তাদের মা কসমতির ছোটবেলাকার কথা, বড়মাসীমা গোমতীর সাথে সর্বরূপী সিবরাই দেবতার গোপন বিয়ের কথা, মাতামহ দাংগুই চোন্তাইয়ের সাথে মা কসমতীর যুক্তি করে সাপটাকে মেরে ফেলা, কী করে মহারাজার সাথে মা কসমতির বিয়ে হলো, মহারাজার ছয় রানীর ষড়যন্ত্র এবং মহারাজার নির্লিপ্ত নিবুর্দ্ধিতার কারণে মা কসমতির দুঃখভোগ সব কাহিনী আদ্যোপান্ত বলে ফেললো বড়ভাই।

এদিকে মহারাজা পাশের কক্ষে বসে ছেলেমেয়েদের সব কথা শুনছিলেন। শুনে পূর্বেকার সব ঘটে যাওয়া কাহিনী তাঁর কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেলো। তিনি আর থাকতে না পেরে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন – আর না পুত্রগণ। আর বলতে হবে না। আমি সব বুঝতে পেরেছি। আমি এক্ষুণি আসছি বলে কয়েকজন দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন কসমতির খোঁজে। ঝিলের ধারে হাঁসের খোয়াড়ে কসমতিকে পাওয়া গেলো। আলুথালু বেশে কসমতি বসে আছে। মহারাজা নিজ অপরাধ স্বীকার করে কসমতির কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বললেন – আমায় ক্ষমা করো, ছোটরানী। আমি মহাপাপ কাজ করেছি। সুষ্ঠ বিচার বিবেচনা না করে তোমাকে বহু কষ্ট দিয়েছি। এখন তোমাকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে এসেছি। প্রাসাদে রানী হয়ে তুমি আপন ছেলেমেয়েদের সাথে থাকবে। দীর্ঘ ১২ বছর পর ছেলেমেয়ের সাথে ছোটরানীর সুখের মিলন দেখে রাজ্যের প্রজাদের মাঝে আবারও নতুন করে খুশীর জোয়ার বয়ে গেলো। মহারাজা হিংসুটে

ছয়রানীকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দিলেন। তারপর আবারো মহাধুমধাম করে কসমতিকে মহারানীর আসনে বসিয়ে পুত্রকন্যা সহ সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগলেন ত্রিপুরা মহারাজা পরাচি। তারপর। অভাগিনী গোমতীর চোখের জলে যে নদীর জন্ম হলো তার নামাঙ্কিত হলো গোমতী নদী। এ নদী এখনো তর তর করে বয়ে চলেছে ত্রিপুরা রাজ্যের বুক চিরে আর কুমিল্লা জেলার ভেতর দিয়ে। ত্রিপুরা জাতি এ নদীকে দুগ্ধস্রোতরূপী মাতৃনদী বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। গোমতী, চোখের জলে যে স্থানে ডুবে গিয়েছিলো তার নামাঙ্কিত হয়েছিল ডম্বুর। এটি একটি ত্রিপুরা জনজাতির পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতিবছর এ স্থানে সিবরাই চতুর্দশী তিথিতে বিশাল তীর্থমেলা বসে।

পাদটীকা

১। চোন্তাই : পুরোহিত। যিনি বারোয়ারী পূজা করতে সক্ষম।

২। কামী মাইখুলুম : লক্ষ্মী পূজা। নবান্ন উৎসব।

৩। রীণাই : ত্রিপুরা রমণীদের নিম্নাঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র।।

৪। রীসা : ত্রিপুরা রমনীদের বক্ষবন্ধনী বস্ত্র বিশেষ।

৫। সিবরাই : দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁর অজস্র নাম। যেমন বুড়াসা, কালাকতর, গড়িয়া, রুদ্র, অর্ধেন্দু, ভৈরব, ত্রিপুরেশ্বর, ত্রিপুরারী, বনমালী, গিরি, ভোলানাথ, শিব, শংকর, ইত্যাদি॥

কামী মাইখুলুম উপাখ্যান

একদিন সিবরাই (স্রষ্টা) এর অদ্ভুত খেয়াল হলো, তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করবেন। খেয়াল হলো বটে, কিন্তু কোথায় সৃষ্টি করবেন। কোথাও জায়গা খুঁজে পেলেন না। সবখানে গ্রহ-নক্ষত্র আর জলে ঠাসা। কোথায় পৃথিবী সৃষ্টি করবেন ? শেষে অনেক ভেবে চিন্তে জলের উপর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করলেন বটে, কিন্তু দেখতে সুন্দর হলো না। পৃথিবীর উপর উদ্ভিদ জগত সৃষ্টি করলেন কিন্তু এতে করেও পৃথিবীর সজীবতা এলো না। শেষমেশ প্রাণীজগৎ সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে উঠলো। সিবরাই তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষও ছিলো। কিছুদিন যেতে না যেতেই সিবরাই দেখলেন তাঁরই সৃষ্টি প্রাণীজগৎকে বংশবিস্তারের জন্য কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা দরকার। বিশেষ করে মানুষ নামক প্রাণীগুলোকে দীর্ঘায়ু দিতে তিনি মনস্থ করলেন। তার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত খাদ্যে যোগান দেয়া। একদিন তিনি উদ্ভিদ জগৎকে ডেকে দরবার আহবান করে বললেন, হে উদ্ভিদ জগৎ, প্রাণীকুলকে সৃষ্টি করার আগে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি খাদ্যাভাবে প্রাণীকূল অকালে মারা যাচ্ছে। প্রাণীকূলকে বাঁচিয়ে রাখা অগ্রজ হিসাবে তোমাদের উপর দায়িত্ব বর্তায়। এখন তোমরা বলো কে কতো দিন প্রাণীকুলকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।

সিবরাই-এর এরূপ বক্তব্য শুনে মুহূর্তেই দরবার নিরব হয়ে গেলো। উদ্ভিদ. জগতের কারোর মুখে রা শব্দটিও নেই। অনেকক্ষণ পর বন্য আলু আমতা আমতা করে বলে উঠলো, হে মহান, আমি তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। আমার কী বা ক্ষমতা আছে। আমি মনুষ্যজীবনকে পাঁচদিনের খাদ্যের যোগান দিতে পারবো। বন্য আলুর ঘোষণার পর কলাগাছ এগিয়ে এসে বললো – হে মহান, আমি সাত দিনের খাদ্যের যোগান দিতে পারবো। কাঁঠাল গাছ এগিয়ে এসে বললো হে মহান, আমি বছরে একবার ফল দিয়ে থাকি। যখন আমি ফলভার হবো তখন আমি তিন দিনের খাদ্যের যোগান দিতে পারবো। বাঁশ এসে মাথা নিচু করে বললো - হে মহান, আমি সাত দিনের খাদ্যের যোগান দিতে পারবো। এভাবে আরো অনেক ফলবান বৃক্ষরাজি একে একে তাদের সামর্থ্যের কথা বলে গেলো। সিবরাই দেখলেন, এতে মনুষ্যকুলের খাদ্যের যোগান হয় মাত্র ছয় মাসের।

তিনি চান মনুষ্যকুলের আরো দীর্ঘপরমায়ু। সিবরাই ভাবছেন, এমন সময় বন্য ডুমুর বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করলেন – হে মহান, আমি পাঁচ বছরের জন্য খাদ্যের যোগান দেবো। ডুমুরের ঘোষণায় সিবরাই সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, উত্তম কথা। তা হলে আজ থেকেই মনুষ্যকুলের খাদ্যের যোগান দাও। বাদবাকি পরে দেখা যাবে, এ বলে সিবরাই সেদিনের মতো দরবার মূলতবি ঘোষণা করলেন।
এখন হলো কি, ডুমুর ফল হলো একটি বাজে ফল। দরবারে নিজের কৃতিত্ব দেখানোর জন্য ডুমুর গাছ এমন অপরিণামদর্শী ঘোষণা দিয়েছিলো। যা হোক, সিবরাই এর-নির্দেশে মনুষ্যকূল ছুটে গেলো ডুমুর গাছে। কিন্তু পাঁচ বছর তো দূরের কথা, এক বেলার জন্যও খাদ্যের যোগান দিতে পারলো না ডুমুর গাছ। অধিকন্তু, ডুমুর ফল খেয়ে মনুষ্যকূল পেটের অসুখে পড়ে কাতরাতে লাগলো। এরূপ অবস্থায় সবাই সিবরাই এর দরবারে গিয়ে ডুমুর গাছের বিরুদ্ধে নালিশ জানালো। এতে সিবরাই মিথ্যা অহমিকা দেখানোর জন্যে ডুমুর গাছের উপর রেগে গিয়ে পাছায় সজোরে একটা লাথি মারলেন। এতে ডুমুর গাছ মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি করতে করতে ছড়ার ধারে গিয়ে পড়ে গেলো। তখন থেকে ডুমুর গাছ বাঁকা হয়ে ছড়ার ধারে জন্মায় বলে ত্রিপুরীদের বিশ্বাস।
এবার সিবরাই সকল দেব-দেবীদের ডেকে দরবার আহবান করলেন। দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে করে বললেন, শুনুন দেব-দেবীগণ, আপনারা সবাই বিশেষ বিশেষ গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। আমি চাই আমার সৃষ্ট মনুষ্যকুলের পরমায়ু দীর্ঘতা অর্জন করুক। তার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান দেয়া। এখন আপনারা বলুন কে কতো দিনের খাদ্যের যোগান দিতে পারবেন? মুহূর্তেই দরবার নিরব হয়ে গেলো। দেব-দেবীগণের মুখ থেকে কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। দেব-দেবীগণ ভাবলেন সব কিছুর একটা সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু মানুষের মুখের গ্রাসের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। মানুষ পরম্পরায় বংশ বিস্তার করবে, সীমাহীন খাদ্যের যোগান দিতে কার সাধ্যিতে কুলাবে। দরবারে উপস্থিত ছিলেন ধনরাজ কুবের। দেব-দেবীগণের একমাত্র ভরসা কুবের। সবাই কুবের রাজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কুবের রাজ নত মস্তকে হাতজোড় করে বললেন হে মহান মনুষ্যকুলের দীর্ঘায়ুর জন্য খাদ্যের যোগান দেয়ার ক্ষমতা দেবদেবীগণের নেই। আমি ধনরাজ কুবর মাত্র ১২ বছরের পণ্য খাদ্যের যোগান দিতে পারি। অতএব, হে মহান, একমাত্র লক্ষ্মীদেবীর পক্ষে সম্ভব প্রাণীকুলের খাদ্যের যোগান দিতে। লক্ষ্মীদেবীকে মর্ত্যলোকে নিয়ে আসার আকুল আবেদন জানাচ্ছি। নচেৎ আপনার সৃজন অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে।
ধনরাজ কুবেরের কথা শুনে সিবরাই সামান্য বিচলিত হলেন। তারপর বললেন

ঠিক আছে। লক্ষ্মীদেবীকে মর্ত্যলোকে নিয়ে আসুন। আমি চাই মর্ত্যের জীব-জগতের পরমায়ু দীর্ঘায়ু হোক। এই বলে বিশ্রামে চলে গেলেন। এবার দেব-দেবীগণ পড়লেন ভীষণ সমস্যায়। কে যাবে লক্ষ্মীদেবীকে আনতে ?

লক্ষ্মীদেবী বাস করেন গোলকধামে। স্বর্গরাজ্য থেকে কোটি মাইল দূরে। কার পক্ষে সম্ভব তাঁকে আনা। সবাই গিয়ে ধরলেন বিক্ষিত্রাকে (পবনদেব)। বিক্ষিত্রা রাজি হলেন। পরের দিন গোলকধামে লক্ষ্মীর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সিবরাই-এর আদেশ আদ্যপান্ত বর্ণনা করলেন। সবকিছু জেনে শুনে লক্ষ্মী দেবী মর্ত্যে আসতে রাজি হলেন বটে, তবে দু'টি শর্তারোপ করলেন। প্রথম শর্ত পুষ্পকরথে তিনি মর্ত্যলোকে যাবেন। মর্ত্যলোকে পৌছার পর তাঁর বাহনের যোগান দেবেন বিক্ষিত্রা। দ্বিতীয় শর্ত, যেখানে ব্যভিচার, অবিচার, শ্রীহীনতা দেখবেন, সেখানে তিনি কৃপা বিতরণ করবেন না। বিক্ষিত্রাদেব লক্ষ্মীদেবীর আরোপিত শর্ত মেনে নিয়ে মর্ত্যলোকে নিয়ে এলেন।

গোলকধাম থেকে পুষ্পকরথে করে লক্ষ্মীদেবী মর্ত্যে এলেন। পুষ্পকরথ গোলকধামে ফিরে গেলো। লক্ষ্মীদেবী বললেন, বড্ড তৃষ্ণা পেয়েছে -জল চাই। এখন কথা হলো, যেখানে এসে পুষ্পকরথ থেমেছিলো তার পাশেই ছিলো গঙ্গা নদী। গঙ্গা দেবী উঠে এসে লক্ষ্মীদেবীর তৃষ্ণা নিবারণ করেন। গঙ্গার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মীদেবী আশীর্বাদ করলেন, মর্ত্যলোকে আমার পূজার আগে যেন তোমার পূজা হয়। সেই অবধি ত্রিপুরা জনজীবনে লক্ষ্মীপূজার আগে গঙ্গাদেবীর পূজা হয়ে থাকে। এরপর লক্ষ্মীদেবী বিক্ষিত্রাদেবকে বললেন, ক্ষিধা পেয়েছে। কিছু খেতে চাই। এবার মহাবিপদে পড়লেন বিক্ষিত্রা দেব। লক্ষ্মীদেবীর জন্য কোন রকম খাদ্যের আয়োজন করা ছিলো না। তাছাড়া লক্ষ্মীদেবী বলে কথা। তিনি কি খান,না খান কিছুই তাঁর জানা ছিলো না। বিচলিত হয়ে খাদ্য অন্বেষণ করতে লাগলেন। পাশেই ছিলো একটা সরোবর। ওই সরোবরের তীরে বাস করতো একটা শুকর। সে এসে বললো – হে মা লক্ষ্মী, আমি এক অধম জীব। জীবনে কারো উপকার করতে পারিনি। আপনার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই। এই বলে আত্মাহুতি দিলো শুকর। এতে লক্ষ্মীদেবী শুকরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করলেন, মর্ত্যে যখনি আমার পূজা হবে তখন যেন শুকর বলি দিয়ে উৎসর্গ করা হয়। সেই অবধি ত্রিপুরা জনগণ লক্ষ্মীপূজায় শুকর বলি আসছে।

লক্ষ্মীদেবীর তৃষ্ণা নিবারণ হলো। ক্ষুধা নিবৃত্তি হলো। এখন মর্ত্যলোক প্রদক্ষিণের পালা। লক্ষ্মীদেবী বিক্ষিত্রাদেবকে বললেন, এবার আমার বাহন চাই। বিক্ষিত্রাদেব লক্ষ্মীদেবীর শর্ত মেনে নিয়েছেন বটে, কিন্তু কোন ধরনের বাহনের দরকার তা তিনি জানতেন না। শুধু একটি শব্দ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হতে লাগতো : বাহন চাই।

দূরে এক গাছের কোটরে বাস করতো এক পেঁচা। হঠাৎ সে শুনতে পেলো-লক্ষ্মীদেবীর জন্য বাহন চাই। শোনামাত্র সে লুটিয়ে পড়ে বললো – হে জগত জননী, আপনাকে বহন করতে পারাটা মহাপুণ্যের কাজ। আমি আপনার বাহন হতে চাই। ব্যস, লক্ষ্মীদেবী পেঁচার পিঠে চড়ে মর্ত্যলোক প্রদক্ষিণ করলেন এবং পেঁচাকে আশীর্বাদ করলেন, আমার পূজাস্থলে যেন তোমার স্থান হয়। (সেই অবধি লক্ষ্মীদেবীর পূজাস্থলে পেঁচার প্রতিকৃতিও স্থান পেয়ে আসছে)। শুধু তাই নয়, লক্ষ্মীদেবী পরের দিন দরবার আহূত হলে পেঁচাকে একটি মুকুট উপহার দেবেন এ কথাও বললেন। পেঁচা মুকুট পাবে। এ কথা শুনে পেঁচা মনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে সারারাত ধরে গান করলো, নাচলো। আর শেষরাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমে অচেতন হয়ে রইলো।

পরের দিন মহাড়ম্বে মর্ত্যলোকে লক্ষ্মীদেবীর দরবার অনুষ্ঠিত হলো। মর্ত্যের সমস্ত জীব এসে লক্ষ্মীদেবীকে স্তুতি করলো। লক্ষ্মীদেবী সন্তুষ্ট হয়ে সমস্ত জীবকে আশীর্বাদ করে বললেন, ভয় নেই জীবজগত,তোমাদের খাদ্যের অভাব হবে না। লক্ষ্মীদেবী সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'মুখ আছে যার, খাদ্য হবে তার'।

এদিকে হলো কী, মহাদরবারে পেঁচাকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না। মুকুট গ্রহণ করার জন্যে পেঁচাকে ডাকা হলো কিন্তু পেঁচা লাপাত্তা। তখন ভীমরাজ হাত জোড় করে বললেন, হে জগতজননী, পেঁচা সারারাত ধরে মনের আনন্দে গান করেছে। এখন হয়তো ঘুমিয়ে আছে। মুকুটটা আমার হাতে দিন। আমি পেঁচার মাথায় পরিয়ে দিয়ে আসি।

ভীমরাজ মুকুট নিয়ে গেলো। পেঁচা যে গাছের কোটরে ঘুমিয়েছিলো তার উপরে এক কাঠঠোকরা পাখি আপন মনে বসে পোকা খাচ্ছিলো। ভীমরাজ তাকে পেঁচা মনে করে তার মাথায় লক্ষ্মীদেবীর দেয়া মুকুটটা পরিয়ে দিলো। ফলে পেঁচা আর মুকুটটা পেলো না। ত্রিপুরীদের বিশ্বাস, কাঠঠোকরা পাখির মাথায় আজও মুকুটটা শোভা পাচ্ছে। লক্ষ্মীদেবী মর্ত্যে আগমন করেছিলেন লেংখোসালে (বুধবার)। আর মহাদরবার অনুষ্ঠান করেছিলেন তালউয়াং (কার্তিক) মাসের স্রাংসাল (বৃহস্পতিবার) দিনে। এজন্য ত্রিপুরা রাজন্যবর্গ বুধবারকে ত্রিপুরা রাজ্যের সাপ্তাহিক ছুটি এবং বৃহস্পতিবারকে হাফ ছুটি ঘোষণা করেছিলেন। আজও ত্রিপুরা জনজীবনে বুধবার বিশ্রামের দিন এবং বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজার দিন বলে ত্রিপুরা নর-নারীগণ পূজা-পার্বণ করে থাকে। মর্ত্যে লক্ষ্মীদেবীর আগমন চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে প্রতিবছর ত্রিপুরী জনগণ ত্রিপুরাব্দের তালউয়াং মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কামী মাইখুলুম পূজা করে থাকে। কামী অর্থ গ্রাম, মাইখুলুম অর্থ লক্ষ্মীসেবা। কামী মাইখুলুম মানে গ্রামীণ লক্ষ্মীপূজা।

শ্বেত হস্তীর উপাখ্যান

আদ্যিকালের কথা। সেই সময়ে নাকি মনুষ্যকুল ও পশু-পাখীর মধ্যে বাক্য বিনিময় হতো। সুখ দুঃখের কথা বলা যেতো। এমনি আপদে বিপদে পরস্পরের মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা চলতো। সেই আদ্যিকালে ত্রিপুরা রাজার রাজত্বকালে গোমতীনদীর উজানে এক সুখী দম্পতি বসবাস করতো। গৃহস্থ রাজবাড়িতে কাজ করতো আর তার সুন্দরী বউ ঘর বাড়ি সামলাতো। তাদের একটা গাভীও ছিল। গৃহস্থের বউ ছিল গর্ভবতী আর অপর দিকে তাদের গাভীটিও ছিল গর্ভবতী। একদিন গৃহস্থের বউ মাচা ঘরে বসে কাপড় বয়ন করতে ছিল। অপর দিকে মাচা ঘরের নীচে তাদের গাভীটিও শায়িতাবস্থায় অলসভাবে ঘাস চর্বন করছিল। বউটি কাপড় বুনতে বুনতে অসাবধানতাবশত হাতের থুরিটি (মাকু) মাচা ঘরের নীচে পড়ে গেল। গর্ভবতী বউ মাচা ঘর থেকে নীচে থুরি তুলে নিতে আলস্য বোধ করল। অপর দিকে থুরি না থাকলে কাপড়ও বুনন যাচ্ছে না। ধারে কাছে কাউকে না পেয়ে মাচা এর নীচে শায়িতা গর্ভবর্তী গাভীটিকে বলল : গাভী দিদি, তুমি একটু কষ্ট করে আমার থুরিটি তুলে দাও না। 'গাভী বলল- ভাই -আমিও তোমার মত গর্ভবতী। আমারও আলস্যবোধ হচ্ছে। তুমি যখন অনুরোধ করছো তখন একটা শর্তে আমি তোমার থুরিটি তুলে দেবো। বউটি আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল-কি শর্ত ? গাভীটি বলল – আমরা উভয়ে গর্ভবতী। আমাদের মধ্যে যদি একের পুত্র ও অন্যের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহন করে তবে তাদেরকে পরস্পর বিয়ে দিতে হবে। আমার এ শর্ত মেনে নিলে আমি তোমার থুরিটি উঠিয়ে দেবো। গৃহস্থের বউ ভাবলেন যে, পশুর সাথে মানুষের বিবাহ হওয়া কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং শর্ত মেনে নেয়া না একই কথা। তাই বলল– তোমার শর্তে আমি রাজী আছি। তুমি থুরিটি উঠিয়ে দাও। গাভীটি থুরি উঠিয়ে দিল এবং দুজনের মধ্যে শর্ত থেকে গেলো।

এরপর কিছু দিন অতিবাহিত হলে গৃহস্থের বউ একটি কন্যা সন্তান আর গাভীটি একটি বৃষ প্রসব করলো। এরি মধ্যে বউটি তার শর্তের কথা বেমালুম ভুলে গেলো। কিন্তু গাভীটি ভুললো না। ক্রমে ক্রমে মনুষ্য কন্যা ও বৃষ উভয়ে মাতৃস্নেহে বড় হতে লাগলো। মনুষ্য কন্যাটি যখন সমবয়সীদের সাথে খেলায় মগ্ন থাকতো

তখন বৃষটিও মাতৃস্তন্য ত্যাগ করে কন্যাকে অনুসরণ করে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো। পাড়া প্রতিবেশীরা কিন্তু গৃহস্থের বউ এবং গাভীটির শর্তের কথা জানতো। তাই তারা স্মিতমুখে কন্যা ও বৃষের প্রতি আঙ্গুল নির্দেশ করে শর্তের কথা আলোচনা করতো এবং বৃষের ব্যবহার ও আচরণ দেখে অবাক হতো।

কন্যাটি ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করলো। সে তার মায়ের শর্তের কথা অনেক দিন থেকে শুনে এসেছিল এবং বৃষের আচরণও দেখছিল। ক্রমে ক্রমে শর্তের কথা ক্রমশ: প্রবীণদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলো। যুবকেরা এ নিয়ে হাসি তামাসা করতে লাগলো। অপরদিকে বৃষের ঐকান্তিক ভালবাসাও তীব্র হতে লাগলো। কন্যাটি সমস্ত অনুধাবন করছিল এবং মর্মপীড়ায় কাল যাপন করতে লাগলো।

একদিন কন্যাটি লজ্জায় থাকতে না পেরে মাকে শর্তের কথা জিজ্ঞেস করলো। মা মেয়েকে শান্তনা দিয়ে বলল 'লোকের কথা কখনও শুনবে না। আমি কখনও শর্ত করিনি। তাছাড়া মানুষের সাথে কি পশুর বিয়ে হতে পারে।'

কালক্রমে কন্যাটি যৌবনসীমায় উপনীতা হলো। আর বৃষ শাবকটিও পূর্ণমাত্রায় বৃষে পরিণত হল।

এখন আর বৃষ এক মুহূর্ত যুবতী কন্যাকে ছাড়তে চাহে না। যুবতী কন্যা যেখানে যাক না কেন যুবক বৃষটিও সঙ্গে যাবেই। যুবতী কন্যা মায়ের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে লজ্জায় মরে যায়। অপরদিকে যুবক দলের ক্ষেপানীও তাকে অসহ্য করে তুললো।

যুবতী বুঝলো আত্মহত্যা ছাড়া এর কোন প্রকার মুক্তি নেই। একদিন সে গোপনে কোন নির্জন বনে আমলকী গাছের ডালে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলো। এ ঘটনায় বৃষটি উন্মাদ হয়ে আমলকী গাছে বারম্বার শিরাঘাত করে মারা গেল।

এর অনেক দিন পরে ত্রিপুরা মহারাজা মৃগয়া উপলক্ষে একটি মাদী হাতীর পিঠে চড়ে সেই বনে আসলেন। এদিক সেদিক শিকার অনুসন্ধান করার পর দেখলেন পথ পার্শ্বে একটি পত্র বিহীন আমলকী গাছে একবৃন্তে দু'টি আমলকী। এত বড় বড় সুন্দর আমলকী জোড়া মহারাজা আর কখনও দেখেন নাই। রাজা আগ্রহভরে আমলকী দু'টি পাড়লেন। কিন্তু পাড়ার সময় হস্তচ্যুত হয়ে একটি আমলকী মাটিতে পড়ে গেল। আর রাজার বাহন মাদী হাতীটি শূড় দিয়ে তৎক্ষনাৎ সেটা ভক্ষণ করল। মহারাজা মৃগয়া থেকে রাজ প্রাসাদে ফিরে এসে সংগৃহীত আমলকীটি রানীকে দিয়ে বললেন – এমন বড়ো ও সুন্দর আমলকী আমি কখনও দেখি নাই। এক বৃন্তে দুটি ফল। একটি আমার মাদী হস্তী ভক্ষণ করেছে অপরটি তোমার জন্যে নিয়ে এলাম।' রানী অতিশয় আহলাদের সাথে রাজার দেয়া আমলকী খেয়ে ফেললেন।

রানী নিঃসন্তান ছিলেন। আমলকী ভক্ষণের কিছুদিন পর দৈবক্রমে তাঁর গর্ভ সঞ্চার হল। এই ঘটনায় রাজা এবং প্রজাগণের আনন্দের সীমা রইল না। কালপূর্ণ হলে রানী এক পরমা সুন্দরী কন্যা সন্তান প্রসব করলেন। রাজ্যময় আনন্দ কোলাহলে ভরে উঠলো।

অপরদিকে রাজার মাদী হাতিটিও সমসাময়িককালে গর্ভবতী হয়েছিলো। সেও সুলক্ষণ যুক্ত শ্বেত বর্ণের পুত্র সন্তান প্রসব করলো। রাজ্যে শ্বেত হস্তী জন্ম গ্রহণ করায় পণ্ডিতেরা সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে রাজাকে যুক্তি দেখালো। রাজকন্যা ও শ্বেতহস্তী শাবক ক্রমে ক্রমে বড় হতে লাগলো। শ্বেতহস্তী শাবকটি রাজকন্যার কাছে কাছে থাকতো। কিছুতেই সই ছাড়া হয়ে থাকতে পারতো না।

এভাবে ক্রমে ক্রমে রাজকন্যাটি যৌবনে পদার্পণ করলো। তিনি সহচরীদের সাথে কখনও কখনও ক্রীড়া ও স্নানের জন্য অন্তঃপুর থেকে বাইরে আসতেন। একদিন রাজকন্যা একাকী বাগিচায় ভ্রমণ করছিলেন। এমন সময় সেই শ্বেতহস্তীটি এসে শুড় দিয়ে রাজকন্যাকে পিঠে তুলে নিয়ে গোমতী নদীর উজানে অঘোর অরণ্যে পলায়ন করলো। প্রতিদিন শ্বেত হস্তীটি রাজকন্যাকে নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতো আর সুমিষ্ট বন্য ফল পেড়ে দিতো। রাজকন্যা ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকলো।

এদিকে রাজকুমারীকে নিয়ে শ্বেতহস্তী বনে পালিয়েছে জেনে রাজ্যময় হুলুস্থুল পড়ে গেল। রাজা রাজ্যের বড় বড় গহীন বনে সৈন্য সামন্ত পাঠালেন। কিন্তু শ্বেতহস্তী ও রাজকন্যার সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না। সৈন্যরা রাজ্যের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম চষে অনুসন্ধান করলো। না সবই বৃথা। রাজকন্যার অভাবে রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

অতঃপর মহারাজা ঘোষণা করলেন। যে ব্যক্তি শ্বেতহস্তীকে বধ করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে পারবে তাকে তাঁর অর্ধেক রাজ্য দান করবেন এবং সেই সাথে রাজকন্যার সাথে তার বিবাহ দিবেন। এতে রাজ্যের অনেক বীর ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। না কেউ সফল হল না। এখন কি করা যায় ? রাজা ও রানী কন্যার উদ্ধার সম্ভবপর হচ্ছে না দেখে হতাশ হয়ে মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন। মহারাজার উদ্বিগ্নচিত্ত কিছুতেই ধৈর্য মানে না। দিন আসে-দিন যায়। রানীর কান্নার বিরাম নেই। রাজপ্রাসাদ শোকে কাতর। রাজ্যময় স্তব্ধ হয়ে গেছে। এমন সময়ে রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তর সীমানা গ্রাম থেকে বুদুয়া ও রাঙ্গিয়া নামে দু'সহোদর রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে রাজাকে প্রনাম করে বলল-মহারাজের অনুমতি পেলে আমরা রাজকন্যাকে অনুসন্ধান করে দেখতে পারি এবং শ্বেতহস্তীকে বধ করে রাজকন্যাকে উদ্ধারের চেষ্টা করে দেখতে পারি। রাজার আর করণীয় কিছুই ছিল

না। বললেন – উত্তম।
তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পারো।
বুদুয়া ও রাঙ্গিয়া পুনর্বার বলল-মহারাজ। আমরা গরীব মানুষ। আমাদের বড়ই খাদ্যাভাব। আপনি দয়াকরে আমাদেরকে ছয় মাসের রসদ বরাদ্দ করার আদেশ দিন। রাজা তাদের জন্য ছয় মাসের রসদ বরাদ্দ দিলেন। রসদ পেয়ে দু'সহোদর শ্বেতহস্তী ও রাজকন্যা অনুসন্ধানে যাত্রা করলো।

অঘোর বনে প্রবেশ করে দু'ভাই তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলো। কিন্তু কিছুতেই সন্ধান মেলে না। বড়ভাই বুদুয়া বিরক্ত হয়ে বলল-রাঙ্গিয়া চলো এখান থেকে চলে যাই। রাজকন্যাকে খোঁজার আর দরকার নেই।

দু'ভাইয়ের মধ্যে ছোটভাই রাঙ্গিয়া ছিল বুদ্ধিমান ও কার্যক্ষম। রাঙ্গিয়া বুদুয়ার জন্য অঘোর বনে একটি মাচা ঘর তৈরি করে দিলো। সে প্রতিদিন শ্বেতহস্তী ও রাজকন্যার সন্ধানে বের হতো। বুদুয়া-মাচা ঘরে বসে দিন কাটাতো। যখনি রাঙ্গিয়া বনে থাকার প্রস্তুত নিত তখন বড়ভাই বুদুয়া কেবলে যেত-দাদা-কেউ যদি এসে জিজ্ঞাসা করে 'কট কট জাঙেঁ' তবে তুমি বলিও – রাঙ্গিয়া বুদুয়া জাঙ্গে।"

একদিন রাঙ্গিয়ার অবর্তমানে এক বিরাট রাক্ষস এসে-বিকট স্বরে বুদুয়াকে জিজ্ঞেস করল – কট্ কট্ জাঙেঁ। বুদুয়া ছোট ভাইয়ের কথামত উত্তর দিল-রাঙ্গিয়া বুদুয়া জাঙ্গে। শুনা মাত্রই রাক্ষস ভয়ে বিকট চিৎকার করে সেখান থেকে চলে গেলো। যতবার রাক্ষস এসে জিজ্ঞেস করতো বুদুয়া উত্তর দিত-রাঙ্গিয়া বুদুয়া জাঙ্গে।

একবার বুদুয়া মনে মনে ভাবলো-রাঙ্গিয়া আমার ছোট ভাই। তার নাম আগে বললে – রাক্ষস পালিয়ে যায়। আমি তো রাঙ্গিয়ার বড়ো। আমার নাম বললে তো রাক্ষস আরো ভয় পেয়ে যাবে। এবার আসুক রাক্ষসটা। এই বলে সে রাক্ষসের অপেক্ষায় রইল। কিছুক্ষণ পর সত্যিই সত্যিই রাক্ষস এসে ফের জিজ্ঞেস করলো-কট্ কট্ জাঙ্গে।' সঙ্গে সঙ্গে বুদুয়া উত্তর দিল বুদুয়া রাঙ্গিয়া জাঙ্গে। আর যায় কোথায় ? রাক্ষসটা মাচা ঘরে উঠে বুদুয়াকে আছাড় মেরে তার জিহ্বা কেটে ফেলে দিল। আর বুদুয়াকে মাথার উপর তুলে দু'শত হাত দূরে জঙ্গলে নিক্ষেপ করে চলে গেল রাক্ষসটা।

অপরদিকে ছোট ভাই রাঙ্গিয়া বহু খোঁড়াখুঁজির পর শ্বেতহস্তীর অনুসন্ধান পেল। হস্তীটি একটা সরোবরে নেমে সর্বাঙ্গে জল সিঞ্চন করছে। রাঙ্গিয়াকে দেখে হস্তীটি প্রবল বেগে তেড়ে এলো। তুমুল যুদ্ধ হল। যুদ্ধে হস্তীটি মারা গেল। রাঙ্গিয়া হস্তীর দাঁত দুটি উৎপাটন করে মাচা ঘরে ফিরে এলো।

রাঙ্গিয়া মাচা ঘরে ফিরে এসে দেখতে পেল মাচা ঘর ভেঙ্গে ছারখার। বুঝতে

অসুবিধা হল না তার। তাড়াতাড়ি এসে দেখল তার বড়ভাই বুদুয়া নেই। সেই বনে রাক্ষসের গতিবিধি সম্পর্কে পূর্ব থেকে তার ধারণা ছিল। রাক্ষস বুদুয়াকে মেরে ফেলেছে কিম্বা ধরে নিয়ে গেছে এরূপ অনুমান করতে করতে সে এক স্থানে একটা গর্ত করে গজদন্ত লুকিয়ে রাখল। অতঃপর বুদুয়ার খোঁজে সে বের হল। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তার দৃষ্টিগোচর হল একস্থানে কিছু রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে আর পিঁপড়াগুলি সারিবদ্ধভাবে আসা যাওয়া করছে। যেখানটায় পিঁপড়া জমাটবদ্ধ হয়েছিল সেখানে সে দেখতে পেল এক টুকরা মাংসখণ্ড। বলাবাহুল্য ওটা ছিল বুদুয়ার জিহবা-খণ্ড। এরপর অনেক খোঁজাখুজি করে রাঙ্গিয়া বুদুয়াকে সঙ্গীহীন অবস্থায় একটি ঝোপের ভিতর দেখতে পেল। বুদুয়ার সংজ্ঞাহীন দেহে কিছুক্ষণ জল সিঞ্চনের পর বুদুয়ার জ্ঞান ফিরে এলো কিন্তু জিহবা খণ্ডিত বিধায় কথা-বলার শক্তি ছিল না।

রাঙ্গিয়া খন্ডিত জিহবা হাতে উঠিয়ে চিৎকার বলে বলল – "আমি যদি সত্যিই সত্যিই দেব ঔরষে জন্মে থাকি তাহলে আমার বাক্যবৃথা যাবে না।" বুদুয়ার খণ্ডিত জিহবা পুনঃজোড়া হোক।" এই বলে রাঙ্গিয়া চন্দ্র,সূর্য্য ও বসুমতিকে সাক্ষী করে বুদুয়ার খণ্ডিত জিহবা সংযোগ করল। সত্যের কি তেজ। সংযোগ করার সাথে সাথে জোড়া লেগে গেল। বুদুয়া অতঃপর তার দুর্গতির সব কথা ছোট ভাই রাঙ্গিয়াকে খুলে বলল। বড় আকারের একটা শিরপাং গাছের গোড়া দেখিয়ে বলল– সম্ভবত : এই গাছের গোড়ায় একটা সুরঙ্গ আছে। আমি রাক্ষসকে এই গাছটা উপরিয়ে সুরঙ্গে প্রবেশ করতে দেখেছি। বুদুয়ার কথা শুনে রাঙ্গিয়া বলল – আমি রাক্ষসের সন্ধানে যাচ্ছি। তুমি এই সুরঙ্গের মুখে আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত বসে থেকো। তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই।

এরপর বুদুয়াকে এ কথা বলে রাঙ্গিয়া শিরপাং গাছের গোড়া উপরিয়ে দেখে যে, সেখানে গাছের গোড়ায় একটা সুরঙ্গ রয়েছে। এছাড়া সুরঙ্গের ভেতর অবধি একটা ঘিলা লতা বের হয়ে অন্য গাছের সাথে জড়ানো রয়েছে। রাঙ্গিয়া বুঝতে পারল যে, রাক্ষসটা ঐ লতা অবলম্বন করে সুরঙ্গের ভেতর বাহির আসা যাওয়া করত। সেও ঐ লতা ধরে সুরঙ্গের ভেতর প্রবেশ করল। ঘিলালতা ধরে যেতে যেতে সে দেখতে পেল অদূরে একটা পাথরের তৈরী বিরাট বাড়ি রয়েছে। বাড়ির আশপাশ সাজানো এবং একটা স্বচ্ছ জলের সরোবর। রাঙ্গিয়া চুপিসারে বাড়িতে প্রবেশ করে প্রতি কামরায় ঘুরে দেখল কিন্তু কোন জন মানুষের খোঁজ পেল না। অবশেষে আর একটা কুটুরীতে গিয়ে দেখল যে, এক পরমা সুন্দরী যুবতী কন্যা একটা পালংকে বসে নীরবে কাঁদছে। রাঙ্গিয়া চুপি চুপি যুবতীর সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল নুং সাব অর্থাৎ কে তুমি... কেন তুমি বসে কাঁদছ।

হঠাৎ মানুষের দর্শনে যুবতী কন্যাটি চমকে উঠল। উত্তরে বলল- আমি এক দুঃখিনী রাজকন্যা। এক বিকট রাক্ষস আমাকে এখানে ধরে এনে বন্দী করে রেখেছে। রাঙ্গিয়ার বুঝতে দেরী হলো না রাজকন্যার পরিচয়। সে বলল- রাক্ষসটা কোথায় ? কখন ফিরে আসবে ? রাজকন্যা বলল-দিনে সে কোথায় যায় জানি না। তবে ঠিক সন্ধ্যা হলে সে ফিরে আসে। আর বেশী দেরী নেই। রাক্ষসটা আসার সময় হচ্ছে।

ঠিক সন্ধ্যা হলে পরে রাক্ষসটা মাটি কাঁপিয়ে ধুলির ঝড় তুলে ফিরে এল। রাঙ্গিয়াকে দেখে ভীষণ গর্জন করে আক্রমণ করল। আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য রাঙ্গিয়াও প্রস্তুত ছিল। অনেকক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ হল। রাঙ্গিয়া ছিল দেব ঔরসের সন্তান। কাজেই রাক্ষসটার পরাজয় হল। রাঙ্গিয়া রাক্ষসটাকে ভু-তলে ফেলে তরবারির এক কোপে মাথা কেটে ফেলল। রাঙ্গিয়ার বীরত্ব দেখে রাজকন্যা রাঙ্গিয়াকে মনের অগোচরে ভালোবেসে ফেললো। রাঙ্গিয়া রাক্ষসটাকে মেরে প্রয়োজনীয় মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করে রাজকন্যাকে পিঠে করে সুরঙ্গের পাতাল পুরী থেকে থেকে বের হয়ে আসলো। এসে দেখে যে বড়ভাই বুদুয়া যথাস্থানে বসে ঝিমুচ্ছে। রাঙ্গিয়া তার লুকানো হাতির দাঁত,রাক্ষসপুরী থেকে সংগৃহীত মুল্যবান দ্রব্যও বুদুয়াকে নিয়ে রাজধানীর দিকে যাত্রা করল। অনেক দুর্গম পথ, পাহাড় ,পর্বত, ছড়া ঝর্ণা গিরি বন্দর অতিক্রম করে তারা রাজধানীতে পৌছল। রাজা ও রানী হারানো রাজকন্যাকে ফিরে পেয়ে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করলো। রাঙ্গিয়া রাজাকে গজদন্ত ভেট দিয়ে তার অভিযানের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করল। রাজাও পাত্র-মিত্র মহাখুশী হয়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। এরপর রাজা তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী রাঙ্গিয়ার সাথে রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে অর্ধেক রাজ্য দান করে জামাইকে পারিষদ শ্রেণীতে স্থান দিল।

এর কয়েক বছর পর বৃদ্ধ রাজা জামাতার হাতে সমগ্র রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করে বানপ্রস্থ হলেন। রাঙ্গিয়া রাজ চক্রবর্তী 'ফা' উপাধি ধারণ করে সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগলেন। অতঃপর রাজ বিচকার এ ধরনের বিস্ময়কর কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জ্ঞাতার্থে।

পাদটিকা

১. বানপ্রস্থ: সংসার মায়া ত্যাগ করে যিনি বৈরাগী হয়ে বনে গমণ করেন তাকে বাণপ্রস্থ বলে।

২. বিচকার: যিনি চমকপ্রদ কাহিনী লিপিবদ্ধকরে রাখেন তাকে বিচকার বলে।

অপূর্ব বিচার

ত্রিপুরা রাজ্যের এক পর্বত শ্রেণীর নাম ঊনকোটি । এ ঊনকোটি পর্বতের নৈসর্গিক সৌন্দর্য ছিল অতিশয় মনোরম । পাখীর কুঞ্জনে, সবুজের সমারোহে, ফলও পুষ্পে, আকারে এবং প্রকারে উনকোটি পর্বতমালা ছিল স্বর্গের উদ্যান অমরাবতীর সমকক্ষ । ঊনকোটিতে শত সহস্র ছড়া ও ঝর্না প্রবাহিত হতো । এর পানি ছিল সুমিষ্ট; বাতাস ছিল নির্মল । মুনিঋষি সাধু সন্ন্যাসীরা ঈশ্বর সাধনায় ঊনকোটি পর্বতশ্রেণীকে উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচনা করতো ।

ঊনকোটি পর্বতশ্রেণীর সৌন্দর্য্যের কথা স্বর্গে দেবতাদের কাছেও পৌঁছেছিল । দেবরাজ ইন্দ্রের দরবারে এ বিষয় নিয়ে দেবতাদের বিস্তর আলোচনাও হয়েছিল । সিদ্ধান্ত হয়েছিল দেবাদিদেব সিবরাই এর নেতৃত্বে দেবগণ ঊনকোটি পর্বতশ্রেণীতে পর্যটনে যাবে । যেমনি সিদ্ধান্ত তেমনি কাজ । একদিন সিবরাই এর নেতৃত্বে স্বর্গের দেবগণ – ঊনকোটি পর্বতশ্রেণীতে পর্যটনে এলেন । এলেনই তো এলেন একেবারে এক কোটি দেবতা । দেবগণ ঊনকোটি পর্বতশ্রেণীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলেন । সবাই এক বাক্যে – স্বীকার করলেন 'অপূর্ব ।' ঊনকোটি পর্বতশ্রেণীতে এসে দেবগণ অতিশয় আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে এদিক সেদিক ইতস্তত : বিচরণ করতে লাগলেন । দেবাদিদেব সিবরাই আনন্দে আপ্লুত হয়ে ধ্যান আহবান করে ঊনকোটি পর্বতের শিখরে সমাধিস্থ হলেন । ইত্যবৎসরে দেবগণের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এক সমস্যা দেখা দিল । সরস্বতী, লক্ষ্মী, ধর্ম এবং কর্ম এই চারজন দেবতাই সমস্যার মূল হোতা । এ চারজনই নিজেকে দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করলেন । সরস্বতী বলেন আমিই শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মী বলেন আমি, ধর্ম বলেন কেউ নয় আমি শ্রেষ্ঠ আবার কর্ম বলেন সবার উপরে আমি । শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কেউ ছাড়তে নারাজ । দেবগণ এর কোন সমাধান খুঁজে পেলেন না । এদিকে দেবাদিদেব সিবরাই সমাধিস্থ হয়ে আছেন । তাঁকে জাগানো যাবে না । এখন কি করা যায় । শেষমেশ গণপতি বলে উঠলেন । বৃথা তর্ক বিতর্ক করে কোন লাভ নেই । দেবতাদের বিচার দেবগণ করবে কেন ? তার চেয়ে বরং ভালো হবে এ দেশের রাজাধিরাজ দেবতাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করুক । গণপতির প্রস্তাবে দেবগণ যুক্তিযুক্ত মনে করলেন । সবাই দল বেঁধে ত্রিপুরা রাজাধীশ্বরের দরবারে সমবেত

হলেন। এক সঙ্গে কোটি দেবগণের রাজ দরবারে উপস্থিতিতে ত্রিপুরা অধীশ্বর যেমন বিস্মিত হলেন তেমনি হলেন আনন্দিত। ত্রিপুরাধীশ্বর দেবগণকে প্রণাম জানিয়ে অতিশয় বিণয় সহকারে ত্রিপুরা রাজ দরবারে আগমনের হেতু জানতে চাইলেন। দেবগণের মধ্যে গণপতিই আর্জি পেশ করলেন –

গণপতি:মহামান্য ত্রিপুরাধীশ্বর! আপনি দেবগণের অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনার রাজ্যের ঊনকোটি পর্বতশ্রেণীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের কথা জেনে স্বর্গের এক কোটি দেবতা দেবাদিদেব সিবরাই এর নের্তৃত্বে পর্যটনে এসেছেন। এখন দেবাদিদেব সিবরাই ধ্যানস্থ হয়ে ঊনকোটি শিখরে বিরাজ করছেন। দেবগণের মধ্যে সরস্বতী, লক্ষ্মী, ধর্ম ও কর্ম এ চারজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। আপনি যশষী রাজাধিরাজ। আপনি শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বিচার করে দেবগণের মধ্যে স্বস্তি ফিরিয়ে দিন – এই আমাদের প্রার্থনা।

গণপতির আর্জি শুনে ত্রিপুরা রাজাধীশ্বর মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি শুধু ভাবলেন – এ অসম্ভব। মানুষের পক্ষে দেবতার বিচার করা অকল্পনীয় ও অবাস্তব। তিনি ভাবলেন স্বর্গের দেবগণ কী তাঁকে ছলনা করতে এসেছেন ? নাকি অন্য কোন দুরভিসন্ধি! অদৃষ্টে যাই থাকুক – তথাপি তিনি রাজাধীরাজ তাঁকে মুষড়ে পড়লে চলবে না। তিনি দেবগণের উদ্দেশ্যে বললেন;

ত্রিপুরাধীশ্বর : উত্তম দেবগণ। আমি অবশ্যই এর বিচার করবো। আগামীকাল যখন দরবার আহুত হবে তখন দেবগণের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে যথাযথ বিচার করা হবে। আপনারা এখন আসুন। দেবগণ রাজ দরবারে বিচার প্রার্থী হয়েছেন জেনে রাজ্যের প্রজাকুলের মাঝে মহা দুঃখের ছায়া নেমে এলো। শিশুর কোলাহল থেমে গেল, পাখপাখালির কুঞ্জন স্তব্ধ হলো, নদীর স্রোত, বাতাসের গতি থেমে গেল, ফুলের পাঁপড়ি ঝরে পড়তে লাগলো, প্রেমপ্রীতি, মায়ামমতা হাসি কান্না সবকিছু মুহূর্তেই উবে গেলো। চারিদিকে কেবল অমঙ্গল বার্তা ধ্বনিত হলো। রাজ্যের প্রজাবৃন্দ দলে দলে রাজপ্রাসাদে এসে জড়ো হলো। সবার মুখে এক কথা। এ কি অলক্ষুণের কথা। কেউ বলল সোনার ত্রিপুরা রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে। কেউ বলল – চলুন দেশ ছেড়ে পালাই। এ দেশে আর প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা যাবে না। কেউ বলল – এবার ধ্বংস অনিবার্য। ত্রিপুরাধীশ্বর প্রজাকুলের মাঝে উপস্থিত হয়ে বললেন – 'আমার প্রাণপ্রিয় প্রজাবৃন্দ, আপনারা শান্ত হোন। আমি রাজাধিরাজ। রাজ্য ও প্রজাবৃন্দের রক্ষা ও পালন করা আমার কাজ। সমস্ত প্রকার বিপদ ও দুর্যোগ মোকাবেলা করার দায়িত্ব আপনারা আমাকে দিন। আপনারা সংযত হোন এবং ধৈর্য্য সংহত করুন।'

এদিকে রাজ-অন্তপুরেও কান্না ও বিলাপধ্বনি প্রকাশিত হলো। ত্রিপুরাধীশ্বর

মহামন্ত্রীকে নিয়ে বৈঠকে বসলেন। বৃদ্ধ মহামন্ত্রী আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিয়ে বললেন; মহারাজ! এ কঠিন পরীক্ষা। যদি লক্ষ্মীকে শ্রেষ্ঠত্ব বলে ঘোষণা করা না হয় তা হলে লক্ষ্মী রুষ্ট হবে। লক্ষ্মী ছাড়া হলে প্রাণীকূল বাঁচে না। দেশে খাদ্যাভাব হবে। মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা যাবে। আর যদি সরস্বতীকে শ্রেষ্ঠত্ব বলে ঘোষণা করা না হয় তা হলে তিনি রুষ্ট হবে। রাজ্যের সমস্ত প্রাণীকুল বাকশক্তি হারাবে, জ্ঞান লোপ পাবে, মানুষ উন্মাদ হয়ে উঠবে। আর যদি ধর্মকে শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা না হয় ধর্ম অতিশয় রুষ্ট হবে। ধর্ম রুষ্ট হলে সেখানে অধর্ম এসে বিরাজ করবে। অনাচার অবিচারে দেশ ছেয়ে যাবে। মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হবে। রাজ্য ছারখার হবে। এদিকে কর্মকে যদি শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা না হয় তবে কর্মও রুষ্ট হবে। কর্মছাড়া হলে পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। মহারাজ, আমি কেবলই অমঙ্গলের সংকেত পাচ্ছি। আপনি অনুধাবণ করুন এবং সিদ্ধান্তে স্থির হোন। ত্রিপুরাধীশ্বর ও মহামন্ত্রীর এমন আলোচনাকালে সেখানে উন্মাদ প্রকৃতির এক যুবক এসে – দণ্ডায়মান হলো মহারাজকে কুর্নিশ করে বললে –'মহারাজের জয় হোক।'

ত্রিপুরাধীশ্বর যুবকের দিকে তাকালেন। বললেন কে তুমি ? কি চাও।

যুবক বললে – মহারাজ, আমি এক হতভাগা যুবক। তিন কুলে আমার কেউ নেই। আমি এতিম ও অসহায়। রাজ্যের অমঙ্গলের কথা জেনে আমি আপনার সকাশে এসেছি। দেবগণের শ্রেষ্ঠত্বের বিচারের ভার আপনি – আমায় অর্পণ করুন। আমার যেমন পাবার কিছু নেই, তেমনি হারাবারও কিছু নেই। দেব অভিশাপে যদি কারোর অমঙ্গল হয় তা আমারই হোক।

যুবকের দৃঢ় কণ্ঠের আর্জি ত্রিপুরাধীশ্বর বিচলিত হয়ে বললেন – 'এ অসম্ভব যুবক। রাজার দায়িত্ব রাজাকে সম্পাদন করতে দিন। পৃথিবীর দুঃখ যে হরণ করে, প্রজাবৃন্দের বিপদকে যে আপনার বলে গ্রহণ করে সেই তো রাজা। আপনার মঙ্গলের জন্যে যে অন্যের ঘাড়ে বিপদ চাপিয়ে দেয় সে তো পাতকি বৈ আর কিছু নয়।'

ত্রিপুরাধীশ্বরের এ হেন উক্তিতে মহামন্ত্রী করজোড়ে আবেদন জানালেন – রাজাধীশ্বর! আপনার কথা অতিশয় যুক্তিগ্রাহ্য। তবে এ কথাও ভুললে চলবে না যে আপনি ত্রিপুরাধীশ্বর। রাজ্যের বিচারকার্য সম্পাদনের কাজ তো বিচারপতিদের। তাছাড়া রাজার দুর্দিনে সাহায্য করাও প্রজাদের কর্তব্য। এ যুবক ঠিকই বলেছেন এবং যথার্থভাবে আর্জি পেশ করেছেন। এ যুবককে বিচারপতি নিয়োগ করে রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করে দিন মহারাজ। এ যুবকই দেবগনের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করুক।

মহামন্ত্রীর যুক্তি শুনে ত্রিপুরাধীশ্বর কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন 'যথার্থ।' তাই হোক।

রাজাধীশ্বরের আদেশ পেয়ে মহামন্ত্রী রাজ্যময় ফরমান জারী করে দিলেন এই মর্মে যে, দেবগণের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বিচার কার্যাদি সম্পাদন করবেন রাজ্যের প্রধান বিচারপতি।

পরের দিন যথাযথ বিচার কার্য আরম্ভ হলো। দরবার প্রাঙ্গণ শত সহস্র মানুষের পদচারনায় মুখরিত হয়ে উঠলো। দেবগণের মধ্যে কার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হবে মানব ও দেবগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। শ্রেষ্ঠত্বের বিচার প্রার্থী যথাক্রমে লক্ষ্মী,সরস্বতী, ধর্ম ও কর্ম। সুসজ্জিত পোশাকে বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন এক যুবক।

বিচারপতি লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করলেন : কে আপনি ? কোন গুণে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করছেন।

লক্ষ্মী : আমি লক্ষ্মী। পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীকুলের মাঝে আমি খাদ্যের যোগান দিয়ে থাকি। আমি প্রাণীকুলের মাঝে ঐশ্বর্য, যশ, খ্যাতি, শান্তি, প্রেমপ্রীতি ও মায়া মমতা বর্ষণ করে থাকি। আমি না থাকলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অশান্তিতে পরিণত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে।

বিচারপতি : উত্তম। কিন্তু, আমি যখন খাদ্যাভাবে অনাহারে ধুকে ধুকে মরছিলাম, আমার আত্মীয়স্বজন সমস্ত প্রকার মায়া মমতা বিসর্জন দিয়ে আমাকে ত্যাগ করে চলে গেলো, কোথাও এক মুঠো ভাত ভিক্ষা পাচ্ছিলাম না, তখন আমি প্রাণভরে আপনাকে স্মরণ করেছিলাম। প্রার্থনা করেছিলাম হে, ঐশ্বর্যদেবী, শান্তি প্রদায়িনী তুমি আমাকে রক্ষা করো। আপনি আমার প্রতি কৃপা করেন নি। তখন আপনি কোথায় ছিলেন ?

লক্ষ্মী : আপনার অদৃষ্টে তখন আপনাকে সাহায্য না করার স্রষ্টার বারণ ছিল। তাই আপনাকে সাহায্য করিনি।

বিচারপতি : যার সার্বভৌমত্ব নেই। যিনি অন্যের অধীনে পরিচালিত হন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কোথাও নেই। আপনাকে নির্বাসন দণ্ড দেয়া হলো। আপনি পাথর হয়ে ঊনকোটি পর্বতে বিরাজিত হোন।

এরপর আহবান করা হলো সরস্বতীকে।

বিচারপতি : আপনি কোন দেবতা। কিসের গুণে আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করছেন?

সরস্বতী : আমি বাগ্‌দেবী সরস্বতী। আমি প্রাণীকুলের অন্তরে বিরাজ করে তাদের ভাব প্রকাশ করি। আমি সাহায্য না করলে প্রাণীকুল বাকশক্তি হারিয়ে বোবা হয়ে যায়। জ্ঞান লোপ পায়। মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। অতএব,

আমিই শ্রেষ্ঠ।

বিচারপতি : উত্তম। আমি যথার্থভাবে বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। জ্ঞানী বলে আমাকে মানুষ সমীহ করতো। মনিপুর রাজকন্যার সয়ম্বর সভায় যখন রাজকন্যার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিলাম না,তখন ভক্তি ভরে আপনাকে স্তুতি করেছিলাম। আপনি আমাকে সাহায্য করেননি। তখন আপনি কোথায় ছিলেন!

সরস্বতি : ওই সময় আপনার গ্রহ বিপাক ছিল। আপনাকে সাহায্য করার বারণ ছিল। তাই সাহায্য করিনি।

বিচারপতি : তা হলে শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়। আপনাকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। আপনি ঊনকোটি পর্বতে পাথর হয়ে বিরাজিত হোন।

এরপর আহবান করা হলো ধর্মকে।

বিচারপতি : আপনি কোন দেবতা ? কিসে আপনি নিজকে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করছেন বলুন।

ধর্ম : আমি ধর্ম। আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণুতে বিরাজ করে কার্য সম্পাদন করে থাকি। আমি না থাকলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছন্দের পতন ঘটবে, দেব, দৈত্য, দানব ও মানবের মাঝে হানাহানি বেড়ে যাবে, পৃথিবী পাপে লিপ্ত হবে এবং ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। অতএব, আমিই শ্রেষ্ঠ।

বিচারপতি : আপনি উত্তম কথা বলেছেন। তবে যখন আমি এক রাজ কোষাধ্যক্ষের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে দিন যাপন করছিলাম তখন দুরাচার কোষাধ্যক্ষ রাজকোষের অর্থ তছরূপ করে আমাকে চোর সাব্যস্ত করে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষিপ্ত করলো। সে সময়ে আমি আপনাকে কায়মনবাক্যে স্মরণ করেছিলাম অপবাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে। আপনি আমাকে সাহায্য করতে আসেননি। তখন আপনি কোথায় ছিলেন ?

ধর্ম : তখন আপনার অদৃষ্টে লিখন ছিলো দুঃখ ভোগ করার। ওই সময় আপনাকে সাহায্য করার নিষেধ ছিলো, তাই সাহায্য করিনি।

বিচারপতি : নিষেধ ছিলো বলে আপনি সাহায্য করেননি এতে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় ? আপনাকে নির্বানকে দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। ঊনকোটি পর্বতে পাথর হয়ে বিরাজিত হোন।

সবশেষে ডাক পড়লো কর্মের।

বিচারপতি : কে আপনি ? আপনার এমন কি গুণ আছে যার জন্য নিজকে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করছেন ?

কর্ম : আমার নাম কর্ম। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ প্রাণীকুলের জন্মলগ্নে কার কি গতি হবে, কে কি কাজ সম্পাদন করবে, কার কি সুখ দুঃখ হবে, কে, কোথায়, কী

ভাবে জন্ম নেবে, মৃত্যু হবে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষেত্রে কী হবে আমি সব কিছু লিপিবিদ্ধ করে দিয়ে থাকি। আমার লিখন কোথাও এক বিন্দু নড়চড় হয় না এবং কারোর অধীনতা স্বীকার করে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাতেই অবস্থান করে। আমি কারোর বশ্যতা স্বীকার করি না। অতএব, আমিই শ্রেষ্ঠ।

কর্মের কথা শুনে দরবার প্রাঙ্গন মুহূর্তেই নীরব হয়ে গেল। বিচারপতি কিছুক্ষণ কর্মের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেনঃ হে কর্ম, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনিই দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হয় এর উর্ধ্বে আর কিছু নেই। আপনি বিজয়ী। আপনি দেবালোকে বিরাজিত হোন।

যুবক বিচারপতির অদ্ভুদ ও অপূর্ব বিচারে ত্রিপুরাধীশ্বর ও রাজ্যবাসী অতিশয় প্রীতিলাভ করলেন। মহারাজ উক্ত যুবককে পুরস্কার স্বরূপ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান বিচারপতি পদে বহাল রাখলেন এবং নিজ কন্যার সাথে বিবাহ দিলেন।

এদিকে স্বর্গলোক থেকে আসা এক কোটি দেবগণের মধ্যে কর্মই একমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে স্বর্গে ফিরে গেলেন। বাকী এক কম এক কোটি দেবতা ঊনকোটি পর্বতে পাথর হয়ে বিরাজিত হয়ে রইলেন। এ হেন অবস্থায় ত্রিপুরাধীশ্বর দেখলেন তাঁর রাজ্যে দেবগণের বিরাজিত হওয়াও বড়ই সৌভাগ্যর কথা। তিনি রাজ্যে রাষ্ট্রীয় আদেশ জারী করলেন এই মর্মে যে, ঊনকোটি পর্বতে স্বর্গের দেবগণ বিরাজিত আছেন। কাজেই এ ক্ষেত্রটি দ্বিতীয় অমরাবতী হিসাবে গণ্য হবে। এটি পূণ্যময় তীর্থ ক্ষেত্র হবে। তখন থেকে ঊনকোটি পর্বত ভারতবর্ষে একটি অন্যতম প্রধান তীর্থ ক্ষেত্র হিসাবে পূজিত হয়ে আসছেন। আর এক কম এক কোটি দেবতা বিরাজিত আছেন বলে এ তীর্থের নামাঙ্কিত হয়েছে 'ঊনকোটি।'

বলাবাহুল্য, ঊনকোটি পর্বতে গাত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে অসংখ্য দেবদেবীর প্রতিকৃতি। ত্রিপুরীদের বিশ্বাস নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে দেবগণ ঊনকোটি পর্বতে বিরাজমান হওয়ায় এতে দেবগণের অবয়ব প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলাধীন কৈলাসপুর মহকুমায় ঊনকোটি পর্বতের অবস্থান। বর্তমান কালেও ত্রিপুরাব্দে তালসালাং মাসের কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী তিথিতে এখানে তীর্থমেলা বসে।

সুখী রায় ও কুসুপ চান

ত্রিপুরা মহারাজা অরিজিতে রাজত্বকাল। তখন রাজ [১]চোন্তাই ছিলেন হারোংফা। তাঁর দুই স্ত্রী লক্ষ্মী ও চাখৌক। লক্ষ্মী বড়, চাখৌক ছোট। দুই স্ত্রীর দু'জন পুত্র সন্তান। বড় স্ত্রীর ছেলের নাম সুখী রায় আর ছোট স্ত্রীর ছেলের নাম কুসুপ চান। রাজ চোন্তাই হারোংফা বাড়িতে তেমন থাকতেন না। পূজা পার্বণের ব্যস্ততা নিয়ে রাজপ্রাসাদে বেশীরভাগ সময় কাটাতেন। যার ফলে দু'স্ত্রীর মধ্যে সখ্যতা কেমন ছিল চোন্তাই হারোংফা তা তেমন জানতেন না। তবে দু'ছেলের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল তা চোন্তাই মশাই ভালো করে জানতেন।

একদিন '[২]কেরপূজা' উপলক্ষে চোন্তাই হারোংফা পূজার প্রসাদ হিসাবে রাজপ্রাসাদ থেকে ৭টি আস্ত পাঁঠা, এক মণ দুধ, এক মণ দই, দু'কলসী মদ, দু'জোড়া রিসা[৩], দু'জোড়া রিনাই[৪] ও চার জোড়া দুবাতি[৫] পেলেন। পূজা উপলক্ষে প্রাপ্ত উপকরণগুলি বাড়িতে এনে চোন্তাই হারোংফা বিশ্রাম করলেন কিছুক্ষণ। তারপর ফের রাজ প্রাসাদ অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

এদিকে দু'স্ত্রী রান্নার জন্যে পাঁঠার মাংস কুটতে লাগল। মাংস কুটতে কুটতে হঠাৎ করে বড়'স্ত্রী লক্ষ্মী দেখে যে, ছোট বউ চাখৌক আস্ত কাঁচা মাংস লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছে। বড় বউয়ের মনে সন্দেহ জেগে উঠল। কাঁচা মাংস খাওয়া নিয়ে দু'বউয়ের মধ্যে বেশ করে কথা কাটাকাটি হলো। এক পর্যায়ে চাখৌক মুখ ফসকে বলে ফেলল, আগামী অমাবশ্যা তিথিতে আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব এই বলে রাখলাম।

ছোট বউয়ের মুখে প্রাণনাশের হুমকির কথা শুনে বড় বউ চোন্তাইকে ডেকে এনে সব বিষয় খুলে বলল। কিন্তু চোন্তাই বড় বউয়ের কোন কথাই বিশ্বাস করলো না। বড় বউ লক্ষ্মী সেদিন থেকে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে লাগল। লক্ষ্মী অনুভব করল সতীনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে একদিন, নিজ ছেলে সুখী রায়কে চুপিসারে ডেকে বলল, শোন বাবা - তোমার ছোট মা একজন রাক্ষুসী। যে কোন মুহূর্তে সে তোমার উপর আক্রমণ করতে পারে। তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো।

সুখী রায় ও কুসুপ চান দু'ভাই প্রতিদিন পাঠশালায় যায়। সেদিন ছিল শনিবার

ঘোর অমাবশ্যার দিন। বড় বউ লক্ষ্মী নিজ ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে এক কোটরা বুকের দুধ দিয়ে বললে – বাছা আমার, তোমাকে এই দুধের কোটরাটা দিলাম। আজ ঘোর অমাবশ্যা। আমার বিপদ আসতে পারে। তুমি পাঠশালায় গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে দুধের দিকে তাকাবে। যদি দেখো যে, দুধের রং লাল হয়েছে, তখন তুমি মনে করবে আমি বেঁচে নেই। তখন তুমি যে দিকে চোখ যায় পালিয়ে যাবে।

মায়ের কথা মতো সুখী রায় পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষণে ক্ষণে তাকিয়ে দেখে মায়ের দুধের রং পরিবর্তন হয়েছে কিনা। এক সময় হঠাৎ দেখে দুধের রং লাল হয়েছে। তখন সুখী রায় হু হু করে কেঁদে উঠল। পাশে বসা ছিল সৎ ভাই কুসুপ চান। বড় ভাই সুখীকে হঠাৎ করে কাঁদতে দেখে কুসুপ কারণ জিজ্ঞেস করল – দাদা, কী হল তুমি এভাবে কাঁদছ কেন? খুলে বল কী হয়েছে তোমার। পাঠশালায় সবাইকে হতবাক করে দিয়ে সুখী রায় বিস্তারিত কাহিনী খুলে বলল। এতে কুসুপ চান লজ্জায়, রাগে ও ক্ষোভে তার নিজের মাকে দেখতে বাড়িতে গেল। আর এদিকে সুখী রায় পাঠশালা থেকে বেরিয়ে যে দিকে চোখ যায় কেবল পালাতে লাগল।

কুসুপ চান বাড়িতে গিয়ে দেখে তার মা চাখৌক বড়মাকে মটকিয়ে রক্ত চুষে খাচ্ছে। ছেলেকে হঠাৎ সামনে দেখে প্রথমে থতমত খেল। তারপর আদরের সুরে বলল, আয় বাছা, দু'জনে মিলে লক্ষ্মীর কলিজাটা খেয়ে ফেলি। মায়ের রাক্ষুসি আচরণে কুসুপ চান মারতে গেল। কিন্তু পেরে না উঠে তড়িঘড়ি করে বাপের একখানি তরবারি নিয়ে ঘোড়ার পিঠে করে ছুটে পালাল। নিজের সন্তান কিনা দুশমন। এ ভেবে রাক্ষুসী চাখৌক ছেলেকে মেরে ফেলার জন্য বিদ্যুৎ বেগে পিছু নিল। কুসুপ চান যতই দ্রুত ছুটতে থাকে ততই চাখৌক বিদ্যুৎ বেগে কাছে গিয়ে পৌঁছে। শেষে জীবন বাজি রেখে খোলা তরবারি হাতে কুসুপ চান ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের উপর।

নাঙ্গা তরবারির এক কোপে মায়ের শিরচ্ছেদ করল। কুসুপচান দেখল খণ্ডিত দেহ মাটিতে পড়তে না পড়তে চাখৌকের দেহ থেকে এক জোড়া ভোঁমর বেরিয়ে উড়ে যাচ্ছে। কুসুপচান আর দেরী করল না। খপ করে ভোমরা জোড়াটি ধরে বাঁশের চোঙ্গায় পুরে রেখে দিল। চোঙ্গার ভেতর কিছুক্ষণ ছটফট করে চাখৌক চেঁচিয়ে উঠল – হারামির বাচ্চা!

রাক্ষসের ছেলে হয়ে তুই আমাকে মারলি। ছেড়ে দে আমাকে। নইলে তোর অমঙ্গল হবে।

রাক্ষুসি মায়ের কথায় কুসুপচানের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে জিজ্ঞেস করল,

এই ভোঁমরা জোড়া কী ? কোথায় উড়ে যাবে। যদি বলো তা হলে ছেড়ে দেব। আর যদি না বলো তা হলে এক্ষুণি ভোঁমরা জোড়াটি পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলব। ছেলের কথা শুনে রাক্ষুসী-চাখৌক চিৎকার করে উঠল। না মেরো না। ওই জোড়া ভোমরের মধ্যে রাক্ষস বংশের জীবন বাঁধা রয়েছে। সোনামণি আমার, আমি তোমার গর্ভধারীনি মা বলছি ভোমরা দু'টো ছেড়ে দে। তা হলে আমিও বেঁচে উঠব। লক্ষ্মী বাছা আমার, মাকে কষ্ট দিতে নেই। তুই আমার সাত জনমের বাপ। ভোমরা দু'টো ছেড়ে দে বাপ। রাক্ষুসি মায়ের কাছে সব কথা জেনে কুসুপচান বেরিয়ে পড়ল বড় ভাই সুখী রায়ের খোঁজে।

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে ব্রহ্মপুত্র নদের তেপান্তরের মাঠে সুখী রায়কে দেখতে পেয়ে কুসুপচান বিদ্যুৎ বেগে ঘোড়া চালাতে লাগল। এদিকে সুখী রায় ভয়ে আরো জোরে দৌড়াতে লাগল। কিন্তু কুসুপচান সুখী রায়কে ধরে ফেলল।

বলল – দাদা তোমার আর কোন ভয় নেই। মাকে আমি নিজ হাতে মেরেছি। আর এই দেখ ভোমরার জোড়া। এখানে রাক্ষস বংশের প্রাণ রয়েছে। এ দু'টোকে মারলে দুনিয়ার রাক্ষস কুপোকাৎ হয়ে যাবে। কুসুপচানের কথা শুনে সুখী রায় আমতা আমতা করে বলে উঠল। – তাহলে তো তুমিও মারা যাবে। কুসুপচান বললে – আরে ধ্যুৎ, আমি মারা যাব কেন ? আমি তো জন্মেছি মানুষের ঔরসে। আমার দেহে রাক্ষসের রক্তও মিশ্রণ আছে বৈ কি। ভোমরা দু'টো মারলে আমার দেহে জ্বালা পোড়া হবে – এই আর কি। তবে আমি প্রাণে মরব না।

কিছুক্ষণ যন্ত্রণা পেয়ে সেরে উঠব। বড়জোর মুর্ছা যেতে পারি। ব্যস। তারপর সুস্থ হয়ে সেরে উঠব। চল লোকালয়ে কোথাও গিয়ে রাত্রিযাপন করি। এ বলে দু'ভাই ঘোড়ার পিঠে চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে গেল।

এদিকে হলো কি রাক্ষুসী চাখৌকের মৃত্যুর সংবাদ জেনে দুনিয়ার সব রাক্ষসের মাথায় বাজ পড়ল। দলে দলে রাক্ষস বংশ জড়ো হতে লাগল। সবাই চিৎকার করে বলতে লাগল কেঁ মাঁরলঁ আঁমাঁদেঁরঁ বোঁনঁটাকেঁ ? চঁলঁ আঁমঁরাঁ সঁবাঁইঁ মাঁনুঁষঁ মেঁরেঁ রঁক্ত মাঁংসঁ খেঁয়েঁ মঁজাঁ কঁরিঁ। এ বলে রাক্ষসের দল বিপুল বিক্রমে মানুষের লোকালয়ে গিয়ে হত্যা যজ্ঞ শুরু করে দিল। রাক্ষসের সাথে মানুষের যুদ্ধ হল। কিন্তু রাক্ষসের সাথে মানুষ পারবে কেন ? রাজ্যের প্রজারা প্রাণের ভয়ে পালাতে লাগল। রাজ্যের প্রজারা দলে দলে এসে রাজধানী রাঙামাটিতে এসে জড়ো হল। (ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর নাম রাঙামাটি। বর্তমানে এ স্থানটি উদয়পুর নামে খ্যাত। এখানকার ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির বিশ্ববিখ্যাত)

ত্রিপুরা মহারাজা দরবার আহবান করে প্রজাদের কথা শুনলেন। সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন রাক্ষস বংশকে হত্যা করে প্রজাকুলকে রক্ষা করতে। সেনাপতি

নির্দেশ পেয়ে শত সহস্র সৈন্য নিয়ে রাক্ষসদের সাথে যুদ্ধ করল। কিন্তু রাক্ষসের সাথে যুদ্ধে জয়ী হতে পারল না। পারবেই বা কী করে ? এক রাক্ষস মরে তো শত রাক্ষস জন্ম নেয়। রাক্ষসের এক ফোটা রক্ত মাটিতে পড়বে তো আর এক রাক্ষস জন্ম নিয়ে যুদ্ধে মেতে উঠে। রাক্ষসের বংশ বিস্তারে যুদ্ধে পেরে না উঠে সৈন্যরা নিজ নিজ প্রাণ নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালাতে লাগল। সৈন্যদের পরাজয়ের খবর শুনে ত্রিপুরা মহারাজা স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। না, রাক্ষসদের সাথে যুদ্ধে পেরে উঠা সম্ভব না। অনেক ভেবে চিন্তে মহারাজা যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাদা পতাকা উড়ালেন এবং রাক্ষসদের ডেকে পাঠালেন।

মহারাজার আহবানে রাক্ষসরা হাঁউ মাঁউ খাঁও, মাঁনুষের গঁন্ধ, পাঁও, বিকট চিৎকার করে রাজ সকাশে এসে জড়ো হল। পারলে রাজাকেও চিবিয়ে খায় আর কি। মহারাজা হুংকার দিয়ে বললেন – তোমরা কি চাও।

আমার প্রজারা কী অপরাধ করেছে যে তোমরা দলে দলে এসে প্রজাদের হত্যা করছ ?

মহারাজার কথা শুনে রাক্ষস সর্দার বুক ফুলিয়ে, ইয়া লম্বা দাঁত খেঁচিয়ে বললো – 'আঁপঁনাঁর প্রঁজাঁরা দোঁষ কঁরেঁনি মাঁনেঁ। তাঁরা আঁমাঁদেঁর বোঁন চাঁখোঁকঁকে হঁত্যা কঁরেঁছেঁ তাঁই আঁমঁরা তাঁর বঁদঁলা নিঁচ্ছিঁ। মঁহাঁরাজ, যঁদি আঁপঁনি চাঁখোঁকেঁর হঁত্যাঁকাঁরীকেঁ ধঁরেঁ আঁমাঁদেঁর হাঁতেঁ তুঁলেঁ দেঁন তাঁ হঁলেঁ আঁমঁরা আঁর হঁত্যা যঁজ্ঞ চাঁলাঁবঁ নাঁ। তঁবেঁ যঁতঁদিঁন হঁত্যাঁকাঁরীকেঁ পাঁওঁয়া নাঁ যাঁবেঁ তঁতঁদিঁন আঁপঁনিঁই আঁমাঁদেঁর বঁলেঁ দিঁন আঁমঁরা আঁপঁনাঁর রাঁজ্যেঁর কোঁন এঁলাঁকাঁয় হঁত্যাঁযঁজ্ঞ চাঁলাঁব। সঁব রাঁক্ষঁস রঁক্তেঁর নেঁশাঁয় মেঁতেঁ উঁঠেঁছেঁ তাঁদেঁর দঁমাঁনোঁ যাঁবেঁ নাঁ। মঁহাঁরাঁজ আঁপঁনি,রাঁজঁধাঁনীতেঁ চঁলেঁ যাঁন। আঁমঁরা প্রঁতিঁদিঁন এঁকবাঁর কঁরেঁ আঁপঁনাঁর সাঁথেঁ দেঁখাঁ কঁরঁব আঁর আঁপঁনাঁর নিঁর্দেঁশঁ মঁত হঁত্যাঁযঁজ্ঞ চাঁলাঁবঁ। হিঁ হিঁ হিঁ হুঁ হুঁ হুঁ ...।

ত্রিপুরা মহারাজা কী আর করবেন রাক্ষস সর্দারের কথা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। এদিকে সুখী রায় ও কুসুপচান তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে এক গ্রামে এসে প্রবেশ করল। কিন্তু দেখল কোন জন মানুষের চিহ্ন নেই। সবখানে রক্ত আর সদ্য মরে যাওয়া মানুষের কঙ্কাল। দু'ভাইয়ের বুঝতে দেরী হল না। তারা ধীরে ধীরে উত্তরে অগ্রসর হয়ে দেখল দূরে রাজ প্রাসাদের চূড়া দেখা যাচ্ছে। দু'ভাই রাজ প্রাসাদে গিয়ে প্রবেশ করল। দেখল,মহারাজা রাজ্যের মন্ত্রী ও পাত্র মিত্র নিয়ে দরবার করছেন। তাদেরকে রাজ দরবারে ঢুকতে দেখে সবাই থর থর করে কাঁপতে লাগল। কুসুপচান মহারাজাকে কুর্নিশ করে বলল – মহারাজ আমরা দু'ভাই আপনার রাজ্যের প্রজা হই। আপনার আদেশ পেলে আমরা রাক্ষসদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি।

দু'ভাইয়ের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে মহারাজা-দরবারে ঘোষণা করলেন –'যদি রাক্ষস বংশ মেরে আমার এই সোনার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রজাদের মাঝে শান্তি এনে দিতে পার তা হলে আমি তোমাদের আমার রাজ্যের অর্ধেক অংশ দান করব এবং রাজ কন্যাদের সাথে তোমাদের পছন্দমত দু'জনকে দিয়ে দেব।'

মহারাজার আদেশ পেয়ে সুখী রায় ও কুসুপচান রাক্ষস মারার জন্য প্রস্তুত হল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসের দল হুড়মুড় করে রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়ল। তারা মহারাজাকে জিজ্ঞেস করল মঁহাঁরাঁজ আঁজঁ কোঁন গ্রাঁম সাঁবাঁড়ঁ কঁরঁতেঁ হঁবেঁ বঁলুঁনঁ! মহারাজা বললেন – আজ আমি দু'জন যুবককে রাজ ক্ষমতা দিয়েছি। তারাই বলে দেবে কোথায় কী করতে হবে।

সুখীরাম ও কুসুপচানকে দেখে রাক্ষসদের মুখে লালা পড়তে লাগল। এক রাক্ষস বলে উঠল সর্দার একজনের গায়ে আমাদের মত গন্ধ পাচ্ছি। তারা আমাদের মত রাক্ষস খোক্ষস নয় তো ? অন্যরা বলে উঠল – হলেই বা কী ?

আমরা শুধু চাই মানুষের তাজা রক্ত ও কলিজা।

এ সময়ে কুসুপচান চিৎকার করে রাক্ষসদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল। এই যে অসুর যবনের দল। তোমরা সবাই প্রাসাদ ছেড়ে আস্তাবল মাঠে গিয়ে দাঁড়াও। আজ তোমাদেরকে এ রাজ্যের সব মানুষকে মেরে ফেলতে হবে। এ কথা শুনে রাক্ষসেরা উন্মাদনায় লাফিয়ে লাফিয়ে আস্তাবল মাঠে গিয়ে জড়ো হল।

কুসুপচান রাক্ষসদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল – তোমরা কি আজ এক রাতের মধ্যে রাজ্যের সব মানুষকে মেরে ফেলতে পারবে ? রাক্ষসেরা বলে উঠল - পাঁরঁবঁ পাঁরঁবঁ।

কুসুপচান বলল – খুব ভাল কথা। তবে একটা শর্ত আছে। তোমাদের সবাইকে এখানে এসে জড়ো হতে হবে। রাক্ষসেরা শর্ত মেনে নিল। এবং বিদ্যুৎ বেগে খবর পাঠিয়ে সবাইকে জড়ো করল। আর চেঁচামেচি করতে লাগল – কোঁন দিঁকঁ থেঁকেঁ শুঁরুঁ কঁরঁতেঁ হঁবেঁ।?

এরপর কুসুপচান তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বাঁশের চোঙা থেকে ভোমরা জোড়া বের করে বলল – এটা কি তোমরা চেন ? ভোমরা জোড়া দেখে রাক্ষসগণ এক সঙ্গে তারস্বরে চিৎকার করে বলে উঠল – ওঁরেঁ বাঁবাঁরে মঁরেঁ গেঁলাঁমঁ রেঁ। ছাঁড়োঁ ছাঁড়োঁ ভোঁমঁরাঁ দুঁটোঁ ছাঁড়োঁ। কুসুপচান বলল – তা ছাড়বো। তবে তোমরা আর একটু দূরে সরে যাও। রাক্ষসেরা হুকুম তামিল করে দূরে সরে গেল।

তারপর – তারপর – তারপর

কুসুপচান ভোঁমরা জোড়াটা পায়ের তলায় রেখে পিষে মেলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সব রাক্ষসের দল বিকট চিৎকার করতে করতে একে একে মরে গেল। সোনার

ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি ফিরে এল। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। ত্রিপুরা মহারাজা প্রতিজ্ঞা পালন করলেন। দু'ভাইকে রাজ্যের অর্ধেক অংশ দান করে দিলেন। সে সাথে দু'রাজকন্যার সাথে বিবাহ দিলেন। তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে রাক্ষসের উৎপাত বন্ধ হয়ে গেল আর প্রজারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। এরপর, মহারাজা রাজ বিচকারকে[৬] ডেকে নির্দেশ দিলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা যাতে জানতে পারে এই রাক্ষস নিধন কাহিনী লিখে রাখতে।

পাদটীকা

১। চোন্তাই : পুরোহিত। যিনি চতুর্দশ দেবতা পূজা করতে সক্ষম ত্রিপুরা রাজ্যে তাঁকে চোন্তাই বলে। এটি পদ ও উপাধি বিশেষ।

২। কেরপূজা : ত্রিপুরীদের একটি মহাপূজা। শ্রাবণ মাসের অমাবশ্যা তিথিতে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যবাসীর সার্বিক মঙ্গলের জন্য এ পূজা করা হয়।

৩। রিসা : ত্রিপুরী নারীদের বক্ষ বন্ধনী কাপড়কে রিসা বলে।

৪। রিনাই : ত্রিপুরী নারীদের পরিধেয় বস্ত্রকে রিনাই বলে।

৫। দুবাতি:ত্রিপুরী রমণীদের হাতে বয়ন করা চাদর জাতীয় বস্ত্রকে দুবাতি বলে।

৬। বিচকার : যিনি ইতিহাসের চমকপ্রদ তথ্য ও বিস্ময়কর কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন তাকে ত্রিপুরা ভাষায় বিচক বলে।

কওয়াই কেন্দারাই

সত্য যুগ। ত্রিপুরা রাজাধিরাজ চিত্রাযুগের রাজত্বকাল। রাজার দুই রাণী। বড় রাণীর নাম কাচাকতি আর ছোট রানীর নাম কসমতী। বড় রাণী ধীর স্থির প্রকৃতি স্বভাবের আর ছোট রাণী চঞ্চলমতি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি স্বভাব প্রকৃতির। বড় রাণী নিজের জন্য ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেন না। তিনি রাজ্যের মঙ্গল কামনা করতেন এবং জনহিতকর কাজে মনোনিবেশ করতেন। ছোট রাণী কিন্তু রাজ্যের কি হবে না হবে এমন ধার ধারতেন না। হিরা-মানিক-মুক্তা নিয়ে সারা দিন ব্যস্ত থাকতেন আর বিকাল বেলা রথে চড়ে বায়ু সেবনে ভালোবাসতেন।

রাজ প্রাসাদের দক্ষিণ বনে ছিল এক বিশাল শিরপাং গাছ। এক পায়ে খাড়া তাল গাছের মত। এতবড় বিশাল গাছ রাজ্যে আর কোথাও ছিল না। এই গাছটাকে ছোট রাণী মোটেই পছন্দ করতো না। কিন্তু বড়রাণী পছন্দ করতো। বড়রাণী ভাবতে থাকে কীভাবে প্রজাদের জন্য ভালো কাজ করা যায়। তিনি ভাবলেন বর্ষার মৌসুমে প্রজারা বিশেষ করে মহিলারা কষ্ট পায় ধান ভানতে। তিনি ভাবলেন ঐ বিশাল গাছ দিয়ে ঢেঁকি বানাবেন এবং শুকনা মৌসুমে সৈন্য সামন্ত দিয়ে ধান ভেনে চাউল মজুদ করে রাখবেন। যাতে বর্ষা মৌসুমে প্রজাদের মাঝে বিতরণ করা যায়। বড়রাণী রাজার সমীপে মনের কথা খুলে বললেন। এতে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে বড় রাণীর আবেদন মঞ্জুর করলেন। কিন্তু বড়ই বিপাকে পড়ে গেল-শিরপাং গাছকে নিয়ে। এত বিশাল গাছকে কেটে ঢেঁকি বানাতে কেউ সাহস পেল না। রাজ্যে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা দেয়া হল যে, যে ব্যক্তি শিরপাং গাছকে কেটে রাজ ঢেঁকি বানাতে পারবে রাজা তাকে দৈনিক দুই হাজার রাং (মুদ্রা) ও রাজ মিস্ত্রীর খেতাবে ভূষিত করবেন। একদিন দুই দিন – এভাবে সাতদিন ঘোষণা দেয়ার পর রাজ্যের উত্তর প্রান্ত থেকে একজন প্রজা এ প্রস্তাবে রাজী হল। রাজা হৃষ্টচিত্তে তাকে রাজ খেতাব 'রাজানি পইস্কে তান নাই' অর্থাৎ রাজ মিস্ত্রী উপাধী দিয়ে কাজ করার অনুমতি প্রদান করলেন।

রাজমিস্ত্রী কাজে মনোনিবেশ করলেন কিন্তু বিবাদ দেখা দিল একটা। দিনে চার আঙ্গুল পরিমান কেটে আসে তো রাত্রে আট আঙ্গুল পরিমাণ গাছ বেড়ে উঠে। ইত্যবসরে বারো বছর পার হয়ে গেল-গাছ কাটা আর শেষ হলো না। রাজার ঢেঁকিও আর বানানো গেল না। রাজমিস্ত্রী গাছ কেটেই চলেছে ফি বছর। এ

দিকে হল কি রাজমিস্ত্রীর বউ জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে পাওয়া নাগরাজার মল পেয়ে ছয় ছেলেকে রান্না করে খাওয়াতেই ছেলেরা আরো খাওয়ার জন্য মাকে নাগরাজার মল কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞেস করল। ছেলেদের কথা শুনে মা আঁতকে উঠলেন, বললেন তোমরা কখনও নাগরাজার সন্ধান করো না। নাগরাজার নিকট গেলে কেউ ফিরে আসতে পারে না। যাকে বলে নাগরাজা। যার নিঃশ্বাসের বিষে তিন মাইলের মধ্যে জীবন্ত মারা পড়ে। সে নাগরাজাকে মেরে তার মাংস খাওয়া একটা চিন্তাতীত বিষয়। কিন্তু ছেলেরা নাছোরবান্দা, নাগ রাজার সন্ধানে যাবেই। মায়ের চিন্তার শেষ নেই। ছেলেদের বাপ ঘরে থাকলে না হয় বুঝানো যেত। সে যে রাজমিস্ত্রী হয়ে গেছে আর ফিরবার নাম নেই। এদিকে ছেলেরা ছয় কলসী পানি রেখে মাকে বলে গেল যেদিন এই কলসীর পানি শুকাবে মনে করবে আমরা আর বেঁচে নেই। আর যদি কলসীর পানি ঠিক থাকে তখন মনে করবে আমরা বেঁচে আছি। একথা বলে ছয় ছেলে বেরিয়ে পড়ল নাগ রাজার সন্ধানে। মা প্রতিদিন তিন বার করে কলসীর পানি দেখেন কোন পরিবর্তন হয়েছে কি-না।

অনেক চড়াই-উৎরাই বন জঙ্গল পেরিয়ে ছেলেরা নাগ রাজার সন্ধান পেলো। সন্ধান পেয়ে খুশীতে আত্মহারা হয়ে তারা নাগ রাজাকে যার যেমন শক্তি আছে মারতে লাগল। নাগ রাজাকে মারতে মারতে ছয়ভাই দুর্বল হয়ে পড়ল। তখন নাগ রাজা বলে উঠলো তোমাদের শক্তি দেখলাম। এবার আমার ক্ষমতা দেখ এই বলে ছয়ভাইকে গ্রোগ্রাসে গপাগপ গিলে ফেলল। একদিন তাদের মা দেখেন ছয়টি কলসীর পানি শুকিয়ে গেছে। ছেলেরা বেঁচে নেই-মা কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঝাঁড়ুও দিতে ছিলেন। ঝাঁড়ু দিতে দিতে হঠাৎ একটি সুপারী পেয়ে তা কোমরে পেঁচিয়ে রাখলেন। রাত্রে খাবারের পর সুপারীর কথা মনে পড়তেই দেখেন কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

দিন যায় রাত আসে। রাজমিস্ত্রীর বউয়ের শারীরিক লক্ষণও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তলপেট ক্রমে ক্রমে স্ফীত হয়ে উঠতে থাকে। সাত মাসের মাথায় রাজমিস্ত্রীর বউ স্বামী ব্যতিরেকে একটি পুত্রসন্তান লাভ করল। লজ্জায় ও ক্ষোভে রাজমিস্ত্রীর বউ কাউকে কিছু না বলে চুপিসারে অলৌকিকভাবে পাওয়া সন্তানকে লালন পালন করতে লাগলেন। ক্রমে সন্তানটি বড় হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করল: মা, বাবা কোথায় ? সবার বাবা আছে আমার বাবা কি নেই ? ছেলের কথায় মা অনেক ভেবে চিন্তে বলল-কেন থাকবে না। নিশ্চয় তোমার বাবা আছে। তবে এ গ্রামে নেই। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে রাজার বাড়িতে কাজ করার জন্যে যে গেছে সে আজো ফেরেনি। আমি জানি না সে বেঁচে আছে কি না ? ছেলেটি ফের

জিজ্ঞাসা করল বাবা না হয় রাজার বাড়িতে গেছে-আমার কি ভাই বোনও নেই ? মা বাধ্য হয়ে সব খুলে বললেন। সব শুনে ছেলে বলে উঠল– মা আমার নাম নেই কেন ? সবার নাম থাকে আমার নেই কেন ? ছেলের এহেন প্রশ্নে মা তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে পারল না। অনেক ভেবে চিন্তে বললেন, তোমার নাম হচ্ছে 'কওয়াই কেন্দারাই'। ত্রিপুরা ভাষায় কওয়াই অর্থ হচ্ছে সুপারী-আর কেন্দারাই অর্থ হচ্ছে শক্তিমান। সুপারী থেকে জন্ম বলে মা ছেলের নাম রাখলেন 'কওয়াই কেন্দারাই।'

কওয়াই কেন্দারাই বড় হয়ে প্রথমে বাবার খোঁজে রাজপ্রাসাদে যাবার মনস্থ করলো। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মাকে গিয়ে বলল মা-আমি আগামীকাল বাবাকে আনতে রাজপ্রাসাদে যাবো। তুমি শুধু বলে দাও রাজপ্রাসাদটা কোন দিকে। স্বামীকে হারিয়ে, ছয় ছেলেকে হারিয়ে মা কওয়াই কেন্দারাইকে বুকের ধন বলে আশ্বস্ত হয়েছিল। ছেলে রাজপ্রাসাদে যাবে জেনে মনে ভয় পেলেন। পাছে এই ছেলেটাও যেন হারিয়ে না যায়। কিন্তু ছেলের জিদ দেখে বললেন, দক্ষিণ দিকে।

পরদিন সকালে কওয়াই কেন্দারাই তড়িঘড়ি করে ভাতের মোচা, তরকারীর মোচা একটি গামছায় বেঁধে বাবার খোঁজে রাজপ্রাসাদের অভিমুখে রওনা হল। যেতে যেতে সে রাজপ্রাসাদে পৌঁছে গেল। রাজপ্রাসাদ দেখে তো তার চোখ ছানাবড়া। এমন সুন্দর ও বিলাসবহুল প্রাসাদ সে তার জীবনে কখনো দেখেনি। মনে মনে ভাবল এমন না হলে কি লোকে রাজপ্রাসাদ বলে ? এসব ভেবে যে ভেতরে ঢুকতে যাবে অমনি একজন রাজসেপাই পথ অবরোধ করে পরিচয় জানতে চাইল। কওয়াই কেন্দারাই নিজের নাম বলল। সেপাই আবার জিজ্ঞেস করল বাবার নাম কি ? কি কারণে তুমি এখানে এসেছ ? কওয়াই কেন্দারাই পড়ল মহা মুশকিলে। কারণ বাপের নাম সে সত্যি সত্যি জানে না। শেষ মেশ সে সত্যি কথাই বলল আমি আমার বাবার নাম জানি না। আমার ছোট বয়সে তিনি এখানে এসেছেন রাজমিস্ত্রী হয়ে। সেপাই বলল, রাজ মিস্ত্রী তো অনেকেই আছে। বাপের নাম বলতে না পারলে ভেতরে যাওয়া হবে না। কওয়াই কেন্দারাই এর ইচ্ছা হল এক থাপ্পরে সেপাইকে যমের বাড়ি পাঠাতে কিন্তু তাৎক্ষণিক রাগ সংবরণ করল।

তাদের এই কথাবার্তা বড়রাণী প্রাসাদের চূড়া থেকে শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি সেপাইকে নির্দেশ দিলেন আগন্তুককে তাঁর কাছে পাঠাতে। বড় রাণীর নিকট গিয়ে টুক করে প্রণাম করে 'কওয়াই কেন্দারাই' তার আগমনের বিস্তারিত কাহিনী খুলে বললো। কওয়াই কেন্দারাই এর বলার ভঙ্গিমা ও সুঠাম দেহ দেখে

বড় রাণীর দয়ার উদ্রেক হল। তিনি প্রাসাদের চূড়া থেকে দক্ষিণ দিকে বিশাল শিরপাং গাছটা দেখিয়ে বললেন-ঐ গাছটাকে তোমার বাবা আজ ৪০ বছর ধরে কাটছে। কিন্তু আজো কাটা শেষ করতে পারেনি। তোমার বাবা জীবনে কখনো গাছটাকে কেটে শেষ করতে পারবে বলে মনে হয় না। তুমি তোমার বাবাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তাকে বলো বড় রাণী তোমাকে মুক্তি দিয়েছেন। কথাটা শুনে কওয়াই কেন্দারাই ছুটে চলল দক্ষিণ দিকে। গিয়ে দেখে ভাল্লুক আকারের একজন লোক অবিরত গাছ কেটে চলেছে। বছরকে বছর দাড়ি-গোঁফ না কাটার ফলে কওয়াই কেন্দারাই এর বাপকে ভাল্লুকের মত দেখাচ্ছিল। কওয়াই কেন্দারাই তার বাবার কাছে গিয়ে বলল-বাবা আমি এসে গিয়েছি। আমি তোমার ছেলে। তোমাকে বাড়িতে নিতে এসেছি। বড় রাণী তোমায় মুক্ত করে দিয়েছেন। ছেলেকে দেখে এবং সব কথা জেনে তিনি বললেন নিশ্চয় বাড়িতে যাব। তবে আফসোস এ গাছটাকে কেটে শেষ করতে পারলাম না। দিনে চার আঙ্গুল কাটে তো রাতে আট আঙ্গুল বাড়ে। তাজ্জব গাছ। বাপের মুখে কথাটা শুনে কওয়াই কেন্দারাই গাছটার দিকে একবার তাকাল। তারপর বাপকে বলল তুমি চলো তো দেখি। আমি গাছটাকে নিয়ে আসছি-এই বলে 'কওয়াই কেন্দারাই' বিশাল গাছটাকে উপরে ফেলে কাঁধে নিয়ে চলল-রাজ প্রাসাদের দিকে। ছেলের এমন শক্তি দেখে তার বাবার বিস্ময়ের শেষ হলো না। প্রাসাদের নিকটে এসে কওয়াই কেন্দারাই ধপাস করে কাঁধ থেকে গাছটাকে ফেলে দিলো। বিকট আওয়াজ শুনে রাজা মন্ত্রী, সৈন্য-সামন্ত এসে দেখেন এক যুবক শিকড় শুদ্ধ শিরপাং গাছটা উপড়ে এনেছে। রাজা মন্ত্রীর বিস্ময়ের অবকাশ রইল না। রাজ্যে এমন বীর জোয়ান থাকতে পারে তা তাদের কল্পনাতীত ছিল। রাজা যুবকটির পরিচয় জানতে চাইলেন বললেন, যুবক কী তোমার নাম ? তুমি কি পুরস্কার চাও বল ? কওয়াই কেন্দারাই বলল, আপনারা এত বড় নিষ্ঠুর যে, যে লোক ৪০ চল্লিশ বছর ধরে গাছ কেটেই চলেছে তার প্রতি আপনারা সদয় ব্যবহার করেননি। আমি আপনার রাজমিস্ত্রীর ছেলে। আমার নাম কওয়াই কেন্দারাই। এক্ষুনি নাপিত এনে বাবার দাড়ি গোঁফ কামাবার ব্যবস্থা করে দিন এবং ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করে তাকে মুক্ত করে দিন। তা না হলে এ গাছটা দিয়ে প্রাসাদ শুদ্ধ সবাইকে মেরে যমালয়ে পাঠাব। কথাটা শুনে রাজা মন্ত্রী ভয় পেয়ে সব ব্যবস্থা করলেন। কী জানি কোন অঘটন যদি বাঁধিয়ে দেয়। পাওনা দানা বুঝিয়ে নিয়ে বাবাকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরলেন-কওয়াই কেন্দারাই।

বাড়িতে কয়েকদিন থাকার পর তার মনে পড়ল ভাইদের কথা। মা বলেছিলেন নাগ রাজাকে মারতে গিয়ে তারা আর ফিরে আসেনি। তাদের খোঁজ নেয়া দরকার।

যেই ভাবা সেই কাজ। মা বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। শত নিষেধ সে মানলো না। তার প্রতিজ্ঞা নাগ রাজাকে মারতে হবে। কত চড়াই উৎরাই পাহাড় পর্বত বনজঙ্গল পেরিয়ে গেল কিন্তু কোথাও নাগ রাজার সন্ধান সে পেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে নাগ রাজার সন্ধান পেল। তখন নাগ রাজা সবেমাত্র ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল। সামনে তরতাজা সুঠাম দেহের অধিকারী এক মনুষ্য সন্তানকে দেখতে পেয়ে প্রাতঃরাশ করার মনস্থ করল। তথাপি সে মনুষ্য সন্তানকে জিজ্ঞাসা করল, কে রে তুই-আমার আস্তানায় ? তোমার কি প্রাণে এতটুকু ভয় নেই-যে আমার আস্তানায় এসেছো ? কওয়াই কেন্দারাই বলল ভয় কাকে বলে আমি জানি না। আমি তোমার খোঁজে এসেছি। যদি তোমার প্রাণের মায়া থাকে তো আমার ছয় ভাইকে ফিরিয়ে দাও। নতুবা তোমার মৃত্যু অতি সন্নিকটে। এহেন কথা শুনে নাগ রাজা কওয়াই কেন্দারাইকে যেই গিলতে যাবে তখন শুরু হল ঘোরতর যুদ্ধ। কেউ কারো কম যায় না। কওয়াই কেন্দারাই যতই বিশাল গাছ দিয়ে মারতে থাকে নাগ রাজা সব কিছু গিলে ফেলে। শেষে কওয়াই কেন্দারাই নাগ রাজার লেজ ধরে শূন্যে ভীষণভাবে ঘোরাতে লাগল। নাগ রাজা যে সব জীবন্ত গাছ পালা গিলেছিল এক একে একে সব উগরে ফেলতে হল। কওয়াই কেন্দারাই বলে উঠল, আমার ভাইদের গিলেছিস তাদের বের করে দে। অগত্যা নাগ রাজা উগরে ফেলল। কওয়াই কেন্দারাই দেখে ভাইদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। মাংস হজম হয়ে গিয়ে হাড়গোড় ছাড়া অবশিষ্ট আর কিছুই নেই। রাগে এক আছাড় মেরে নাগ রাজাকে বলল ভাইদের প্রাণে বাঁচিয়ে দে। নইলে আজ তোর ভবলীলা সাঙ্গ করব। নাগ রাজা উপায়ান্তর না দেখে বলল, ঐ যে ঝোঁপের ভিতর তালপাতার মত একটি পাখা দেখতে তা দিয়ে বাতাস করলে তোমার সব ভাইয়েরা বেঁচে উঠবে। তাড়াতাড়ি পাখা এনে বাতাস করতে লাগল এবং আস্তে আস্তে মৃত ভাইয়েরা প্রানে বেঁচে উঠলো।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল-ছয় ভাই পুনঃজীবন ফিরে পেয়ে তারা এতদিন যে নাগ রাজার পেটে পঁচে গলে মরে পড়েছিল তা বেমালুম ভুলে গেল। নাগরাজাকে মেরে বাঁশের কাবাং তৈরী করে টুকরো টুকরো কেটে নাগ রাজার মাংস বাড়িতে নিয়ে চলল। কিছু দূর যাবার পর দেখল কে যেন তাদের পেছনে পেছনে চলে আসছে। তারা নিজেদের গুনিয়ে দেখল, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়-সাত। বড় ভাই বলে উঠল আমরা তো মোটেই ছয় ভাই-আর একজন কোত্থেকে এলো। একে বাঘের রাস্তায় বেঁধে রাখ। বাঘ এসে মেরে ফেলুক। ছয় ভাই কওয়াই কেন্দারাইকে ধরে বাঘের রাস্তায় বেঁধে রেখে চলে গেল। অসীম বলশালী

কওয়াই কেন্দারাই যে তাদের ছোট ভাই তা তারা জানতো না। চোখের পলকে বাঁধন ছিঁড়ে কওয়াই কেন্দারাই আবার দলের পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। আবার গুনে দেখা হল-এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়-সাত।

আবার একজন বেশী। বড় ভাই হুকুম দিলো তাকে হাতীর রাস্তায় বেঁধে রাখো। হাতী এসে তাকে মেরে ফেলুক। ছয় ভাই আবার কওয়াই কেন্দারাইকে ধরে হাতীর আসা যাওয়া রাস্তায় বেঁধে রেখে গেল। এভাবে তারা বাড়ি পৌঁছে গেল। মা বললেন, তোমরা তো ফিরে এসেছ বাবা। কিন্তু তোমাদের ছোট ভাই কওয়াই কেন্দারাই তোমাদের খুঁজতে গিয়েছিল, সে তো এখনো ফিরে এলো না। ছয়ভাই এক সঙ্গে বলে উঠল, তাই নাকি? আমরা তো তাকে হাতীর রাস্তায় বেঁধে এসেছি। কওয়াই কেন্দারাই বাড়ির পেছনে লুকিয়ে ছিল। সে তাৎক্ষণিক এসে আগাগোড়া সব কাহিনী খুলে বলল। এতে ছয় ভাই লজ্জিত হয়ে মাফ চেয়ে নিল।

সাতভাই একত্রে কয়েক দিন বাড়িতে থাকার পর কওয়াই কেন্দারাই দেশ ভ্রমণ করতে মনস্থ করল। ছয় ভাইয়ের উপর মা বাবার দায়িত্ব অর্পণ করে সে বেরিয়ে পড়ল দেশ ভ্রমণে। যেতে যেতে সে দেখতে পেলো– এক শক্তিমান লোক সমুদ্রের তীরে আস্ত একটা হাতী বড়শীতে গেঁথে সমুদ্রে মাছ শিকার করছে। সে তার কাছে গিয়ে বলল, ও ভাই তোমার মত বলশালী লোক তো এ দুনিয়ায় দেখিনা। বলশালী লোকটি বলল, আমি তো একজন নগণ্য মাত্র। শুনেছি কওয়াই কেন্দারাই নাকি আরো শক্তিশালী। তার তুলনাই হয় না। তখন কওয়াই কেন্দারাই নিজের পরিচয় দিয়ে বলল আমিই সে ব্যক্তি। তারপর তারা দু'জন বন্ধুত্ব স্থাপন করে দেশ ভ্রমণে বের হলো। যেতে যেতে তারা দেখতে পেল এক বলশালী লোক আস্ত একটা বাড়ি কাঁধে রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা তার কাছে গিয়ে শক্তির প্রশংসা করল। বলশালী লোকটা বলে উঠল আমি কি বলশালী আমার চেয়ে বলশালী কওয়াই কেন্দারাই। তার তুলনা হয় না। কওয়াই কেন্দারাই নিজের পরিচয় দিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তিন বন্ধু দেশ ভ্রমণে বের হলো। যেতে যেতে তারা দেখল এক শক্তিশালী লোক সমুদ্রে নেমে এক হাতে পানি আটকিয়ে আর এক হাতে পানি হিচাচ্ছে। এ রকম তাজ্জব ব্যাপার দেখে তারা তিনজন তার শক্তির তারিফ করলো। শক্তিশালী লোকটি বলল আমি তো একজন নগণ্য মাত্র। শুনেছি কওয়াই কেন্দারাই নাকি আরো বেশী শক্তিশালী। তার তুলনা তো মেলা ভার। কওয়াই কেন্দারাই নিজের পরিচয় দিয়ে তার সঙ্গেও বন্ধুত্ব স্থাপন করল। তারপর চার শক্তিশালী বন্ধু মিলে দ্বিগ্বিজয়ে বের হল। যেতে যেতে তারা আর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কাউকে খুঁজে পেল না। তারপর তারা স্থির করল বিশাল বাড়ি তৈরী করে একত্রে বসবাস করবে। যেই ভাবা সেই

কাজ। রাতারাতি তারা এক বিশাল বাড়ি তৈরী করে ফেলল। শুধুমাত্র সমস্যা দেখা দিল আগুনের। অবশেষে তারা দেখতে পেলো দূরে পাহাড়ের চূড়ায় এক কুটির। সেখানে তারা আগুনের ধোঁয়া দেখতে পেলো। আগুন আনার জন্যে প্রথমে সমুদ্রে বড়শী বাইকারীকে পাঠাল। সে গিয়ে দেখে এক থুরথুরে বুড়ি তুষের আগুনে আগলে বসে আছে। সে বুড়ির কাছে আগুন চাইল। বুড়ি বলল আমি খুবই দুর্বল। তুমি ফু দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে যেতে পারো। বড়শী বাইকারী তুষের আগুনে যে ফু দিতে যাবে অমনি বুড়ী লাঠির আঘাতে তাকে মেরে ফেলে লুকিয়ে রাখল। অনেকক্ষণ পরও যেহেতু বড়শী বাইকারী ফিরল না দেখে এবার রওনা দিল বাড়ি বহনকারী বলশালী ব্যক্তি। সে গিয়ে দেখল বড়শী বাইকারী নেই। বুড়ি তুষের আগুনের সামনে বসে আছে। সে বুড়ির কাছে আগুন চাইল। বুড়ি পূর্বেকার কথা বলল। বাড়ী বহনকারী বীর তুষের আগুনে যে ফু দিতে যাবে অমনি বুড়ি লাঠির আঘাতে তাকেও মেরে ফেলল। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর বাড়ি বহনকারী ফিরছে না। দেখে এবার সমুদ্র মন্থনকারী চলে গেলে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত কুটিরে। সেখানে সে বড়শী বাইকারী ও বাড়ি বহনকারী বীরদ্বয়কে দেখতে পেলো না। শুধু দেখতে পেল এক বুড়ি তুষের আগুনের সামনে বসে আছে। সমুদ্র মন্থনকারী বীর বুড়ির কাছে আগুন চাইল। বুড়ি পূর্বেকার কথা আবার বলল। সমুদ্র মন্থনকারী বীর তুষের আগুনে যে ফু দিতে যাবে অমনি বুড়ি তার লাঠির আঘাতে তাকেও মেরে ফেলে লুকিয়ে রাখল। সমুদ্র মন্থন বীরকে ফিরতে দেরী দেখে বিষয়টি স্বচোখে দেখার জন্যে কওয়াই কেন্দারাই নিজেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেল। গিয়ে দেখে এক বুড়ি ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। কওয়াই কেন্দারাই বুড়িকে মনে মনে সন্দেহ করল। সে বুড়ির কাছে আগুন চাইল। বুড়ি বলল, আমার নিঃশ্বাস দুর্বল। তুমি ফু দিয়ে নিয়ে যাও। কওয়াই কেন্দারাই যে ফু দিতে যাবে অমনি বুড়ি কওয়াই কেন্দারাইয়ের মাথায় সজোরে আঘাত করল। কিন্তু আঘাতে সে মারা গেল না। বুড়ির চালাকি বুঝতে পেরে কওয়াই কেন্দারাই বুড়িকে চুলের মুঠি ধরে আছাড় মারতে লাগল। শুরু হলো যুদ্ধ। বুড়িটি ছিল ছদ্মবেশী এক ডাইনী। শেষমেষ
কওয়াই কেন্দারাই বুড়িকে ভুতলে ফেলে হাত পা বেঁধে ফেলল। তারপর আগুনের সেক দিতে দিতে তিন বন্ধু বীরকে ফিরিয়ে দিতে বলল। বিপদ দেখে বুড়ি তিন বন্ধুকে প্রাণদান করে ফিরিয়ে দিল। বন্ধু তিনজনকে জীবন্ত ফিরে পেয়ে কওয়াই কেন্দারাই এর মাথায় এক মজার বুদ্ধি খেলে গেল। সে বুড়িকে প্রস্রাবের পানিতে ডুবে মারার কথা বন্ধুদের বলল।
এভাবে প্রথম বীর বড়শী বাইকারী প্রস্রাব শুরু করল। তার প্রস্রাবের বেগে

একটা ঝর্ণা সৃষ্টি হল। তারপর প্রস্রাব শুরু করল বাড়ি বহনকারী বীর। তার প্রস্রাবের বেগে একটি ছড়ার সৃষ্টি হল। তারপর প্রস্রাব শুরু করল সমুদ্র মন্থনকারী বীর। তার প্রস্রাবের বেগে সৃষ্টি হল একটি নদী। নদীর পানিতে ডুবে বুড়ী মারা গেল না দেখে কওয়াই কেন্দারাই প্রস্রাব করতে শুরু করল। প্রস্রাব করতে করতে নদী সমুদ্রের সৃষ্টি হল। আর সমুদ্রে ডুবে ডাইনী বুড়ি মারা গেল। ডাইনী বুড়ী মারা যাবার পর চার বন্ধু বীর আগুন নিয়ে গিয়ে একত্রে সুখে বসবাস করতে লাগল।

এদিকে রাজা দুতের মুখে চার বীরের বীরত্বের কথা জানতে পেরে রাজধানীতে ডেকে পাঠালেন। যথা সময়ে চার বীর রাজ প্রাসাদে উপস্থিত হলে রাজা তাদেরকে রাজকীয় কায়দায় সংবর্ধনা জানালেন। রাজার ছিল চার কন্যা। চার কন্যাই অপরূপ সুন্দরী ছিল। রাজা তার চার কন্যার পানি গ্রহণ করার জন্য চার বীরের কাছে প্রস্তাব রাখলেন। রাজার প্রস্তাব চার বীর প্রত্যাখ্যান করল না। তারা রাজকন্যাদের বিয়ে করল। বৃদ্ধ রাজা চার বীর জামাইয়ের হাতে রাজ্য শাসনের ভার তুলে দিয়ে বানপ্রস্থ হলেন। বলাবাহুল্য এই চার বীরদের রাজত্বকালে পৃথিবীর কোন রাজশক্তি তাদের রাজ্য আক্রমণ করতে পারেনি। রাজ বিচারক এ বিস্ময়কর কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্ঞাতার্থে।

কলাবতী কন্যা

ত্রিপুরা রাজ্যের তৈলাইফাং পরগণার শাসনকর্তা ছিলেন একজন নারাণ। নারাণের ছিল পাঁচপুত্র। তার মধ্যে চারপুত্র ছিল বিবাহিত। তাদের বউরা ছিল খুবই সুন্দরী ও আকর্ষণীয়। ছোট কুমার ছিল অবিবাহিত, সুন্দর চেহারার অধিকারী, তবে ভীষণ অলস প্রকৃতির। এত অলস যে শুয়ে বসেই তার দিন কাটে। চার বৌদির আদরের দেবর সেই ছোট কুমার।

ছোট কুমারকে একদিন বৌদিরা ঠাট্টা করে বলল, ইস্ রে আমাদের এই অলস কুমারের ঘরে কোন মেয়েই আসবে না। ভাবতে আমাদের বড়ই দুঃখ লাগছে। ছোট কুমার পালংকে বসেছিল পা ঝুলিয়ে। বৌদিদের কথায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে – আচ্ছা, দেখে নিও। তোমাদের চেয়ে আমার বউ হবে আকর্ষণীয় ও সুন্দরী। এই আমি চললাম সুন্দরী বউ খুঁজতে। যেই বলা সেই কাজ। ছোট কুমার বউ খুঁজতে সত্যি সত্যি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে নিল একটি গুমচাক ফল (বন্যফল) দেখতে আপেলের মত, মিষ্টি ও সুঘ্রাণযুক্ত একটি ছড়ি ও একটি ছুরি।

যেতে যেতে ছোট কুমারের দৃষ্টি গেল একটা জুমের টং ঘরে। রিনাই পরিহিতা অপরূপা সুন্দরী এক কন্যা খোঁপায় বুনোফুল গুঁজে নানা প্রকার গয়না পরে চরকায় সুতা কাটছে। ছোট কুমারের চোখদুটো ব্যাকুল প্রত্যাশায় চিক চিক করে উঠলো। ধীরে ধীরে জুম বেয়ে উঠে– টং ঘরের কাছে গিয়ে কন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলল – ওহে সুন্দরী, আমি একজন পথিক। আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। আমাকে একটু জল দেবে ?

বাঃ এ ক্যামন কথা। জল দেব না কেন ? তুমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে বস। এই বলে কন্যাটি ফিক করে হেসে টং ঘরের ভেতরে চলে গেল।

কিন্তু হায়। কন্যাটির হাসি দেখে ছোট কুমারের মন বিষণ্নতায় ভরে গেল। কন্যাটি দেখতে এত সুন্দরী অথচ তার কিনা সব ক'টি দাঁত পোকায় খাওয়া। ছোট কুমারের আর জল খাওয়া হল না। সেখান থেকে আবার বেরিয়ে পড়ল অজানা পথে।

অনেক পথ পেরিয়ে ছোট কুমার এক ভিন্ গ্রামের প্রবেশ দ্বারে এসে পৌঁছুল।

সেখানে সে দেখল কল কল শব্দে বয়ে যাওয়া ছোট ঝর্নায় এক যুবতী কন্যা কলসীতে জল ভরছে।

তার রূপার অলংকারে রিনিঝিনি শব্দ হচ্ছে আর ঝিলিক ছড়াচ্ছে। ছোট কুমার ভাবলে কন্যাটি ভীষণ সুন্দরী ও চমৎকার বটে। এদের বাড়িতে আজ অতিথি হব। দেখা যাক অদৃষ্টের কী হয়।

ছোট কুমার কন্যার বাড়িতে অতিথি হয়ে রইল। তাকে খুব করে আপ্যায়ন করা হলো। এক সময় সুযোগ বুঝে ছোট কুমার কন্যার বাবাকে তার অভিপ্রায়ের কথা উপস্থাপন করল। আমি একটা সুন্দরী কন্যার খোঁজ করছি। যদি তেমন একটা কন্যার সন্ধান পাই তাহলে ঘরজামাই হয়ে থাকব। ছোট কুমারের কথা শুনে বাড়ির লোকেরা খুশি হল। তারা কন্যাটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে এনে – দেখাল। কিন্তু হায়রে কপাল মন্দ। ছোট কুমার দেখল কন্যাটির চোখ দুটো ট্যারা। ছিঃ ছিঃ। এ কন্যা সে বিয়ে করতে পারে না। পরের দিন সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

যেতে যেতে ছোট কুমার ভাবল তার আর বাড়ি ফেরা হবে না। কারণ বাড়িতে গেলে সুন্দরী বৌদিরা তাকে পেয়ে বসবে। ছোট কুমার প্রতিজ্ঞা করল। সুন্দরী বউ সঙ্গে না নেয়া ছাড়া সে কিছুতেই ঘরে ফিরে যাবে না।

ছোট কুমারের হঠাৎ নজরে পড়ল বনের ধারে এক কলাবাগান। বাগানের ভেতর ছোট একটা মাচা ঘর। ঘরের চারিপাশে নানা ধরনের ফুলের বাগান আর সে বাগানে শীষ দিয়ে পায়চারী করছে অনিন্দ্য এক সুন্দরী কন্যা। এক মুহূর্ত মাত্র। ছোট কুমার থমকে দাঁড়াল। কন্যাও চমকে মুখ তুলে তাকাল। আহা! কী সুন্দর মুখশ্রী। কন্যাটি যেন স্বর্গের অপসরী। চোখে বিদ্যুতের চমক। ছোট কুমার অতিশয় ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল – এ্যাই শোনো। কন্যাটি নিমিষেই ফুলের বাগানে হারিয়ে গেল। ছোট কুমার আর দেখতে পেল না।

শেষে কোন উপায় না দেখে বাগানের শেষ প্রান্তে যে বাড়িটি,ছোট কুমার সেই বাড়িতে প্রবেশ করে গৃহকর্তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলল – আমি একজন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত পথিক। আপনার ঘরে অতিথি হতে চাই। আগামীকাল ভোরে চলে যাব। এ বলে গৃহকর্তার হাতে তার জিনিসপত্র দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। সুন্দরী কন্যাটাকে দ্বিতীয়বারের মত দেখা যায় কিনা উঁকিঝুঁকি করতে লাগল। না সবই বৃথা।

যথারীতি ভোরে সজীব প্রশান্তি নিয়ে ছোট কুমার ঘুম থেকে উঠল। গৃহকর্তাকে বলল – আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি এখন চলে যেতে চাই। দয়া করে আমার জিনিসগুলো এনে দিন। গৃহকর্তা ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখল তার একটিও

জিনিস নেই। গুমচাক ফলটা ঘরের বউ ঝিরা খেয়ে ফেলেছে, ছড়িটা ভেঙে চুলোয় দিয়েছে আর ছুরিটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর যায় কোথায়। জিনিস নষ্ট ও খোয়া গেছে জেনে ছোট কুমার ফেঁপে উঠে বলল – এ কেমন কথা। আমি অতিথি। সরল বিশ্বাসে জিনিসগুলি আপনাদের হেফাজতে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনারা আমাকে ঠকাতে চেয়েছেন। তা ভাল হবে না। আমি নারানের ছেলে। আপনাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। এখন ভালয় ভালয় আমার জিনিসগুলি এনে দিন। নতুবা এ বাড়ির সুন্দরী কন্যাকে এনে দিন। গৃহকর্তার মুখ একেবারেই শুকিয়ে গেল। কেননা অতিথি ব্যাজার হলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। অনেক ভেবে চিন্তে ছোট কুমারের হাতে একটি কলার থোর এনে দিয়ে বলল এ আমাদের একমাত্র কন্যা, নাম কলাবতী। কিন্তু হে যুবক সাবধান। তিনটি ঝর্না পার না হওয়া পর্যন্ত এর পাঁপড়ীগুলো খুলোনা। খুললেই বিপদ হবে। সাবধান।

গৃহকর্তার কাছ থেকে কলার থোর হাতে নিয়ে ছোট কুমার ঘরের অভিমুখে রওয়ানা হল। যেতে যেতে তার কৌতূহলের মাত্রাও বাড়তে লাগল। কোন রকম ধৈর্য্য ধরে দু'টি ঝর্ণা পার হল। শেষে তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। গৃহকর্তার বারণ অগ্রাহ্য করে তিনটি ঝর্না পার না হতেই পথে একটা বট গাছের ছায়ায় বসে ছোট কুমার কলা থোরের একটি পাঁপড়ী খুলে দেখল। সত্যিই সত্যিই সেখানে কলাবতী কন্যা লুকিয়ে আছে। রূপের আলোয় পথঘাট ঝলমল করছে।

ছোট কুমার আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। কথা বলে উঠল কলাবতী কন্যা। ছোট কুমার অতি আনন্দে, আবেগে উন্মাদ হয়ে তার প্রিয়তম কলাবতী কন্যাকে বটগাছের তলায় রেখে পানি আনতে নেমে গেল ঝর্নায়। এদিকে হল কী। ওই বটগাছে বাস করত এক যাদুকরী ডাইনী বুড়ী। সেও কলাবতীকে দেখেছিল। ছোট কুমার চলে যেতেই ডাইনী বুড়ী তরতর করে গাছ থেকে নীচে নেমে এসে বলল – কেঁ রেঁ তুঁই আঁমার আঁস্তাঁনাঁয়। অঁনেঁকঁ দিঁনঁ হঁয় মিঁনসেঁর রঁক্তঁ মাঁংসঁ খাঁইনিঁ। আঁমিঁ তোঁমাঁকেঁ খাঁবঁ। এ বলে কলাবতী কন্যাকে খেয়ে ফেলল। আর যাদুমন্ত্র বলে অবিকল কলাবতী কন্যার রূপ ধরে বউ সেজে কলা থোরের পাঁপড়ীতে লুকিয়ে রইল।

এদিকে ছোট কুমার বাঁশের চোঙ্গায় করে ঝর্নার শীতল পানি এনে তার পরম আদরের বউ কলাবতী কন্যাকে খাওয়াল। খুব যত্ন করে বাড়িতে নিয়ে গেল। কোন কিছুই টের পেল না।

বাড়িতে পৌছেই ছোট কুমার খুব হাকডাক করে বৌদিদের ডেকে জড়ো করল। তার বউকে দেখাল। বউয়ের রূপের আলোতে বাড়ি ঝলমল হয়ে উঠল। বৌদিরা

হার মানতে বাধ্য হল। রূপসী বউ বটে।
এরপর কিছুদিন যেতে না যেতে ঘরে অশান্তি দেখা দিল। ছোট বউটা সুন্দরী হলে কী হবে। গা থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বের হয়। গাল পাড়ে। সবার সাথে মিশে না। ঝগড়া ঝাটি করে। বাড়ির সবার সাথে ছোট বউয়ের বনিবনা হচ্ছে না দেখে একদিন নারান আলাদা ঘর তুলে দিয়ে ছোট কুমারকে পৃথক করে দিলেন। ছোট কুমার পৃথক হয়ে গেল। ছোট কুমার দেখল তার বউয়ের কেবল খাই খাই স্বভাব। আজ খাসীর মাংস এনে দেয় তো কাল শুকরের মাংস, তারপর মহিষের মাংস, ভেড়ার মাংস। বউটা কেবল মাংসই খেতে চায়। আর রাঁধে বা কি ? তেল নেই, মসলা নেই, প্রায়ই কাঁচাই খায়। চিন্তায় চিন্তায় ছোট কুমার শুকিয়ে মরে যায় আর কি। একদিন ছোট কুমার স্বপ্ন দেখে যে ঝর্নার পানি কলাবতী খেয়েছিল সেই ঝর্নায় দুটো সোনালী মাছ তাকে যেন ডাকছে। পরের দিন ছোট কুমার ঝর্নায় গিয়ে দেখে সত্যিই সত্যিই দুটো সোনালী মাছ জলকেলী করছে। ছোট কুমার মাছ দুটোকে আদর করল। ছোট কুমার অনুভব করল মাছ দুটোকে দেখলে তার অবসাদ, বিষন্নতা মুহুর্তেই চলে যায়। আড়াল হলে বিষাদের ছায়া আপনা আপনি নেমে আসে। কেন এমন হয় ছোট কুমার ভেবে পায়না।
এদিকে ছদ্মবেশী যাদুকরী ডাইনী বুড়ি ছোট কুমারের গতিবিধি নজরে রেখেছিল। একদিন সে ছোট কুমারের কাছে বায়না ধরল – ওগো। আমি মা হতে চলেছি। মাছ দিয়ে ভাত খেতে বড়ই সাধ জাগে।
ছোট কুমার বললে – এ আর এমন কি কঠিন কাজ। আজই আমি বাজার থেকে বড় বড় মাছ এনে দিচ্ছি।
বউরূপী ডাইনি বুড়ি বললে – না গো না। আমি বড় মাছ খেতে পারি না। তার চেয়ে চলো না – ঝর্নায় গিয়ে ছোট মাছ ধরে নিয়ে আসি। ছোট কুমার কী আর করবে। বউয়ের আবদার রক্ষা করতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝর্নায় গেল মাছ ধরতে। এদিকে হল কী। যাদুকরী ডাইনী বুড়ীকে দেখে ঝর্নার সোনালী মাছ দুটো ভয়ে অস্থির হয়ে লাফালাফি করতে লাগল। এতে ঝর্নার পানি ঘোলাটে হয়ে গেল। মাছ দুটোকে আর দেখা গেল না। ডাইনী বুড়ি জানত কীভাবে তাদের ধরতে হয়। সে ছোট কুমারকে বললে – সোনালী মাছ দুটো আমার চাই-ই চাই। ওগো প্রিয়তম, তুমি ঝর্নার পানি সেঁচে ফেল। অগত্যা কি আর করা। ছোট কুমার বাধ্য হয়ে ঝর্নার পানি সেঁচে ফেলল। অমনি ধরা পড়ল সোনালী মাছ দু'টো।
ছদ্মবেশী ডাইনী বুড়ি মাছ দু'টো বাড়িতে এনে আচ্ছা করে লবণ ও কাঁচা হলুদের রস মেখে আগুনে সেঁকে টিক্কা বানাল। তারপর ছোট কুমারকে একটা খেতে দিয়ে আর একটা নিজে মজা করে খেয়েই নাক ডেকে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ছোট

কুমার কিছুতেই খেতে পারল না। সে শুধু ভাবতে লাগল কী নিষ্ঠুর না তার বউ। মাছ দু'টোকেই মেরে ফেলল। এরূপ সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ছোট কুমার একটা খন্তা দিয়ে ঘরের উঠানে একটা গর্ত করল। তারপর সে গর্তে তার ভাগের সেঁকা মাছটাকে পুঁতে রেখে দিল। আর সেদিন থেকে তার মনটা বেশী করে বিষণ্ণতায় ভরে গেল।

কিছুদিন যায়। একদিন ছোট কুমার দেখল – যে গর্তে মাছ পুঁতে রাখা হয়েছিল ওখানে একটা লাউয়ের চারা বেড়ে উঠেছে। চারা দেখে তার মনটা আনন্দে ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি বন থেকে বাঁশ কেটে এনে ঘেরা দিল যাতে কেউ নষ্ট করতে না পারে। এভাবে দিনে দিনে লাউ গাছটি বেড়ে ছাদে উঠে গেল। এখন হল কী। একটা লাউ ধরেছিল ঘরের প্রবেশদ্বারে একেবারেই দরজার উপর। লাউটি দেখতে খুবই সুন্দর। সবাই প্রশংসা করত। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ছদ্মবেশী ডাইনী বুড়ি যখন ঘর থেকে বের হত কিম্বা বাইরে থেকে ঘরে প্রবেশ করত : তখন ওই লাউটি তার মাথার উপর আপনা আপনি ধপাস্ করে পড়ত। এতে ডাইনী বুড়ি বড়ই ব্যথা পেত। তা দেখে ছোট কুমারের ভারী মজা লাগত আর ডাইনী বুড়ি লাউয়ের চৌদ্দগুষ্ঠি ধরে গালিগালাজ করত। কিন্তু ছোট কুমারের কড়াবারণ ছিল ওই লাউটি কেউ যেন না ছিঁড়ে।

এভাবে কিছুদিন যায়। বউরূপী ডাইনী বুড়ির কেমন জানি সন্দেহ হল লাউয়ের প্রতি। লাউটা আসলে কী জিনিস তা ঘিলা দর্পণে দেখার জন্য বাপের বাড়ি বেড়াতে যেতে ছোট কুমারের কাছে বায়না ধরল। বলল – অনেকদিন হয় বাপের বাড়ি যাওয়া হয়ে উঠেনি। মনটা ভারী আনচান করছে। ওগো, কাল আমি বাপের বাড়ি যাব।

ছোট কুমার বললে – তাইতো, অবশ্যই যাবে। ঠিক আছে, আগামীকাল আমি তোমাকে নিয়ে যাব। ডাইনী বুড়ি বললে – ওগো তোমার যাওয়া দরকার হবে না। তুমি ঘরদোর দেখ। আমি একা যেতে পারব। সাত দিনের মধ্যে ফিরে আসব। রাগ করনা লক্ষ্মীটি। ছোট কুমার ভাবল, কথাটা মন্দ বলেনি।

পরের দিন ভোর না হতেই ডাইনী বুড়ী বাপের বাড়ীর উদ্দেশে চলে গেল। বউ চলে যেতেই ছোট কুমারের মন কেন জানি আনন্দে ভরে উঠল। কিছুক্ষণ মনের অজান্তে শীষ দিয়ে গান করল। গ্রাম চষে ঘুরে বেড়াল। নিজেই রেঁধে বেড়ে খেল।

এক সময় কি মনে করে ছোট কুমার লাউটাকে পেরে শোবার ঘরের সিক্কায় তুলে রাখল।

পরের দিন ছোট কুমার ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখল – ঘর কেমন জানি

পরিপাটি। জিনিসপত্র সাজানো গুছানো, ঘরদোর লেপ দেয়া, চারিপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রান্নাঘরে গিয়ে দেখল হাঁড়ি পাতিল ধোয়া মোছা। রান্নাবান্না করা। জল ঘরে গিয়ে দেখল –হাঁড়ি, পাতিল ঘটি বাতি সবগুলো জলে জলে পরিপূর্ণ। এসব ব্যাপার স্যাপার দেখে ছোট কুমার তাজ্জব বনে গেল। তার শুধু একটাই প্রশ্ন এসব কাজ করল কে ?

ছোট কুমার ভেবে কুল পায় না। সে সিদ্ধান্ত নিল এর রহস্য তাকে উদঘাটন করতে হবে। পরের দিন ছোট কুমার ঘরের সব জিনিসপত্র এলোমেলো করে রেখে রাতে ঘুমাতে গেল এবং ঘুমের ভাণ করে জেগে রইল। ক্ষণে ক্ষণে মিছামিছি নাক ডাকল।

মাঝ রাতে হঠাৎ করে সিক্কায় তুলে রাখা লাউটি ধপাস্ করে মেঝেতে পড়ে গেল। ছোট কুমার দেখল – লাউ থেকে এক পরমা সুন্দরী কন্যা বের হয়ে এলো। তার রূপের ছটায় অন্ধকার ঘর ঝলমল করছে। ছোট কুমার দেখল – এতো তারই বউ। কিন্তু বউ তো বাপের বাড়ি গেছে। তাহলে এ কে ? ছোট – কুমারকে জানতে হবে সবকিছু। সে চুপ করে ঘুমের ভাণ করে বিছানায় পরে রইল। এদিকে সুন্দরী কন্যাটি প্রথমে ঘরদোর ঝাড়ু দিল। ঘরের জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল। রান্নাবাড়া করল। ছোট কুমারের কাপড় চোপড় কেচে দিল আর ভোর না হতেই লাউ হয়ে সিক্কায় উঠে গেল।

ছোট কুমার সব কিছু দেখল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। এবার সে সিদ্ধান্ত নিল লাউয়ের কন্যাকে ধরে ফেলবে। এতে অদৃষ্টে যাই ঘটে ঘটুক। আবারও ছোট কুমার ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো রেখে রাতে ঘুমাতে গেল। মাঝরাতে আবারও লাউ থেকে কন্যার আবির্ভাব হল। সঙ্গে সঙ্গে ছোট কুমার তড়াক করে বিছানা থেকে উঠে লাউ কন্যাকে ঝাপটে ধরল। লাউকন্যা ছিঃ ছিঃ করে বলে উঠল,ওগো ছোট কুমার, তুমি আমাকে ছুঁয়োনা। আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার দেহে যাদুকরী ডাইনী বুড়ির গন্ধ লেগে আছে। তুমি ডাইনী বুড়ির সাথে সংসার করছো, ডাইনী বুড়ির রান্না খাচ্ছ, ডাইনী বুড়ির সাথে মেলামেশা করছো, তোমাকে আমার বড্ড ঘেন্না লাগে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

ছোট কুমার বললে, তোমাকে আমি অবশ্যই ছেড়ে দেব। তবে দোহাই তোমার, এসব আমি কী দেখছি। তুমি কী আমার বউ কলাবতী নও। লাউকন্যা বললে – ছোট কুমার তা হলে শোনো।

তোমার হাতে একটি কলার থোর দিয়ে আমার বাবা বলেছিল, এ আমাদের কলাবতী কন্যা। তবে সাবধান তিন ঝর্না পার না হওয়া পর্যন্ত এর পাঁপড়ীগুলো খুলো না। তুমি ধৈর্য্য ধরে রাখতে না পেরে দুই ঝর্না পার না হতেই পাঁপড়ী খুলে

দেখলে। এতে আমার তেষ্টা পেয়েছিল। তুমি আমাকে বটগাছের তলায় রেখে আমার জন্যে জল আনতে ঝর্ণায় নেমে গেলে। ওই গাছটাতে ছিল এক যাদুকরী ডাইনী বুড়ী। সে আমাকে দেখেছিল এবং আমাকে একা পেয়ে খেয়ে ফেলেছিল। খাওয়ার মধ্যে বাকী ছিল আমার দু'টো আঙ্গুল। এরই মধ্যে তোমাকে জল নিয়ে আসতে দেখে ডাইনী বুড়ি দুটো আঙ্গুল ঝর্নায় নিক্ষেপ করে আমার রূপ ধরে বউ সেজে বসে রইল। তুমি কিছুই জ্যানলে না।

এরপর তোমাকে আমি স্বপ্নে দেখা দিলাম ঝর্নায় যেতে। সোনালী মাছ হয়ে তোমার সাথে খেলা করতাম। কিন্তু তোমার যাদুকরী ডাইনী বুড়ি এতে সন্দেহ করে তোমাকে দিয়ে আমাকে ধরে এনে টিক্কা বানালো। ভাগ্যিস তুমি নিজেরটা না খেয়ে উঠানে পুঁতে রেখেছিলে বলে আমি লাউ হয়ে জন্ম নিতে পারলাম এবং ডাইনী বুড়ীর মাথার উপর লাফিয়ে পড়ে শাস্তি দিতে লাগলাম। এতে ডাইনী বুড়ি আমার উপর সন্দেহ করে ঘিলা দর্পণ দেখতে বাপের বাড়ি চলে গেছে। তোমার ডাইনী বউ যদি দিনের বেলায় ঘিলা দর্পণ দেখে থাকে, তাহলে সে আমাকে লাউ হিসেবে দেখবে। আর যদি রাতে দর্পণ দেখে তাহলে কলাবতী কন্যা হিসেবে দেখবে। এবং এসেই আমাকে মেরে ফেলবে। আমাকে যদি তুমি পেতে চাও তাহলে ডাইনী বুড়িকে মেরে ফেলতে হবে। তবে ছোট কুমার, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি ডাঙ্গায় যেন ডাইনী বুড়িকে মারতে যেওনা। কারণ ডাঙ্গায় এক ফোটা রক্ত পড়লে পুনরায় একজন ডাইনীর জন্ম নেবে। ডাইনী বুড়ীকে ঝর্ণার পানিতে মেরে ফেলতে হবে। ঝর্নার পানিতে তুমি দেখবে সহস্র সহস্র ব্যাঙাচি। আসলে ওরা কেউ ব্যাঙাচি নয়। ওরা বনের নানান জাতের পশু-পাখি। ডাইনী বুড়ি মানুষ শিকার করে যখন রক্ত পান করত,বনের পশু পাখি দেখে বলত আমরা সাক্ষী দেব, আমরা সাক্ষী দেব। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ডাইনী বুড়ি যাদুমন্ত্র বলে তাদেরকে ব্যাঙাচি বানিয়ে রেখেছিল। ব্যাঙাচির দল ডাইনী বুড়ির রক্ত পান করার সাথে সাথে যাদুর প্রভাব মুক্ত হয়ে চলে যাবে। আর ডাইনীর এক ফোটা রক্ত লাউয়ের উপর ছিটিয়ে দিলে আমিও কলাবতী কন্যা হয়ে পুনর্বার আবির্ভূত হব। নচেৎ এর আগে তুমি আমাকে পাবে না। ছোট কুমার সাবধান। ডাইনী বুড়ি কাল সকালে এসে পৌঁছুবে। এইবলে কলাবতী কন্যা লাউ হয়ে সিক্কায় উঠে গেল।

কলাবতী কন্যার কথা শুনে ছোট কুমারের দেহ রাগে ক্ষোভে রী রী করতে লাগল। এক দৌড়ে গিয়ে বাপের বাড়ি থেকে একটা কিরিচ নিয়ে এলো। তাতে সারাদিন বসে শান দিতে লাগল। আর ডাইনী বুড়ির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। পরের দিন সকালে ডাইনী বুড়ি বিদ্যুৎ বেগে চলে এলো। এসেই লাউ দেখতে না পেয়ে ছোট কুমারকে জিজ্ঞেস করল – হ্যাঁ গো, আমাদের লাউটা গেল কই ?

ছোট কুমার বলল, লাউটা পেরে তোমার জন্যে সিক্কায় তুলে রেখেছি। তা তুমি যখন এসে গেছো – মাছ দিয়ে লাউটা রান্না কর। অনেক দিন হয় মাছ ও লাউ এর তরকারী খাওয়া হয়ে উঠেনি। সেই কবে বৌদিরা ছোট কালে খাইয়েছিল। ডাইনী বুড়ি বললে সে কি, এখন আমি মাছ কোথায় পাব ? ছোট কুমার বললে , চল, ঝর্নায় গিয়ে ছোট মাছ ধরে নিয়ে আসি। ছোট কুমার অনেকটা জোর করে ডাইনী বুড়ীকে নিয়ে গেল ঝর্নায়। ছোট কুমার মিছেমিছি মাছ ধরার ভান করে সুযোগ খুঁজতে লাগল ডাইনী বুড়িকে মারতে।

কিন্তু সুযোগ মেলে না। যেই মারতে যাবে অমনি ডাইনী বুড়ি চেঁচিয়ে উঠে এ্যাই ! কি হলো। তুমি আমার উপর কিরিচ উঠাচ্ছো কেন ?

ছোট কুমার বললে,আরে কিছু না। তোমার মাথার উপর দিয়ে একটা মাছি উড়ে যাচ্ছিল কিনা, তাই তাড়াচ্ছিলাম। আবার মারতে যাবে অমনি ডাইনী বুড়ী চেঁচিয়ে উঠে, এ্যাই কি হলো? ছোট কুমার বলে ও কিছু না। তোমার মাথার উপর দিয়ে একটা পিঁপিঁলিকা উড়ে গেল কিনা, তাই তাড়াচ্ছিলাম। এমনি করতে করতে ছোট কুমারের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সজোরে কিরিচ দিয়ে কোপ বসিয়ে দিল ডাইনী বুড়ির ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে ডাইনী বুড়ী চিৎকার দিয়ে ডাঙ্গার দিকে ছুটে গেল। এতে ঝর্নার ব্যাঙাচিরা তার স্বরে চিৎকার করে বলে উঠল,ছোট কুমার, রাক্ষুসীকে ঝাপটে ধরো ঝর্নার পানিতে। ডাঙ্গায় যেতে দিও না। তোমার বিপদ হবে। ছোট কুমার ডাইনীকে ঝাপটে ধরে কিরিচ দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপ মেরে ঝর্নার পানিতে ফেলে দিল। আর ব্যাঙাচিরা দলে দলে এসে ডাইনী বুড়ির রক্ত চুষে খেয়ে ফেলল। এরপর যাদুর প্রভাব মুক্ত হয়ে কেউ শালিক পাখি, কেউ ঘুঘু পাখি, কেউ ময়না পাখি, কেউ টুনটুনি হয়ে উড়ে গেল। আবার কেউ খরগোশ হয়ে, কেউ শেয়াল হয়ে, কেউ সিকু হয়ে, কেউ বেজি হয়ে, কেউ হরিণ হয়ে বনে পালিয়ে গেল। যাবার সময় ছোট কুমারকে সবাই ধন্যবাদ জানিয়ে গেল।

ছোট কুমারের কিরিচের আগায় ডাইনীর এক ফোটা রক্ত লেগেছিল। ওই রক্ত লাউয়ের উপর ছিটিয়ে দিতেই কলাবতী কন্যা আসলরূপে আবির্ভূত হয়ে ছোট কুমারকে জড়িয়ে ধরল। চোখের পানি মুছে বললে,ছোট কুমার তুমি আমাকে বাঁচালে।

ছোট কুমারের মন আনন্দে উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল। আবার নতুন করে সংসার সাজানো হল। বৌদিদের ডেকে আনা হল। পাড়াপড়শীদের আনা হল। সবাইকে আচ্ছা করে নেমতন্ন খাওয়ানো হল। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল, ছোট কুমার সত্যি ভাগ্যবান। কলাবতী কন্যার মত বউ আর হয় না। এরপর তারা সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

চোন্তাইয়ের চার আনা কামাই

ত্রিপুরা মহারাজা ত্রিপলী একজন প্রজাবৎসল ও ধার্মিক শাসক ছিলেন। অধিকন্তু মহারাজা ছিলেন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। তাঁর রাজত্বকালে প্রজারা মানে, সম্মানে, যশ ও খ্যাতিতে জীবন যাপন করেছিল। একদিন মহারাজ ত্রিপলী প্রজাদের অবস্থা জানবার জন্যে ছদ্মবেশে রাজধানী ছেড়ে এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন সেখানকার প্রজারা ক্ষেতে খামারে কাজ করছে। মেষপালক মাঠে মেষ চরাচ্ছে, রাখাল আঁড়বাঁশী বাজিয়ে মনের সুখে গরু চরাচ্ছে, গ্রামীন বধূরা দলবেঁধে ঢেঁকিতে ধান ভানছে, মালা শুকরের দল চষে বেড়াচ্ছে, মোরগ ক্ষণে ক্ষণে ডাকছে, শিশুরা গাছের ছায়ায় খেলছে। মহারাজ ত্রিপলী এসব মনোরম গ্রামীণ জীবন যাত্রা দেখে খুব খুশী হলেন। তিনি মাঠে কর্মরত একজন গ্রামীণকে দেখে তার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ বসলেন।

ছদ্মবেশী মহারাজ গ্রামীণকে নমস্কার জানিয়ে কথা পাড়লেন। খুলুমখা, তাখুক। গাম ক্রং দে তং ? নকনি ই কামী বারী নাইথক। কামীনি বুমুং তীমা ? (ভাই, আপনি কেমন আছেন। আপনাদের এ গ্রাম খুবই সুন্দর। তো এ গ্রামের নাম কি?

আগন্তুকের অভিবাদনে গ্রামীণ খুশী হয়ে বললেন খুলুমখা, সাক মাং গামসে। কামীনি বুমুংলে চোন্তাই পাড়া হিনজাকঔ। (নমস্কার। ভালো আছি। এ গ্রামের নাম চোন্তাই পাড়া)।

ছদ্মবেশী মহারাজা ত্রিপলী, গ্রামের নাম কেন চোন্তাই হলো গ্রামীণের কাছে তা জানতে চাইলেন। গ্রামীণ বললেন, চোন্তাই তাদের গ্রামের পুরোহিত। শুধু নিজ গ্রামে নয় পার্শ্ববর্তী আরো দু'চার গ্রামেও তাকে পুরোহিতগিরি করতে হয়। তাদের চোন্তাই একজন গুণী ব্যক্তি। সে একজন ভাল বৈদ্য, তাবিজ টঙ্কা ঝাড় ফুক টুকটাক জানে। যাদু টোনা বানকাটা বানফেরা তন্ত্রমন্ত্র জানে। সর্বোপরি চোন্তাই মশায় অতিশয় সরল সহজ স্বভাবের মানুষ। তাই গ্রামবাসীরা তাকে সম্মান দেখিয়ে গ্রামের নামকরণ করেছে চোন্তাই গ্রাম। মহারাজ ত্রিপলী গ্রামীণের মুখে প্রশংসা শুনে চোন্তাইকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বললেন, তাখুক,

চোন্তাইনি নোক বিয়াং? (ভাই, চোন্তাই মশাইয়ের বাড়ি কোন দিকে) গ্রামীণ বললেন,কামীনি উত্তর ফাইচিং; তোয়সা করেঅী। (গ্রামের উত্তর সীমানায়, ছড়ার ধারে) ছদ্মবেশী মহারাজ ত্রিপলী গ্রামীণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চোন্তাই মশাইয়ের বাড়িতে গেলেন। কিন্তু চোন্তাইয়ের দেখা পেলেন না। তিনি দেখলেন চোন্তাইয়ের ঘরবাড়ির অবস্থা তেমন ভালো না। বলতে গেলে কুঁড়েঘর। নাম করা চোন্তাই। তার এ হাল কেন মহারাজ ত্রিপলী কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। পরে কুঁড়ে ঘরের উঠানে দাঁড়িয়ে হাক দিলেন – নোকঅী সাব' তং ? নারোয়াই ফাইখা। (ঘরে কে আছেন। আমি অতিথি এসেছি)

আগন্তুকের ডাক শুনে চোন্তাইয়ের বউ ঘরের ভেতর থেকে জবাব পাড়লেন – সাব' ? নোকঅী আচুক ফাইদি।

(কে? ঘরে এসে বসুন) মহারাজ ত্রিপলী দেখলেন চোন্তাইয়ের বউ খুবই সুন্দরী, খুবই সহজ সরল। বললেন, 'আং রাজ দরবারনি ফাইমানিসে। রাজা সা' হরো চোন্তাইসানো কিসা থাঁদি হিনৗই। (আমি রাজ দরবার থেকে এসেছি। রাজা ডেকে পাঠিয়েছেন চোন্তাই মশাইকে) রাজ দরবারে হাজির থাকতে চোন্তাই মশাইয়ের উপর ডাক পড়েছে। না জানি চোন্তাই মশাই কি দোষ করেছে। চোন্তাইয়ের কী হবে, না হবে, ফাঁসী হবে, না কারাদণ্ড হবে চোন্তাইয়ের বউ আর গ্রামবাসীরা চিন্তা ভাবনা করেও কুলকিনারা খুঁজে পেলো না। শেষমেশ সিদ্ধান্ত হলো চোন্তাই মশাই রাজ দরবারে যাবে এবং যা হবার তাই হবে। রাজ হুকুম বলে কথা। রাজার হুকুম অমান্য করা কার সাধ্যিতে কুলায়।

রাজপ্রাসাদ সে তো অনেক দূর। চোন্তাই নিজ অদৃষ্টের কথা চিন্তা করতে করতে *সিবরাই' এর নাম স্মরণ করে পরের দিন রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হল। চোন্তাইয়ের বউ চোখের পানি মুছতে মুছতে কলা পাতায় করে ভাতের মোচা বেঁধে দিল। অনেক দিনের পথ। ক্ষিধে পেলে চোন্তাই যেন গাছের ছায়ায় বসে চারটে ভাত খেয়ে নেয় বউটি বারে বার মনে করিয়ে দিল। চোন্তাই রওয়ানা হলো রাজধানীর অভিমুখে। বাপের সাত জনমেও ওরা রাজপ্রাসাদ দেখেনি আর রাজ দরবার তো দূরের কথা।

কত পাহাড়, পর্বত, চড়াই উৎরাই, ছড়া,ঝর্ণা নদী ও লোকালয় পেরিয়ে পাঁচ দিন পাঁচ রাত অনবরত হাঁটার পর চোন্তাই রাজধানীর সীমানায় গিয়ে পৌঁছল। বহুদূর থেকে রাজ প্রাসাদের চূড়া দেখা গেল। চোন্তাই মশাই যতই প্রাসাদের কাছে যায় ততই তার বুক কাঁপতে থাকে। রাজধানীতে গিয়ে চোন্তাই মশাই বিচিত্র রকমের গোলকধাঁধায় পড়ে গেল। শত সহস্র পথ ঘাট, চৌমুহনী, নানান ধরনের পসারী দোকান পাঠ, বিচিত্র পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত লোকজন, নানান ধরনের

হাতী ঘোড়ার যানবাহন, সব কিছু দেখে শুনে তাজ্জব বনে গেল চোন্তাই মশাই। কিন্তু কোন উপায় নেই। তাকে রাজ প্রাসাদে হাজির হতে হবে। রাজার হুকুম, এর এক তিলও নড়চড় হবে না। কোন রকম লোকজনদের জিজ্ঞেস করে প্রাসাদে যাবার পথ চিনে নিল। এক সময় রাজ প্রাসাদের সিংহদ্বারে গিয়ে পৌঁছল। গিয়ে দেখে ইয়া মোচওয়ালা একজন দ্বাররক্ষী খর্গ উচিয়ে সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে আছে। চোন্তাই ভয়ে ভয়ে যথাযথ দ্বাররক্ষীকে অভিবাদন জানিয়ে বলল; আং চোন্তাই। মহারাজ রিংখনাই ফাইমানি। আনো মহারাজানি দরবারী তেলাংগীই থাঁদি কিসা। (আমি চোন্তাই। মহারাজ। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দয়া করে আমাকে রাজ দরবারে যাবার ব্যবস্থা করে দিন)

চোন্তাইয়ের অভিপ্রায় জেনে দ্বাররক্ষী বলল – হুম! নাইসিংগারা কিসা। মহারাজা দরবারী আচুকল্লাই আইফুঔ তেলাংগীই রহরণী। (হুম ! অপেক্ষা করতে হবে। মহারাজা যখন দরবারে এসে বসবেন তখন তোমাকে পৌঁছে দেব)। অগত্যা কি আর করা যায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত চোন্তাই সিংহদ্বারে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল এবং আরেকবার নিজ অদৃষ্টের কথা ভাবল।

এক সময় হঠাৎ করে রাজপ্রাসাদের চূড়া থেকে বিউগল বেজে উঠল। রাজ চোপাদারগণ মহারাজার আগমনী বার্তা ঘোষণা করল এবং সে সাথে শঙ্খধ্বনি হল। প্রাসাদ বেষ্টনীতে লোকজনের কোলাহল বেড়ে গেল। লোকজনদের আসা যাওয়া বেড়ে গেল। সে এক এলাহী কাণ্ড কারখানা। এ রূপ দৃশ্য চোন্তাইয়ের চৌদ্দ পুরুষও দেখেনি।

এক সময় একজন সিপাই এসে চোন্তাইকে রাজ দরবারে নিয়ে গেল। চোন্তাই গিয়ে দেখে রাজ দরবার ঝলমল করছে। বহুমূল্যবান পোশাকে আশাকে সজ্জিত লোকজনের বেষ্টনীতে মহারাজা সোনার সিংহাসনে উপবিষ্ট। কেউবা মহারাজার শিরোপরে চামর দোলাচ্ছে, কেউবা আঙ্গুরী তাম্বুল হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বা চন্দ্র বান, ত্রিশূলধ্বজ, সূর্যধ্বজ, পাঞ্জা, মীনমানব শ্বেতছত্র ধারণ করে সিংহাসনের চারিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। সিংহাসন বেদীর সম্মুখে শত শত দরবারীগণ, আমত্যবর্গ, দফা প্রধানগণ, সেনাগণ নিজ নিজ আসনে বসে রয়েছে। রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, নানান বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হচ্ছে। দরবারীগণের মধ্যে কখনও তর্ক বিতর্ক হচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তি খণ্ডণ বিখণ্ডণ হচ্ছে। এরই মধ্যে রাজ চোপাদার চোন্তাইকে হাজির করল রাজ দরবারে। একজন আগন্তুককে দরবারে হাজির করতে দেখে দরবারীগণের মধ্যে কথাবার্তা থেমে গেল। কারো মুখে কোন শব্দ নেই। সবাই তাকিয়ে রইল আগন্তুকের দিকে।

মহারাজা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন – হুম! নীং সাব' ? নীং তীমা সানি নাই ?

(কে তুমি ? কি তোমার অভিপ্রায়, বলো)

যথাযথ প্রণাম নিবেদন করে চোন্তাই ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল। মহারাজ! আং চোন্তাই। চোন্তাই পাড়ানি চোন্তাই। নীং রিংখনী হিনীইসে ফাইমানি। আনি কোনো দুস করই। আং সামীং সিতারা তাংয়া। আনী মাফ খ্লাইদি মহারাজ। (মহারাজ! আমি চোন্তাই। চোন্তাই গ্রামের চোন্তাই। আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। তাই এসেছি। আমার কোন দোষ নেই। আমি কোন অন্যায় কাজ করি না। আমাকে মাফ করে দিন, মহারাজ।)

চোন্তাইয়ের কথা শুনে মহারাজ ত্রিপলী কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর বলে উঠলেন হুম, নিনি কতর দুস তংগী। নীং মীংগানাং চোন্তাই হিনীই আং সিয়ো । কামী কতরনি বরক ননী হামজাকঅী। চোন্তাই অংগীই নীং মাইরাং জুরাগী, তীমীই নিনি তংমাণি চামানি কেরেং মেরেং।

(হুম! তোমার অনেক অপরাধ আছে। তুমি একজন স্বনামধন্য চোন্তাই বলে আমি জানতে পেরেছি। গ্রামের মানুষ তোমাকে সম্মান করে। চোন্তইগিরি করে তুমি যথেষ্ট আয় উপার্জন করো। অথচ তোমার জীবনযাত্রা,ঘরদোর এত জরাজীর্ণ কেন?)মহারাজের এহেন জিজ্ঞাসায় চোন্তাই মশাই হতভম্ব হয়ে গেল। এমনকি দরবারিগণও অবাক হলেন। ভয়ে ভয়ে চোন্তাই বলল,

মহারাজ আং আনি ফারিমানি মতে তংকৌচাং চানানি নাইয়ো। আং কীবাং জুরাগমায়া। সালোচার আনা সে জুরাগমানো। চারআনা পইসাবাই তীমা খ্লাইতাই। এক আনা আং মাচাঅী, একআনা লাগাই রগী, একআনা লাগাই চামাগী সুঅী,আরো এক আনা দান খ্লাইয়ো।

(মহারাজ! আমি আমার সামর্থ্যানুযায়ী জীবন যাপন করার চেষ্টা করি। আমি যথেষ্ট আয় উপার্জন করি না। আমি দৈনিক চার আনা উপার্জন করি মাত্র। চার আনা আয় দিয়ে আমি কি করবো মহারাজ। এক আনা আমি নিজে খাই, এক আনা সুদে খাটাই, এক আনা দেনা পরিশোধ করি এবং বাকী এক আনা দান করি।)

চোন্তাইয়ের কথা মহামন্ত্রীর পছন্দ হলো না। জবাব দেয়ার ভঙ্গিমাটা হেঁয়ালী বলে মনে হলো মহামন্ত্রীর। তিনি চোন্তাইকে ধমক দিয়ে বললেন,নিনি ককলাম সামানি সাক নাংয়া হাই। নীং সাক মাথারদি। ইম' রাজ দরবার। তীমা সানি নাই বেঠা। খ্লায়ই সাদি।

(চোন্তাই! তোমার কথাবার্তা হেঁয়ালীপূর্ণ। মনে রেখো এটা রাজ দরবার। যা

বলতে চাও তা খোলাসা করে বলো ।)

মহামন্ত্রীর ধমক খেয়ে চোন্তাই বলল । আমি চারআনা জুরাগমানি বিসিংঔ এক আনা আং মা চাঔ, আবনী নক জন্ত্র বুসমানী, এক আনা লাগাই রগী, আবনি অর্থ অংখা বৗসানী চারীগী । বাসা উলী আনী চারীনী । আব' লাগাই রমানি সামীং হাই অংখা, এক আনা লাগাই সুমানি অর্থ অংখা আফা বুড়ানী চারীগী । আরো এক আনা দাননি অর্থ অংখা । বুরইনো চারোগা । আবনি কোন মুনাফা ক্রই ।

(এক আনা আমি নিজে খাই এ কথা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন । একআনা সুদে খাটাই এর অর্থ হলো ছেলেকে খেতে দিই । ছেলে বড় হয়ে আমাকে রোজগার করে খাওয়াবে এ ভরসায় । এক আনা দেনা পরিশোধ করি এর অর্থ হলো আমার বৃদ্ধ পিতাকে খেতে দিই । এটা দেনা পরিশোধের সামিল বলে গণ্য হবে । বাকী এক আনা দান করি । এর অর্থ হলো স্ত্রীকে খেতে দিই । কারণ এতে আমার ভবিষ্যত কোন মুনাফা দেখি না ।)

চোন্তাইয়ের জবাব শুনে রাজ দরবারীগণ অবাক হলেন । সভাসদ চোন্তাই মশাইয়ের যুক্তিকে অতিশয় শিক্ষণীয় বলে অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন । সভাসদগণ চোন্তাইকে পুরস্কৃত করার জন্যে রাজ দরবারে আবেদন জানালেন ।

ত্রিপুরা মহারাজা ত্রিপলী পুরষ্কারস্বরূপ একটি জায়গীর প্রদান করলেন এবং চর্তুদ্দর্শ মন্দিরের একজন চোন্তাই হিসাবে নিযুক্ত করলেন ।

অতঃপর রাজ বিচকারকে আদেশ দিলেন,এ মূল্যবান কথাগুলো কাইথর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রাখতে ।

পাদটীকা

১ । চোন্তাই : চোন্তাই শব্দটি পদ বা উপাধি বিশেষ । যিনি বারোয়ারী পূজা পরিচালনা করতে সক্ষম তাঁকে চোন্তাই বলে ॥ ২ । সিবরাই : স্রষ্টাকে সিবরাই বলে । ত্রিপুরীদের বিশ্বাস সিবরাই তাদের স্রষ্টা ও আদি পিতা । ৩ । বিচকার : তথ্যকার । যিনি তথ্য লিপিবদ্ধ করেন ।

কুনো ব্যাঙের শাস্তি

সে অনেক দিন আগের কথা। সে যুগে পৃথিবীর তাবৎ জীবজন্তু একে অপরের ভাষা বুঝতো। একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলতে পারতো, ভাব বিনিময় করতে পারতো। সুখে দুঃখে ও বিপদের দিনে একে অপরকে সহযোগিতা প্রদান করতো, সমবেদনা জানাতো। সে যুগে ত্রিপুরা মহারাজা অরিজিৎ পৃথিবী শাসন করতেন। রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তর ছিল বিশাল সমুদ্র। আর সমুদ্রের তীর ঘেষে ছিল তেপান্তরের মাঠ। সেই তেপান্তরের মাঠে ছিল ছোটখাটো একটা সরোবর আর সরোবর ঘিরে ছোট একটি বন। সেই ছোট বনে বাস করতো একটা টুনটুনি। সরোবরের কাছেই ছিল ছোট্ট একটা গর্ত। সেই গর্তে বাস করতো একটা কুনো ব্যাঙ। টুনটুনি আর কুনোব্যাঙের মধ্যে ছিল খুব ভাব। ভোর হলেই টুনটুনি বন্ধু কুনোব্যাঙকে সুপ্রভাত জানিয়ে বেরিয়ে পড়তো খাদ্যের সন্ধানে আর বাসায় ফিরতো সন্ধ্যায়। বাসায় ফিরতেই টুনটুনি সে দিনের সে যা কিছু দেখেছে, শুনেছে সব কিছু পই পই করে কুনো ব্যাঙকে শোনাতো। কুনোব্যাঙ টুনটুনির কথা হা করে শুনতো আর বিস্ময় প্রকাশ করতো। এতে টুনটুনি খুব গর্ব বোধ করতো। বলতো তোমার জন্য আমার খুব দুঃখ হয় বন্ধু। তোমার যদি আমার মতো দু'টি পাখা থাকতো তা হলে তুমিও দেখতে পেতে পৃথিবীর কাণ্ডকারখানা। টুনটুনির কথা শুনে বেচারা কুনোব্যাঙ মুখে কিছু বলতে না পারলেও অন্তর দহে জ্বলতো আর টুনটুনিকে হিংসা করতো। বেচারা কুনোব্যাঙের করার মতো কিছু ছিলো না। সে কি করবে ? তার তো পাখা নেই যে উড়ে গিয়ে পৃথিবী দেখে আসবে। যে চারখানা হাত পা রয়েছে তাও আবার কুঁজু। বাওয়া ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে চলতে পারে না। চেহারা সুরতও কুৎসিত। কোনদিন পেটভরেও খেতে পায় না। ধারে কাছে যে ক'টা পোকা মাকড় চলে আসে তাইই শিকার করে খেয়ে বেঁচে আছে। তার এই অবস্থার জন্য কুনোব্যাঙ বিধাতাকে গালি গালাজ করতো আর কিভাবে টুনটুনির উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায় এ নিয়ে ভাবতো।

একদিন সন্ধ্যার সময় টুনটুনি বাসায় ফিরে আসলে পর কুনো ব্যাঙ গলা খ্যাকিয়ে বললো, বন্ধু টুনটুনি, অনেকদিন তো হলো গর্তে জীবন কাটালাম। বয়সও কম

হয়নি। তুমি তো উড়ে উড়ে পৃথিবীর অনেক কিছু দেখলে। আমার তো সে ভাগ্যও নেই। তাই বলে বসে থাকলে তো হবে না। আমারও কিছু একটা করা দরকার। কুনোব্যাঙের কথা শুনে টুনটুনি লেজ নাচিয়ে গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে বেশ কয়েকবার লাফ দিয়ে কৌতূহল ভরে জিজ্ঞেস করলো, তা তো বটেই, তা তো বটেই। তো বন্ধু, তুমি কি করতে চাও বলতো শুনি।

কুনোব্যাঙ আমতা আমতা করে বললো, আমি আর কি করবো ? সারা জীবন তো পোকামাকড় খেয়ে জীবন, বাঁচিয়েছি। এতে অনেক পাপ কাজ করে ফেলেছি। তাই, সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবার আমি তীর্থ পর্যটনে যাবো। তীর্থে গিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। যে ক'দিন তীর্থ পর্যটনে থাকবো সে ক'দিন তোমাকে একা থাকতে হচ্ছে। আমার তো ছোট্ট একটা গর্ত ছাড়া সহায় সম্পত্তি তেমন নেই। তুমি একটু আমার গর্তটার দিকে নজর রেখো। কুনোব্যাঙের কথা শুনে টুনটুনি লেজ নাচিয়ে কিছুক্ষণ হাসলো। তারপর বললো ঠিক আছে বন্ধু। আমি তোমার গর্তের পাহারা দেবো। তবে পৃথিবীর খবরা-খবর আনা চাই। তা কবে তীর্থ পর্যটনে যাচ্ছো শুনি।

কুনো ব্যাঙ বললো, আজ মধ্যরাতেই বেরুচ্ছি। তখন তুমি ঘুমে আচ্ছন্ন থাকবে। পৃথিবীর খবর অবশ্যই নিয়ে আসবো। বন্ধু বিদায়। শুভ রাত্রি।

কুনোব্যাঙ যে তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছে তা টুনটুনির কিছুতেই বিশ্বাস হলো না। ভোর হতে না হতেই টুনটুনি কুনোব্যাঙকে চারিদিকে খুঁজতে লাগলো। না কুনোব্যাঙের কোথাও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। কুঁজো হাত পা নিয়ে সে গেলো কোথায় ? টুনটুনি সাত দিন ধরে কুনো ব্যাঙকে খুঁজলো। না কুনো ব্যাঙ একেবারেই লাপাত্তা। শেষমেষ টুনটুনি তেপান্তরের মাঠের দক্ষিণ দিকে ছুটে গেলো। সেখানে সমুদ্রের এক ঝটিকা বাতাসের ঝাপটা খেয়ে কোন মতে প্রাণ হাতে করে ফিরে এলো টুনটুনি। ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো গাছের ডালে। পরের দিন আর বেরুলো না। সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়িয়ে এলো। এমন সময়ে কুনোব্যাঙ এসে হাজির হলো। বেশ গলা হাঁকিয়ে টুনটুনিকে ডাকলো। বললো, বন্ধু টুনটুনি তুমি এখন কোথায় ?

কুনো ব্যাঙের ডাক শুনে টুনটুনি গাছের ডাল থেকে ফুড়ুৎ করে নীচে নেমে এলো। কুনোব্যাঙকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো। বন্ধু, তুমি তো আচ্ছা লোক হে। এই সাতদিন তুমি কোথায় ছিলে বলতো ? তা তোমার তীর্থক্ষেত্র কতদূর ?

কুনোব্যাঙ গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো অনেক অনেক দূর।

টুনটুনি জিজ্ঞেস করলো, সে কি তেপান্তরের মাঠের শেষ সীমানা থেকেও অনেক দূর?

আরে দূর বোকা, আয়েসি করে জবাব দিলে কুনোব্যাঙ।
আরে তেপান্তরের মাঠের শেষ সীমানা তো এখানেই। চোখের পলকে যাওয়া যায়। সহস্র সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করার পর তীর্থ ক্ষেত্র পাওয়া যায়। হাতের আঙ্গুল দিয়ে তীর্থ ক্ষেত্রের পথ নির্ণয় করা যায় না। বড় বড় কিতাব খুলে গণাপড়া করলে পর দু'একটা তীর্থক্ষেত্রের দূরত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে। সে কি তীর্থ ক্ষেত্র কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন। পুণ্যের শরীর না হলে মানুষ তীর্থ ক্ষেত্র থেকে ফিরে আসতে পারে না। যেতে যেতে আয়ু শেষ হয়ে পথেই মারা যায়। আমার পুণ্যের শরীর কিনা তাই ফিরে আসতে পেরেছি।
টুনটুনি কুনোব্যাঙের কথা অবাক হয়ে শুনলো। কাশী,গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন এসব তীর্থ ক্ষেত্রের নাম টুনটুনি তার সাত জনমেও,শোনেনি। এতোদিন সে কুনোব্যাঙকে সত্য মিথ্যা কথা বলে বোকা বানিয়েছিল। এখন সে নিজেই বোকা বনে গেলো। এবার আমতা আমতা করে সে কুনোব্যাঙকে জিজ্ঞেস করলো,
তীর্থের খবরাখবর এনেছো কিছু ? অনেক অনেক এনেছি। যা এনেছি তা আমাদের সাত জনমেও বলে শেষ করা যাবে না। তার আগে একটা জরুরী সংবাদ ছিল। কিন্তু বন্ধু টুনটুনি, তোমাকে এ সংবাদটা বলতে আমার সাহস হচ্ছে না। যদি তুমি মনে কিছু করো এ ভয়ে বলতে মন চাচ্ছে না।
টুনটুনি বললো – কি এমন সংবাদ যে তুমি আমাকে বলতে ভয় পাচ্ছো ? আমি তোমার বন্ধু। দীর্ঘদিনের সাথী। আমি জানতে চাই কি সে সংবাদ।
টুনটুনির কথা শুনে কুনোব্যাঙ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো। তারপর বললো, বন্ধু টুনটুনি সংবাদটা খুবই ভয়ঙ্কর ও বিপদজনক। আজ দুপুরের পর আমাদের এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীর উপর যে গাছ গাছালি তৃণলতা বন উপবন সাগর নদী রয়েছে সব ভেঙে চুরে ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবী উলট পালট হবে। উপরের অংশ নীচে ঢেবে যাবে আর নীচের অংশ উপরে উঠে আসবে। ভয়ঙ্কর ঝড় তুফান, আসবে। আমি ভাবছি যে, আমি তো আমার ছোট্ট গর্তে প্রবেশ করে জীবনটা কোন রকমে বাঁচাতে পারবো। কিন্তু তোমার কি উপায় হবে। তাই বলছিলাম কি তুমি একটা গর্ত খুঁজে বের করে জীবনটা বাঁচাও। বেঁচে থাকলে পরে অনেক কথা বলা যাবে।
কুনোব্যাঙ এমনভাবে ভয়ঙ্কর সংবাদটা বয়ান করলো টুনটুনির আত্মারাম শুকিয়ে যায় আর কি। সে আর এক মুহূর্ত দেরী না করে গর্তের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। টুনটুনি ভীষণ ভয় পেয়েছে জেনে কুনোব্যাঙ খুব মজা পেলো। আর বিড় বিড় করে বললো, এতোদিন আমাকে বোকা বানিয়ে খুব তো অহংকার দেখিয়েছিলে। এখন আমার মজা দেখে কে?

এদিকে হলো কি, টুনটুনি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দিগ্বিদিক হয়ে ছুটছে তো ছুটছে। কোথাও নিরাপদ একটা গর্ত খুঁজে পাচ্ছে না। তার মাথায় শুধু একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে দুপুর গড়িয়ে গেলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। বাঁচার উপায় কী হবে ?

এদিকে হলো কি,একটা বড়গাছের মগডালে বসে বিরাট একটা রংরাং পাখী ডানা মেলে রোদ পোহাচ্ছিল আর হা করে বাতাস খাচ্ছিল। এমন সময়ে টুনটুনি ওখানে গিয়ে হাজির হলো। দেখলো বেশ বড়সড়ো দুটি গর্ত। জীবনটা বাঁচাতে হলে এ গর্তে প্রবেশ করা চাই এ ভেবে কোন বাছবিচার না করে রংরাংয়ের নাকের ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়লো টুনটুনি। আর যায় কোথায়। নাকের ভেতর সুড়সুড়ি হওয়াতে রংরাং বিকট শব্দ তুলে দিলো এক হাঁচি। এখন হলো কি কাছেই একটা গাছের ডালে বসে একটা বানর একটা মিষ্টি কুমড়া নিয়ে খেলছিল। বানরটা কুমড়াটাকে একবার ডান হাতে, একবার বাম হাতে নিয়ে খেলছিল। এই মিষ্টি কুমড়াটা কে খাবে ? আমি খাবো না বউ খাবে ? বউ খাবে না বাচ্চারা খাবে ? এমন সময়ে রংরাং পাখির পিলে চমকানো হাইচ্চোর শব্দে ভয় পেয়ে মিষ্টি কুমড়াটা হাত থেকে নীচে পড়ে গেলো।

এখন হলো কি সেই গাছের তলে এক গর্ভবতী হরিণী শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। বানরের হাত থেকে ফসকে যাওয়া কুমড়াটি গিয়ে পড়লো হরিণীর পেটে। হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে কি এসে পড়লো এই ভয়ে কোন কিছু না দেখে হরিণী প্রাণ হাতে নিয়ে দিল দৌঁড়। দৌঁড় তো দৌঁড়। একটা অজগর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আয়েশ করে বিশ্রাম নিচ্ছিল। হরিণীটি দৌঁড়ের চোটে অজগরের কুণ্ডলী মাড়িয়ে চলে গেলো। বেচারা অজগর সাপের বিশ্রাম নেয়া তো দূরের কথা মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে কঁকিয়ে উঠে শত্রুকে খুঁজতে লাগলো। খুঁজতে খুঁজতে দেখলো একটা বন মুরগী ডিমে তাপ দিচ্ছে। অজগর সাপটা রেগে মেগে বন মুরগীর সব ক'টা ডিম গপাগপ খেয়ে রাগ নিবারণ করলো। বন মুরগী কি আর করবে ? সে তো আর অজগর সাপের সাথে যুদ্ধ করে পেরে উঠবে না। তাই মনের দুঃখে কটাক্ কটাক্ করে উড়াল দিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলো। বন মুরগীটা যে স্থানে গিয়ে নামলো সেখানে দেখলো মস্ত বড়ো পিঁপড়ার বাসা। তার আক্রোশ গিয়ে পড়লো পিঁপড়ার উপর। বন মুরগীটা নিজের পা দিয়ে পিঁপড়াদের বাসা তছনছ করে দিল আর পেটভরে পিঁপড়াদের ডিম খেয়ে ফেললো। ঘটনার আকস্মিকতায় পিঁপড়ার দল কিছুক্ষণ বন মুরগীর সাথে লড়াই করলো বটে কিন্তু পেরে উঠতে না পেরে শেষে প্রাণ নিয়ে দিগ্বিদিক পালাতে শুরু করলো। পিঁপড়ার দল পালাচ্ছে তো পালাচ্ছে। এখন হলো কি এক বন্য শুকর কাদামাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে

গোসল করছিল। পলায়নরত পিঁপড়ার আক্রোশ গিয়ে পড়লো তার উপর। তারা সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে বন্যশুকরের অণ্ডকোষে কামড় বসিয়ে দিল। বেচারা বন্য শুকরটি পিঁপড়ার আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে দিশাহীনভাবে সেই স্থান থেকে পালিয়ে গেলো। পালিয়ে গিয়ে পড়লো এক জুম ক্ষেতে। এই জুম ক্ষেতটি ছিল এক বিধবা মহিলার। একে তো রাগে গজগজ করছিলো বন্য শুকরটি। তার উপর জুম ক্ষেতে পাকা ধান, কচু, চিনার,মারফা দেখে সমানে খাওয়া শুরু করে দিলো। জুমের ফসল বন্য শুকর এসে খেয়ে ফেলেছে দেখে বিধবা মহিলাটি হায় হায় করে উঠলো। আর অমনি হাতের কাছে কিছু না পেয়ে রজং গোড়ায় আঘাত দিয়ে শুকর তাড়ালো। রজং মানে বাঁশের গোড়া। মানুষ আর বন্য পশুর অত্যাচারে রজংটি এমনিতেই মর মর অবস্থা। তার উপর বিধবা মহিলার কাণ্ডজ্ঞানহীন পেটানো খেয়ে শেষ জীবন থাকতে সে ত্রিপুরা রাজ দরবারে গিয়ে নালিশ জানালো।

রজং : মহারাজ, আমি আপনার রাজ্যের একটা রজং। আমার যে দু'একটা কচি ডগা বের হয় অমনি মানুষ কিম্বা বন্য পশু এসে খেয়ে ফেলে। এবার আরো দু'একটা কচি ডগা বের হতে যাচ্ছিল এমনি সময়ে বলা নেই কওয়া নেই বিধবা মহিলাটি কোথা থেকে এসে পেটানো শুরু করলো। আর কচি ডগাগুলি অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেলো। বিধবার অত্যাচারে আমার আর বেঁচে থাকার মত কোন উপায় নেই। আমি মরে যাওয়ার আগে অত্যাচারী বিধবা মহিলার শাস্তি দেখে যেতে চাই। মহামান্য, আপনি বিচার করুন।

রজংয়ের আর্জি শুনে ত্রিপুরা মহারাজা অরিজিৎ কোতোয়ালকে আদেশ দিলেন বিধবা মহিলাটিকে রাজ দরবারে এনে হাজির করতে। কোতোয়াল হলো পুলিশের প্রধান কর্তা। মহারাজার আদেশ পেয়ে কোতোয়াল হুকুম দিলো থানার দারোগাকে বিধবা মহিলাটিকে গ্রেফতার করে রাজ দরবারে নিয়ে আসতে। দারোগা বেটা একদল সিপাই নিয়ে ছুটে গেলো জুম ক্ষেতে আর বিধবা মহিলাটিকে গ্রেফতার করে হাজির করলো রাজ দরবারে।

বিধবা মহিলা : আমার কি দোষ মহারাজ ? আমি বিধবা মহিলা। স্বামীহারা, সন্তান হারা। তিন কুলে আমার কেউ নেই। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য এ বছর আমি এক খণ্ড জুম চাষ করেছি। ক্ষেতে ফলন ধরা শুরু করেছে মাত্র অমনি কোথা থেকে বন্য শুকরটা এসে ফসল খাওয়া শুরু করে দিলো। আমি জুম ক্ষেতের ফসল নষ্ট হতে দেখে দিশাহারা হয়ে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে রজং পিটিয়েছি। এতে আমার দোষ কিসের।

আর্জি শুনে মহারাজা দেখলেন বিধবার তেমন দোষ নেই। যত নষ্টের মূলে

রয়েছে বন্য শুকরটা। তাকে গ্রেফতার করে দরবারে হাজির করতে মহারাজা হুকুম দিলেন। সিপাহীগণ ছুটে গেলো বন্য শুকরটাকে গ্রেফতার করতে। এ বন, সে বন খুঁজতে খুঁজতে শেষে এক সরোবরের ধারে শুকরটাকে পাওয়া গেলো। আর যায় কোথায় ? শুকরের গলায় দড়ি বেঁধে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আনা হলো রাজ দরবারে।

মহারাজা : তুমি অন্যায়ভাবে বিধবা মহিলার জুমের, ফসল খেয়েছো। এতে তোমার অপরাধ হয়েছে। তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

বন্যশুকর : মহারাজ। আমার কি দোষ। আমি প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ সহ্য করতে না পেরে কাদামাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম। এমন সময়ে বলা নেই কওয়া নেই শত সহস্র পিঁপড়া এসে আমার অণ্ডকোষে কামড় বসিয়ে দিলো। পিঁপড়াদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে আমি অতিশয় রেগে মেগে জুমের ফসল খেয়েছি। এতে যদি আমার অপরাধ হয় তার জন্য দায়ী পিঁপড়ার দল।

বন্য শুকরের আর্জি শুনে মহারাজা দেখলেন অপরাধের মূলে রয়েছে পিঁপড়ার দল। মহারাজা অত্যাচারী পিঁপড়াগুলোকে গ্রেফতার করে রাজ দরবারে হাজির করতে কোতোয়ালকে হুকুম দিলেন। দল বেঁধে সিপাহীগণ ছুটে গেলো পিঁপড়াগুলোকে গ্রেফতার করতে। পিঁপড়াগুলোকে খুঁজে পেতে গ্রেফতার করা কি চাট্টিখানি কথা। অনেক চেষ্টা তদবির করার পর পিঁপড়াগুলাকে গ্রেফতার করে দরবারে আনা হলো।

মহারাজা : শোনো পিঁপড়াগণ, তোমরা দল বেঁধে অন্যায়ভাবে বন্য শুকরের অণ্ডকোষে কামড় দিয়েছো। এ জন্য তোমাদের কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

পিঁপড়ার দল : মহারাজ, আমাদের কি দোষ। কোথা থেকে একটা বন্য মুরগী এসে আমাদের উপর এমন অত্যাচার করলো, আমরা পেরে উঠতে না পেরে রেগে মেগে শুকরের অণ্ডকোষে কামড় দিয়েছি। এতে আমাদের দোষ কোথায়?

পিঁপড়াদের আর্জি শুনে সভাসদ বলে উঠলো মহারাজ পিঁপড়াদের দোষ নেই। সব অপরাধের মূলে রয়েছে ঐ বন্য মুরগীটা। তাকে গ্রেফতার করার আদেশ দিন মহারাজ।

বন্য মুরগীটাকে গ্রেফতার করে আনতে আবারো ছুটলো সিপাহীরা। কোথায় সে দুরাচারী মুরগী। এ বন, সে বন খুঁজতে খুঁজতে শেষে পাওয়া গেলো এক ঝোঁপে। তাকে গ্রেফতার করে দরবারে হাজির করা হলো।

মহারাজা : শোনো বন্য মুরগী। তুমি বিনা উস্কানিতে পিঁপড়াদের উপর অত্যাচার করেছো। এ অপরাধের জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

বন্যমুরগী : মহারাজ, আমার কোন দোষ নেই। পিঁপড়াদের উপর অত্যাচার

করার আমার কোন ইচ্ছা ছিলো না। কিন্তু কোথা থেকে একটা অজগর সাপ এসে আমার তাপ দেয়া ডিমগুলো গপাগপ খেয়ে ফেলাতে আমি ভয়ানক চটে গিয়েছিলাম। অজগর সাপকে শায়েস্তা করতে না পেরে আমি পিঁপড়াদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। এতে আমার দোষ কোথায় ?

এবার সিপাহীরা অজগর সাপটাকে গ্রেফতার করে দরবারে হাজির করলো। অজগর সাপের তখনও রাগ কমেনি। সে ফোঁস ফোঁস করতে করতে আর্জি পেশ করলো।

অজগর : মহারাজ, আমার দোষ কিসের। আমি দিন দুপুরে খেয়ে দেয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। এমন সময়ে উন্মাদপ্রায় একটা হরিণী আমাকে মারিয়ে চলে গেলো। হরিণীর খুরের আঘাতে মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছি। আমি আহত হয়েছি। তাকে কাছে পেলে জ্যান্ত গিলে ফেলতাম। হরিণীকে ধরতে না পেরে রাগে দুঃখে আমি বন্য মুরগীর ডিমগুলি খেয়েছি। এতে আমার দোষ কোথায় ?

অজগরের আর্জি শুনে সবাই বললো মহারাজ, এর কোন দোষ নেই। যত দোষ ওই হরিণীর। আমরা হরিণীর বিচার চাই। এবার সিপাহীরা দল ছুটে গেলো হরিণীকে গ্রেফতার করতে। হরিণী খবর পেয়ে কিছুক্ষণ এ বন, সে বন পালালো। শেষে ধরা খেয়ে দরবারে উপনীত হলো।

হরিণী : মহারাজ, আমি সৎ জ্ঞানে অজগরকে পা দিয়ে মাড়াইনি। আমি গর্ভবতী। চলতে ফিরতে কষ্ট হয়। সেদিন আমি অসুস্থ শরীর নিয়ে একটা গাছের তলায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। এমন সময়ে, গাছের উপর থেকে একটা বানর কি যেনো একটা ভারী জিনিস আমার পেটের উপর ফেলে দেয়ায়, আমি প্রচণ্ড ভাবে যেমন ব্যাথা পেয়েছি তেমনি ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে অজগরের কুণ্ডলী মাড়িয়েছি। এতে যদি কোন দোষ হয় তাহলে সে দোষটি ওই বানরের। আমার দোষ নেই মহারাজ। এবার বানরের পালা। সিপাহীরা ছুটে গেলো দুষ্টু বানরটাকে গ্রেফতার করতে। সবাই বলে ধর ধর। বানর এ গাছ থেকে ও গাছে কিছুক্ষণ লাফালাফি করলো। শেষে ধরা খেয়ে সিপাহীদের হাতে বন্দী হলো।

বানর : মহারাজ, একটা পরিত্যক্ত জুম ক্ষেতে খোঁজাখুঁজি করতে করতে আমি একটা মিষ্টি কুমড়া পেয়েছিলাম। তখন আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলাম। মিষ্টি কুমড়াটি আমি খাবো না আমার বউ খাবে, না আমাদের সন্তানেরা খাবে এ সব ভাবছিলাম এমন সময়ে রংরাং পাখীটা প্রচণ্ড শব্দে হাইচ্চো দেয়াতে ভয়ে আমার হাত থেকে মিষ্টি কুমড়াটা নীচে পড়ে গিয়েছিল এবং পড়বি তো পড় তাও হরিণীর পেটে। এতে আমার কি দোষ মহারাজ।

তাই তো। বানরের কোন দোষ নেই। ভয় পেয়েছে তাই হাত থেকে ফসকে মিষ্টি কুমড়াটা নীচে পড়েছে। এতে আর কি তেমন অপরাধ। যদি অপরাধ করে থাকে তো সেটা ওই, রং রাং। সিপাহীগণ আবার ছুটলো রংরাং পাখীটাকে গ্রেফতার করতে।

রংরাং পাখী : মহারাজ, আমার কোন দোষ নেই। সবাই জানে যে, আমরা সূর্য্যদেবের উপাসক। আর তাই,সূর্য্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে সূর্য্যকে আরাধনা করতে ধ্যানে মগ্ন থাকি। আর উঠার পর ভর দুপুরের তপ্ত বায়ু সেবন করে জীবনকে দীর্ঘায়ু করি। সেদিন আমি একটি গাছের ডালে বসে চোখ বন্ধ করে তপ্ত বায়ু খাচ্ছিলাম। এমন সময়ে কোথা থেকে একটা টুনটুনি এসে আমার নাকের ছিদ্র পথে প্রবেশ করলো। এতে সুড়সুড়ি হওয়াতে আমি প্রচণ্ডভাবে হাইচ্চো দিই। টুনটুনি যদি এমন কাজটি না করতো তাহলে আমি হাইচ্চো দিতাম না। এতে কারোর ক্ষতি হয়ে থাকলে তার জন্য আমি অপরাধী নয়। এর মূলে রয়েছে টুনটুনি।

এবার টুনটুনিকে ধরতে ছুটে গেলো রাজ সিপাহীগণ। টুনটুনি ছোট পাখী। সহজে চোখে পড়ে না। সিপাহীগণ চোখে সুরমা পরে খুঁজতে খুঁজতে টুনটুনিকে পাওয়া গেলো। পিছমোড়া বেঁধে রাজ দরবারে হাজির করা হলো।

টুনটুনি : মহারাজ, আমি ছোট পাখী, ছোট প্রাণ। আমাকে দিয়ে কারো ক্ষতি হবে এ কথাও আমি কল্পনা করি না। ছোট একটা বনে আমি বাস করি। সে বনে আমার সাথে বাস করে একটা কুনোব্যাঙ। সে আমার একান্ত বন্ধু মানুষ। সে তীর্থ পর্যটনে গিয়েছিলো। তীর্থ থেকে ফিরে এসে সে আমাকে বললো যে, প্রচণ্ড ভূমিকম্পে এই পৃথিবী ওলট পালট হয়ে যাবে। পৃথিবীর উপরের অংশ নীচে ঢেবে যাবে আর নীচের অংশ উপরে উঠে আসবে। সে বললো যারা গর্তে বসবাস করে তারাই কেবল বেঁচে থাকবে। বাদ বাকী সবাই মারা যাবে। কুনো ব্যাঙের কথায় আমি ভয়ানকভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আমি দিগ্বিদিক হয়ে একটা গর্ত খুঁজছিলাম। পরে একটা গর্ত দেখে ওটাতে আমি প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু ওটা যে রংরাং পাখীর নাকের ছিদ্র তা আমি জানতাম না। এতে যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে তা হলে সেটা কুনোব্যাঙের কারণে হয়েছে।

টুনটুনির আর্জি শুনে দরবারস্থ সকলেই চিৎকার করে বলে উঠলো যত নষ্টের মূলে রয়েছে ওই কুনোব্যাঙ। তাকে অচিরেই গ্রেফতার করে দরবারে হাজির করো। রাজ সিপাহীগণ ছুটে গেলো কুনোব্যাঙকে গ্রেফতার করতে। একটা মাছি ছিল কুনোব্যাঙের পুরানো বন্ধু। সে সবার আগে এসে কুনোব্যাঙকে সতর্ক করে

দিয়ে গিয়েছিল। এতে কুনোব্যাঙ প্রাণান্তরভাবে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে গর্তের ভেতর চুপ করে রইলো।

রাজ সিপাহীগণ এসে দেখলো কুনোব্যাঙ গর্তের ভেতর বসে আছে।

সিপাহীগণ : এ্যাই কুনোব্যাঙ, তুমি গর্তের ভেতর বসে আছে ক্যান ? বাইরে চলে এসো। তোমাকে রাজ দরবারে তলব পড়েছে।

কুনোব্যাঙ : কটো কটো, কট কট, একটু সবুর করো – ধূতিটা পরে নিই।

সিপাহীগণ : কি হলো। এতো দেরী ক্যানো ?

কুনোব্যাঙ : আর একটু সবুর করো। জামাটা পরে নিই।

সিপাহীগণ : কি হলো। জামাটা পরা হয়নি। তাড়াতাড়ি গর্ত থেকে বেরিয়ে এসো।

কুনোব্যাঙ : আহা! অত তাড়া দিচ্ছো ক্যানো। এই যে, মাথার পাগড়ীটা বেঁধে নিই।

নানা উছিলা দেখিয়ে কুনোব্যাঙ আর গর্ত থেকে বের হয় না। শেষে সিপাহীগণ গর্ত খুঁড়ে কুন্যোব্যাঙটাকে টেনে বাইরে নিয়ে এলো। সবাই দেখলো কোথায় ধূতি পরা, কোথায় জামা গায়ে দেওয়া, মাথায় পাগড়ী বাঁধা কিছুই নেই। কোমরে দড়ি বেঁধে সিপাহীগণ কুনোব্যাঙকে দরবারে নিয়ে গেলো।

কুনোব্যাঙকে গ্রেফতার করে আনতে দেখে সবাই চিৎকার করে শ্লোগান দিতে থাকলো।

কুনোব্যাঙের চামড়া, খুলে নেবো আমরা।
কুনোব্যাঙের শাস্তি চাই, কুনোব্যাঙের ফাঁসি চাই ॥
হৈ হৈ রৈ রৈ
কুনো ব্যাঙের ধূতি কৈ ?
হৈ হৈ রৈ রৈ
কুনো ব্যাঙের জামা কৈ ?
হৈ হৈ রৈ রৈ
কুনো ব্যাঙের পাগড়ী কৈ ?

কুনোব্যাঙকে দেখে মহারাজা বললেন – তুমি টুনটুনিকে কি বলেছো. ? বলো।
কুনোব্যাঙ জবাব দেয় 'ক'
তুমি বলেছো পৃথিবী উলট পালট হয়ে যাবে ?
কুনোব্যাঙ জবাব দেয় 'ক'
তুমি কি টুনটুনীকে ভয় দেখাবার জন্য মিথ্যা কথা বলেছো ?
কুনোব্যাঙ জবাব দেয় 'ক'।

মহারাজা কুনোব্যাঙকে আদ্যোপান্ত পরীক্ষা করে বিচারের রায় দিলেন, এই কুনোব্যাঙ টুনটুনিকে জব্দ করার জন্য মিথ্যা কথা বলে যত সব অঘটন ঘটিয়েছে। একে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে একশত গা বেত মারা হোক। মহারাজার আদেশ পেয়ে সিপাহীগণ কুনোব্যাঙকে কাঁঠাল গাছের ডালে ঝুলিয়ে একশত গা বেত মারতে থাকলো। এক বেত পেটায় তো কুনোব্যাঙটি একটু ফুলে উঠে। এভাবে যত পেটায় যত পেটায় তত ফুলে। আর গা থেকে ফিনকি রস বের করে। ফুলতে ফুলতে এক সময় পটাস করে – কুনোব্যাঙের পেট ফেটে গেল। কুনোব্যাঙের শাস্তি এভাবে হলো। এদিকে সেই কুনোব্যাঙের গা থেকে বেরুনো রস-কাঁঠাল গাছে ছিটকে পড়াতে কাঁঠাল গাছে গোটা গোটা বিচির জন্ম নেয়। সে গোটা বিচিটি আজও কাঠাল গাছের গায়ে দেখা যায়।

আর সেই ঘটনার পর থেকে কোথাও কোন অঘটন ঘটলে আর ঘটনার মূল হোতাকে খুঁজে বের করতে পারলে ত্রিপুরা সমাজে বলে থাকে "ও তা হলে এই সে সিপ্রসা"। অর্থাৎ যত নষ্টের মূল এই সে কুনোব্যাঙ ? এই ঘটনার পর থেকে লোক শিক্ষা দেয়ার জন্য ত্রিপুরা মহারাজা বিচককে ডেকে আদেশ দিলেন ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করে রাখতে।

ট্রং কুমারের কাণ্ড

ত্রিপুরা রাজ্যের এক জুমচাষী। নাম ছিল ট্রং কুমার। সে ছিল খুবই সাদাসিদা মানুষ। একদিন ট্রং কুমার হাপিং থেকে কিছু তরিতরকারী সংগ্রহ করে ঘরে ফিরছিল। এমন সময় সে দেখল বুনোপথে একজন লোক আলখেল্লা পোশাক পরে পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রং কুমারকে দেখে জিজ্ঞেস করল,ও ভাই এখান থেকে আগরতলা শহর কতদূর বলতে পার?

ট্রং কুমার কোন দিন গ্রাম ছেড়ে দূরে কোথাও যায়নি। আগরতলা শহরের নাম সে শুনেছে বটে কোনদিন যাওয়া হয়ে উঠেনি। সে একটু ভেবে চিন্তে বলল , ভাই, সে তো অনেক দূর। লোকটা গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল,তা হলে তো এ বেলায় আর শহরে পৌঁছানো যাবে না।

লোকটার প্রতি ট্রং কুম্যারের আগ্রহ বেড়ে গেল। সে তরকারি ঝুপড়িটা নামিয়ে লোকটার পাশে বসে জ্ত্তিজ্ঞেস করলো,তুমি কি শহরে থাক ? লোকটা মাথা নেড়ে বলল, না ভাই, আমি আগরতলা শহরে কাজের জন্য যাচ্ছি।

ট্রং কুমার বলল,ওখানে বুঝি অনেক কাজ পাওয়া যায় ? লোকটা বলল – যেই শহরে যায় সেই কাজ পায়। তুমিও কাজ পাবে। আরাম আয়েশে থাকতে পারবে। তোমাকে রোদে বৃষ্টিতে ভিজে মশার কামড় খেয়ে জুমচাষ করতে হবে না।

ট্রং কুমার ভাবলে, সে আর জুম চাষ করবে না। শহরে গিয়ে কাজ নেবে। যেই ভাবা সেই কাজ। হাতে কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করে, লোকজনের কাছে জেনে টেনে একদিন আগরতলা শহরে গিয়ে পৌঁছল। শহরে এসেই তো ট্রং কুমার খৈ হারিয়ে ফেলল। আজব কাণ্ড। ইয়া বড়বড় দালান কোটা, শত সহস্র রাস্তাঘাট গাড়ী ঘোড়া। লোকে লোকারণ্য। এত লোক সে কোনদিন দেখেনি। কোথায় গিয়ে কার কাছে কাজ খুঁজবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। এদিক ওদিক করতে করতে শেষে এক রাজপথচারীকে বিণয় সহকারে জিজ্ঞেস করল ভাই। আমি পাড়া গাঁয়ের মানুষ। কাজের সন্ধানে এসেছি। কোথাও কাজ পাওয়া যাবে ?

ট্রং কুমারকে দেখে কেমন যেন মায়া হল পথচারীর। তাকে নিয়ে গেল এক নারাণের কাছে। শহরের উপকণ্ঠে নারাণের বাড়ি।

নারাণের নানা কাজ। অনেক সয়সম্পত্তি। মান্যগণ্য মানুষ। মাথায় পাগড়ী বেঁধে হাতীর পিঠে চড়ে রাজ দরবারে যায়। দিনে এক কলসী মদ খায়। বাড়ীতে কত লোকজন তার। ট্রং কুমারকে ডেকে বললে, কী হে। কি কাজ করতে পারবি তুই ? ট্রং কুমার কি বলবে ভেবে পেল না। পথচারী বললে, কর্তা, আপনি যে কাজ দেবেন ও সে কাজটাই করবে।

নারাণ মশায় বললে ঠিক আছে। ও আমার শুকর চরাবে। দু'বেলা খাবে। বাঁশের হুকায় তামাক খাবে আর মাসিক পাঁচ রাং বেতন পাবে। রাং অর্থ টাকা। ত্রিপুরা রাজ্যে মুদ্রাকে রাং বলে।

নারাণ মশায়ের কথা শুনে ট্রং কুমারের খুব আনন্দ হল। বললে, আপনি যা বলবেন আমি তাই করব কর্তা। নারাণের বাড়িতে ট্রং কুমারের চাকুরী হল। মাসিক বেতন পাঁচ রাং। ভাবাই যায় না। এত বেশী বেতন। গ্রামে মাসিক চুক্তিভিত্তিক চাকরদের বেতন হয় বড়জোর এক রাং থেকে দু'রাং পর্যন্ত। আগরতলা শহরের পশ্চিমে হাওড়া নদী। এ নদীর তীরে বিস্তর চর। ওখানে শুকুরের চারণভূমি। একটা নয়, দু'টা নয় পাঁচশত শকুর চরাতে হবে ট্রং কুমারকে। দিনে দু'বেলা শুকরের খাদ্য যোগান দেয়া, গোসল করানো, খোয়াড়ে নেয়া কাজের কোন শেষ নেই। এত খাটাখাটি করেও বিশ্রাম নেই। নারাণ মশায়ের পা টিপে দিতে হয় রাতে। এক সিলিম তামাক যে খাবে তাও সুযোগ মেলে না। দেখতে দেখতে তিনমাস কেটে গেল। ট্রং ভাবলে আর না। তিন মাসের বেতন নিয়ে সে বাড়ীতে ফিরে যাবে মনস্থির করল। পনের রাং মাইনে দিয়ে সে কি করবে তাও মনে মনে হিসেব করে নিল। পাঁচ রাং দিয়ে সে শহর থেকে ছেলেমেয়ের জন্য পোশাক, বউয়ের জন্য রূপোর অলংকার, পুঁতিরমালা, হাতের চুড়ি, নিজের জন্য একখানি ধূতি, একখানি দা ও একটি কুড়াল কিনে নেবে বলে স্থির করল। বাড়িতে পৌছার পর পাঁচ রাং দিয়ে একজোড়া মুরগী, একটা ছাগী ও একটা গাই কিনবে বলে স্থির করল। এরপর বাকী পাঁচ রাং থেকে এক রাং দিয়ে কুড়ি আড়ি ধান এবং বাকী চার রাং সুদে খাটাবে বলে স্থির করে নিল। তখনকার সময়ে এক রাং দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে কুড়ি আঁড়ি ধান পাওয়া যেত। মুদ্রার মান বেশী ছিল আর জিনিসের মূল্য ছিল খুব সস্তা।

একদিন ট্রং কুমার নারাণের কাছে গিয়ে বলল, কর্তা মশায়, তিন মাস তো চাকুরী করা হলো। এবার বাড়ী ফিরতে চাই। দয়া করে আমার তিন মাসের মাইনা দিন।

নারাণ মশায় ছিল ধূর্ত প্রকৃতির। বাড়ির চাকরদের বিনা বেতনে খাটিয়ে তাড়িয়ে দিত। এবারও সে ট্রং কুমারকে বেতন না দিয়ে তাড়িয়ে দিতে মনস্থ করল।

বললে,তাতো যাবি। তবে যাবার আগে একটা কাজ করে দিয়ে যাবি। ট্রং কুমার বললে কী কাজ কর্তা।

নারাণ মশায় বললে,কাজ তেমন কিছু না। শহর থেকে আমার জন্যে এক রাং দিয়ে আহাঃ উহুঃ কিনে এনে দিয়ে তোর মাইনে নিয়ে বাড়িতে চলে যাবি। ঠিক আছে। তবে একটা কথা। আহাঃ উহুঃ এনে দিতে না পারলে মাইনে পাবি না। ট্রং কুমার কী আর করবে। কোন উচ্যবাচ্য না করে শহরে চলে গেল আহাঃ উহু কিনতে। সে সাত জনমেও দেখে নাই আহাঃ উহুঃ কী জিনিস। সে শহরে গিয়ে প্রথমে মুদির দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল – ভাই, আপনার এখানে কী আহাঃ উহু : পাওয়া যায়।

এ কথা শুনে দোকানী বললে,সেটা আবার কি জিনিস ? ট্রং কুমার কিছুতেই বুঝাতে পারল না আহাঃ উহু : কি জিনিস। দোকানী বললে,তুমি ভাই লোহার দোকানে গিয়ে দেখতে পারো। লোহার দোকানী বললে,আমি ঠিক চিনতে পারছি না তুমি বরং কাঠের দোকানে গিয়ে দেখতে পার। কাঠের দোকানী বললে ,ভাই তুমি সোনার দোকানে গিয়ে দেখ। কেউই আহাঃ উহুঃ কি জিনিস হদিস দিতে পারল না। সবাই ভাবল লোকটার মাথা খারাপ।

ট্রং কুমার মহা ভাবনায় পড়ে গেল। নারাণ মশায় বলেছেন,আহাঃ উহুঃ নিয়ে যেতে না পারলে মাইনে দেবে না। পথে বসে কান্না জুড়িয়ে দিল ট্রং কুমার। এমন সময় ঐ পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল চতুর্দশ দেব মন্দিরের [৩]চোন্তাই। পূজা শেষে বাড়িতে ফিরছিল। ট্রং কুমারকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করল – কি হে মানুষ, তুমি রাস্তার উপর বসে কাঁদছ কেন ? ট্রং কুমার কী আর করবে। তার দুঃখের কথা চোন্তাই মশায়কে খুলে বলল।

চোন্তাই মশায় নারাণের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে জানত। বললে তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি তোমাকে কিছুক্ষণের মধ্যে আহাঃ উহুঃ যোগাড় করে দিচ্ছি। এ বলে কুমারের দোকানে গিয়ে এক পয়সা দিয়ে একটা বড়সড় মাটির হাঁড়ি কিনে আনল। দেখে ট্রং কুমার বললে,চোন্তাই মশায় মাটির হাঁড়ি দিয়ে হবে।

চোন্তাই বললে,আরে বাপু দেখ না আমি কি কাজ করছি। এই মাটির হাঁড়িতে আহাঃ উহু ধরে পুরতে হবে। চল আমার সঙ্গে এই বলে চোন্তাই মশায় ট্রং কুমারকে টেনে নিয়ে গেল চতুর্দশ দেব মন্দিরের তপোবনে। সে বনে রয়েছে চাক চাক ঝাঁকে ঝাঁক ভীমরুল পোকার বাসা। চোন্তাই মশায় খুব সাবধানে ভীমরুল পোকা ধরে হাঁড়ি ভরিয়ে ফেলল। তারপর হাঁড়ির মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে ট্রং কুমারকে দিয়ে বলল,যা বেটা এটা নিয়ে যা। তোর নারাণকে গিয়ে বলবি হাঁড়ির ভেতর আহা : উহুঃ আছে।

চোন্তাই মশায়ের কথামত ট্রং কুমার মাটির হাঁড়ি নিয়ে নারাণের কাছে গিয়ে হাজির হল। নারাণ তখন তার বন্ধুদের নিয়ে মদ খাচ্ছিল। ট্রং কুমারকে দেখে সবার কৌতূহল হল। নারাণ বললে, দেখি। কেমন আহাঃ উহুঃ এনেছ, এ বলে হাঁড়ির মুখ খুলে ফেলল।

আর যায় কোথায়। হাঁড়ির মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক ভীমরুল পোকা উড়ে গিয়ে নারাণের আর তার সঙ্গীদের চোখে মুখে বসে হুল ফুটিয়ে দিল। সবাই যন্ত্রণায় আহাঃ উহুঃ করে উঠল।

নারাণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ট্রং কুমার এ তুই কী এনেছিস হারামজাদা। ট্রং কুমার বললে, কর্তা আপনি না বলেছিলেন শহর থেকে এক রাংয়ের আহাঃ উহুঃ কিনে নিয়ে আসতে। আমি তাই নিয়ে এসেছি কর্তা। আমার কী দোষ।

ধূর্ত নারাণ মশায় কী আর করবে। ভীমরুল পোকার কামড়ের জ্বালায় ছট্‌ফট করতে করতে তিন মাসের মাইনা দিয়ে ট্রং কুমারকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।

পাদটীকা

০১। নারাণ : আঞ্চলিক শাসনকর্তা। পদবি বিশেষ।

২। আড়ি : পরিমাপ যন্ত্র। ১০ কেজিতে এক আড়ি হয়।

৩। চোন্তাই : পুরোহিত।

পাঁজী শেয়ালের শাস্তি

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। ত্রিপুরা মহারাজা সেতু দেবের রাজত্বকাল। সে সময় মানুষ ও পশুপাখি একে অন্যের ভাষা বুঝতো। সুখ দুঃখের ভাব বিনিময় হতো। আপদে বিপদে একে অন্যের সাহায্য সহযোগিতা করতো। সে সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র ঘেষে এক বিশাল লোকালয় ছিলো। আর এ লোকালয়ের ঝোঁপ জঙ্গলে বাস করতো এক পাঁজী শেয়াল। শেয়ালটা সবাইকে ঠকিয়ে মজা করতো। সবাই তার অত্যাচারে খুব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেউ কিছু তাকে বলতে পারতো না। কারণ শেয়াল তো আর কাউকে জোর করে ঠকায় না। যারা বোকা, যারা হাবা তারাই শেয়ালের চাতুরীতে ঠকে।

একদিন পাঁজী শেয়াল ঘুম থেকে জেগে দেখতে পেলো তার গুহার মুখে কতগুলো ভোমর উড়ে বেড়াচ্ছে। এতে সে খুব বিরক্তিবোধ করলো। সে খপ্ করে একটা ভোঁমর ধরে ফেললো। তারপর একটি বাঁশের চোঙ্গা সংগ্রহ করে তাতে পুরে বন্দী করে রাখলো। শেয়াল ভাবলো,ভোঁমরা দিয়ে মানুষকে জব্দ করতে পারলে বেশ মজা করা যাবে। এই ভেবে পাঁজী শেয়াল বাঁশের চোঙ্গাটি হাতে করে মানুষের লোকালয়ে এসে এক গৃহস্থের বাড়ির উঠোনে এসে হাঁক দিল। সে বাড়িতে থাকতো এক কালো বুড়ি। গায়ের রং কালো কুচকুচে বলে সবাই তাকে কালো বুড়ি বলে ডাকতো। শেয়াল কালো বুড়িকে দেখে একটা লম্বা সালাম দিলো। তারপর খুব বিনয়ের সাথে বললো, কালো বুড়ি, আমার একটু হাটে যেতে হচ্ছে। আমার তো কেউ নেই। এই বাঁশের চোঙ্গাটা তোমার এখানে একটু রেখে যেতে চাই।

কালো বুড়ি বললে,বেশ তো রেখে যাও।

শেয়াল বললে,ধন্যবাদ কালো বুড়ি। শুধু রেখে গেলে তো হবে না। আমার এ চোঙ্গাটায় দাদুর আমলের মূল্যবান জিনিস আছে। তুমি আবার ওটা ধরো না। একটু যত্ন করে রেখে দিও।

কালো বুড়ি বললে,আচ্ছা, আচ্ছা, ধরবো না।
পাঁজী শেয়াল মুচকী হেসে,একটা লম্বা হাই তুলে গুন্‌গুনিয়ে গান গাইতে গাইতে হাটে চলে গেলো।
শেয়াল চলে যাবার পর কালো বুড়ি ভাবলে, শেয়ালের চোঙ্গায় না জানি কী দামী জিনিস আছে। একটু দেখে নিলে মন্দ হয় না। এই ভেবে চোঙ্গার মুখ খুলতে গেল। অমনি ভোঁমরটা ভোঁ করে উড়ে গেলো। কালো বুড়ি অনেক চেষ্টা করলো ভোঁমরটাকে ধরতে কিন্তু পারলো না।
তিনদিন পর পাঁজি শেয়াল হাট থেকে ফিরে এলো। কালো বুড়ির কাছ থেকে তার বাঁশের চোঙ্গাটা চেয়ে নিলো। তারপর চোঙ্গার মুখ খুলে দেখলো ভোঁমরটা নেই। শেয়াল চিৎকার করে বললে,ও কালো বুড়ি, আমার চোঙ্গা খালি কেন ? আমার জিনিস কোথায় ?
পাঁজী শেয়ালের রাগ দেখে কালো বুড়ি থতমত খেয়ে বললে,ও নাতিরে আমার, লক্ষী সোনা, আমার কোনো দোষ নেই। আমি একটু দেখতে চেয়েছিলুম। অমনি ভোঁমরাটা ভোঁ করে উড়ে গেলো। এতে আমি খুব দুঃখিত। পাঁজি শেয়াল দেখলো কালো বুড়ীর একটা মোরগ উঠোনে চরে বাগ দিচ্ছে। শেয়াল বললে, বেশ ভালো কথা। তুমি যখন আমার ভোঁমরটাকে ছেড়ে দিয়েছো, আমি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তোমার মোরগটাকে নিয়ে চললাম। এই বলে পাঁজী শেয়াল কালো বুড়ীর মোরগটাকে ধরে একটা চটের থলিতে পুরে কাঁধে করে হন্ হন্ করে চলে গেলো। কালো বুড়ি অনেক কাকুতি,মিনতি করলো শেয়াল তা কিছুতেই শুনলো না।
হন্ হন্ করে হাঁটতে হাঁটতে পাঁজী শেয়াল আরেক বুড়ির বাড়ির উঠোনে এসে হাক দিলো। ঘরে কেউ আছো নাকি ? এ বাড়িতে থাকতো লাল বুড়ি। গায়ের রং লাল টুকটুকে বলে পাড়ার লোকেরা তাকে লাল বুড়ি বলে ডাকতো।
পাঁজী শেয়াল লাল বুড়িকে দেখে পুলিশের কায়দায় একটা সালাম দিলো। তারপর বললে,লাল বুড়ি আমি একটু হাটে যাবো। আমার চটের থলিটা তোমার ওখানে একটু রেখে যেতে চাই। তবে সাবধান।
থলের মুখটা খুলো না কিন্তু। ওতে আমার মাতৃবংশের মূল্যবান জিনিস আছে।
লাল বুড়ি বললে,বেশ তো রেখে যাও।
পাঁজী শেয়াল চলে যাবার পর লাল বুড়ির কৌতূহল হলো থলেটি খুলে

দেখার। কী এমন দামী জিনিস আছে ওটাতে। এ বলে থলের মুখটা খুলতেই ফুড়ুৎ করে মোরগটা এক লাফে বেরিয়ে গেলো। লালবুড়ি অনেক চেষ্টা করলো মোরগটাকে ধরতে কিন্তু পারলো না। লালবুড়ি হায় হায় করতে লাগলো। এখন কী করি। শেয়াল এলে কী জবাব দিই,'ও বেটা যা পাঁজী 'ও বেটা যা চতুর' বলে বিলাপ করতে লাগলো।

দু'দিন পর পাঁজী শেয়াল হাট থেকে ফিরে এলো লাল বুড়ির কাছ থেকে তার থলেটা চেয়ে নিলো কিন্তু হাতে নিয়েই বুঝতে পারলো মোরগটা নেই। বললে,লালবুড়ি আমার মোরগটা কই ? লাল বুড়ি ভয়ে ভয়ে বললে,যাদু আমার, চাঁদ আমার, মোরগটা বেরিয়ে গেছে। আমার কোনো দোষ নেই। থলের মুখটা খুলতেই মোরগটা বেরিয়ে পালিয়ে গেলো। অনেক চেষ্টা করেছি ধরতে কিন্তু পারলাম না।

পাঁজী শেয়াল দেখলো-বুড়ির ছাগল ছানাটি এক চিলতে উঠোনে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে। বলে – বেশ তো। তুমি আমার মোরগটা ছেড়ে দিয়েছো, এখন আমি তার বদলে তোমার ছাগল ছানাটি নিয়ে নিলাম। এ বলে শেয়াল বেটা লাল বুড়ির ছাগল ছানাটাকে ধরে বস্তায় পুরে নিয়ে গেলো। লাল বুড়ী অনেক অণুনয় বিণুনয় করে দেখলো, না শেয়াল বেটা কিছুতেই শুনলো না।

হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে পাঁজী শেয়াল এবার আরেক বুড়ির সামনে এসে থামলো। এই বুড়ির গায়ের রং ছিল সাদা। একেবারেই ধবধবে সাদা। এজন্যে গাঁয়ের লোক তাকে সাদা বুড়ি বলে ডাকতো।

শেয়াল বেটা সাদা বুড়িকে সামরিক কায়দায় সালাম ঠুকে বললে – সাদা বুড়ি, আমি হাঁটে যেতে এসেছি। আমার এই বস্তাটা তোমার এখানে রেখে যেতে চাই! সাদা বুড়ি বললে,বেশ তো, রেখে যাও। শেয়াল বেটা বললে, রেখে তো যাবোই। তা তোমাকে একটু দেখে শুনে রাখতে হবে। এ বস্তায় আমার পূর্বপুরুষদের মূল্যবান সম্পত্তি আছে। সাদা বুড়ি বললে, আচ্ছা বাবা সেভাবে যত্নআত্তি করেই রাখবো।

শেয়াল চলে যেতেই সাদা বুড়ি ভাবলে,না জানি কী সম্পত্তি ওটাতে। বস্তাটা খুলে দেখি। এ বলে বস্তাটার মুখ খুলতেই ছাগল ছানাটা বেরিয়ে পড়লো। সাদা বুড়ি যেই ধরতে যাবে অমনি তিড়িং বিড়িং করে পালিয়ে গেলো। সাদা বুড়ি কিছুতেই ধরতে পারলো না।

একদিনের মাথায় শেয়াল বেটা ফিরে এলো। তারপর তার বস্তাটা সাদা

বুড়ির কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দেখলো ছাগল ছানাটি নেই। সাদা বুড়ি বললে,মানিক আমার, আমি শুধু বস্তাটায় কী আছে দেখতে চেয়েছিলাম, অমনি ছাগলছানাটি বেরিয়ে গেলো। আমার কোনো দোষ নেই। তুমি আমাকে মাফ করে দিও।

সাদা বুড়ির ছিলো এক নাতি। সে একটু দূরে ঘিলা খেলা খেলছিলো। আর যায় কোথায় ? পাঁজী শেয়াল বললে,বেশ বলেছো তুমি। আমার ছাগল ছানাটি ছেড়ে দিয়েছো। তার বদলে আমি তোমার নাতিকে ধরে নিয়ে গেলাম। এ বলে নাতিকে ধরে বস্তায় পুরে কাঁধে করে নিয়ে গেলো পাঁজী শেয়াল। সাদা বুড়ি অনেক কান্নাকাটি করলো,শেয়াল বেটা কিছুতেই শুনলো না।

পাঁজী শেয়াল হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে রাজ্যের উত্তর সীমানায় এসে এক গৃহস্থের বাড়ির উঠোনে এসে থামলো। সে বাড়িতে থাকতো এক কুঁজো বুড়ি। তার ছিলো অনেক নাতি। নাতিদের জন্যে কুঁজো বুড়ি বেশ করে পাকা কলার পিঠা বানাচ্ছিলো। কুঁজো বুড়িকে দেখে শেয়াল বেটা রাজকীয় সালাম টুকিয়ে বললে,কুঁজোবুড়ি একটু হাট থেকে ঘুরে আসি। আমার বস্তাটা তোমার এখানে একটু রেখে যেতে চাই। কাউকে তো তেমন বিশ্বাস করা যায় না। এ বস্তাটায় আমার সারাজীবনে উপার্জিত মূল্যবান সম্পত্তি আছে। একটু সাবধানে রেখো।

শেয়াল বেটা চলে যেতেই কুঁজো বুড়ি পিঠা বানাতে মনযোগ দিল। নাতিরা কে কোন পিটা খাবে এ নিয়ে বাগড়া জুড়ে দিচ্ছিল। পিঠার সুঘ্রাণ বস্তাবন্দী সাদাবুড়ির নাতির নাকেও গেলো। পিঠার গন্ধে তারও প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়ে বসলো। সে বস্তার ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠলো দাদী ও দাদী আমিও পিঠা খাবো। আমারও খুব ক্ষিধা পেয়েছে।

বস্তার ভেতর থেকে মানুষের বাচ্চার কথার আওয়াজ পেয়ে কুঁজো বুড়ি ও তার নাতিরা বস্তা খুলে দেখে সেখানে একজন বাচ্চা ছেলে। সেও পিঠা খেতে চায়। খুব মজার ব্যাপার তো। বাচ্চা ছেলেটার কাছ থেকে কুঁজো বুড়ি ও তার নাতিরা পাঁজী শেয়ালের চাতুরী বুঝতে পারলো। বাচ্চা ছেলেটি বললে,শেয়াল বেটা তাকে মেরে ফেলবে। খেয়ে ফেলবে, সে তার দাদী সাদা বুড়ির কাছে যেতে চায়। কুঁজো বুড়ি সান্ত্বনা দিয়ে বললে,তোমার আর ভয় নেই। পাঁজী শেয়ালকে খুব করে জব্দ করার ব্যবস্থা এখুনি করছি। মানুষকে ঠকিয়ে মজা করার শখ আজ দেখাচ্ছি। এ বলে কুঁজো

বুড়ি তার শিকারী কুকুরটাকে বস্তায় ভরে মুখ বেঁধে রেখে দিলো।
কিছুক্ষণ পর শেয়াল বেটা তাইরে নাইরে করতে করতে কুঁজো বুড়ির উঠোনে এসে হাজির হলো। শেয়াল বেটাকে দেখে কুঁজো বুড়ি বললে,এই যে শেয়াল ভাইয়া, তোমার বস্তা খুব যত্ন আত্তি করে রেখে দিয়েছি। নিয়ে যাও। শেয়াল বেটা দেখলো, না তার বস্তার জিনিস ঠিকই আছে। খোয়া যায়নি। কুঁজো বুড়ীকে একটা সালাম দিয়ে বস্তা কাঁধে নিয়ে চলে গেলো। যেতে যেতে শেয়াল বেটা ভাবলো মানুষকে অনেক জ্বালাতন করেছি। ক্ষুধাও অনেক পেয়েছে। এবার মানুষের বাচ্চার মাংস খেয়ে শান্তি লাভ করি। এই ভেবে শেয়াল বেটা এক নির্জন বনে সরোবরের ধারে গিয়ে কাঁধ থেকে বস্তাটা নামালো। গায়ের ধুলোবালি ঝেড়ে আরাম করে গাছের ছায়ায় বসলো। মনের আনন্দে কিছুক্ষণ গান গেয়ে নিলো। ক্ষিধে যখন আরো বাড়লো তখন বস্তার মুখ খুলে যেই কামড় বসাতে যাবে অমনি বেরিয়ে এলো এক শিকারী কুকুর। শেয়াল বেটা পালাবার আগেই কুকুরটা খুব জোরে কামড় বসিয়ে ঘাড় মটকে দিলো। পাঁজী শেয়াল,কুকুরটাকে বাপ ডাকলো, দাদু ডাকলো, মামা ডাকলো, মাফ চাইলো, কিন্তু কুকুর তার কথা শুনবে কেন ? কুকুরের প্রচণ্ড কামড় ও ঝাঁকুনি খেয়ে শেষে পাঁজী শেয়াল অক্কা পেলো।
পিঠা খাওয়ার পর কুঁজো বুড়ী ও তার নাতিরা সাদাবুড়ির নাতিকে তার দাদী কাছে পৌঁছে দিলো। এভাবে পাঁজী শেয়ালের অত্যাচার থেকে মানুষ রক্ষা পেলো এবং এইসাথে আমার কথাটিও ফুরোলো।

ওয়াক্‌সা রাজা

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। তখন মানুষ পশু-পাখি, জীবজন্তু ও গাছ পালার মধ্যে ভাষা বিনিময় হতো। একে অপরের ভাষা বুঝতে পারতো। সেই যুগে ত্রিপুরা রাজ্যে এক পরাক্রমশালী রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া আর শত সহস্র সৈন্য সামন্ত থাকতো। রাজ্যে ধন-দৌলতের অভাব ছিলো না। প্রজারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতো। তাঁর প্রতাপে বাঘে ছাগলে একঘাটে পানি পান করতো, একই সাথে পাহাড়ে, জঙ্গলে বিচরণ করতো। তবে সে রাজার নাম কি ছিলো, সে কথা কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করো না। আমি তা বলতে পারবো না। তবে হ্যাঁ রাজা যে ছিলেন এবং প্রবল প্রতাপে রাজত্ব যে করতেন তা ভালো করেই সবাই জানে।

সেই ত্রিপুরা রাজার রাজত্বকালে তার রাজ্যে এক বিধবা বাস করতো। সংসারে তার কেউ ছিলো না। স্বামী জুম কাটতে গিয়ে মস্তবড় এক বাঘের সাথে লড়াই করে মারা গিয়েছিলো। তবে বাঘ যে রেহাই পেয়েছিলো তা নয়। বাঘও অক্কা পেয়েছিলো। ত্রিপুরারা বিধবা মহিলাকে রাঁধীচুকমা বলে। কাজেই তার নাম হয়েছিলো রাঁধীচুকমা। রাঁধীচুকমা সারাদিন মানুষের বাড়িতে কাজ করতো। এতে তার কোন রকমে জীবন চলতো। মনের দুঃখ তার কোন দিন ছিলো না।

কিন্তু ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন। এক সময় রাঁধীচুকমার সারা অঙ্গে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ দেখা গেলো। পাড়াপড়শীরা যখন জানতে পারলো তখন তার অবস্থা অত্যন্ত করুণ। কুষ্ঠরোগ নাকি সংক্রামক ব্যাধি। তাই সবাই মিলে তাকে রাজ্যের শেষ প্রান্তে একটি মাচা ঘর তুলে সেখানে থাকতে দিলো। কি আর করবে রাঁধীচুকমা। কপাল দোষে মাচাঘরে বাস করতো হোলো। বন-জঙ্গলের গাছের ফল, বন্য কলা, লতাপাতা খেয়ে জীবন বাঁচাতো সে। কেউ তার খোঁজ খবর নিতো না। কিন্তু সে ছিলো অত্যন্ত ভালো মহিলা। কারো জুমে বানরের পাল এসে পড়লে সে তাড়িয়ে দিতো

কিংবা কারো ক্ষেতে পঙ্গপালের আক্রমণ দেখা দিলে সে ঔষধ ছিটিয়ে দিতো। এতে কেউ তার প্রতি করুণাবশতঃ এক টুকরা পরনের কাপড় দিতো,কেউ বা কিছু খাবার জিনিস এনে দিতো।

একদিন রাঁধীচুকমা জঙ্গলে গেলো ফল মূল সংগ্রহের জন্য। যেতে যেতে একেবারে অঘোর জঙ্গলে। অনেক হেঁটে আসায় তার তীব্র পানি পিপাসা পেলো। চারিদিকে খুঁজে দেখলো কোথাও এক ফোঁটা পানি নেই। তখন ছিলো গ্রীস্মকাল। প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে ছড়া ঝর্না শুকিয়ে গেছে। হন্যে হয়ে পানি খুঁজতে খুঁজতে সে এক জলাধারে কিছু পানি দেখতে পেলো। পানি ছিলো খুবই নোংরা। পিপাসায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কোন রকম চিন্ত ভাবনা না করেই সে সব পানিটুকু এক নিঃশ্বাসে পান করলো। পানি পান করার পর হঠাৎ তার তলপেটে বেদনা শুরু হলো। একেই তো অঘোর জঙ্গল তার উপর সঙ্গী সাথী কেউ ছিলো না। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে সেখানে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে এক গৈরিক বেশধারী মানুষ তাকে বলছে,'তুমি ভয় পেয়ো না। অচিরেই তোমার দুঃখ ঘুচবে। তোমার একটি রাজপুত্র সন্তান হবে।" ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে অনুভব করলো তলপেটে আর ব্যাথা নেই। স্বপ্নের কথা চিন্তা করতে করতে সে তার মাচা ঘরে ফিরে এলো। এদিকে হলো কি, সত্যি সত্যি দিন দিন তার তলপেট ভারী হতে লাগলো। রাজ্যের লোকেরা জানতে পারলো যে রাঁধীচুকমা গর্ভবর্তী হয়েছে। স্বামী তো নেই। কি করে সে গর্ভবর্তী হলো ? সবাই ছি:ছি; করতে লাগলো। অদৃষ্টের কথা চিন্তা কর রাঁধীচুকমাকে সব সহ্য করতে হলো।

দিন যায়, মাস যায়, রাঁধীচুক্‌মা একটি সন্তান প্রসব করলো। কিন্তু এ কি। এতো মানব সন্তান নয়। এ যে ওয়াকসা (শুকর ছানা)। লজ্জায়, অপমানে, রাঁধীচুকমা মাচা ঘর থেকে আর বের হয় না। যা হোক- নিজের পেটের সন্তান। তাই সে ওয়াকসাকে লালনে পালন করে বড় করলো।

ক্রমে ওয়াকসার বয়স আঠারো বছর হলো। সে দেখলো তার মা অজান্তে নীরবে কি যেন বলে আর কাঁদে। একদিন কারণ জিজ্ঞেস করেও কোন জবাব না পেয়ে ওয়াকসা ভাবলো, নিশ্চয় অভাব অনটনের জন্যে তার মা কাঁদে। তাই সে সিদ্ধান্ত নিলো এবার সে জুম চাষ করবে। ফসল-ফলাবে-তার মায়ের দুঃখ ঘুচাবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সে মাকে গিয়ে বললো,'মা,এ বছর আমি জুমচাষ করবো। জুম কাটার জন্যে আমাকে

একটি দা এনে দাও।" ওয়াক্‌সার কথা শুনে রাঁধীচুকমার দুঃখের মাঝেও হাসি পেলো। মানুষের মতো হাত পা নেই কি করে সে জুম চাষ করবে। ওয়াকসাকে অনেক বুঝালো কিন্তু ওয়াকসা নাছোড়বান্দা। সে জুম চাষ করবেই এবং তার জন্য প্রয়োজন শুধু একটি দা। শেষে পীড়াপীড়ি সহ্য করতে না পেরে রাঁধীচুকমাকে রাজপ্রাসাদে গিয়ে হাজির হতে হলো। পরাক্রমশালী ত্রিপুরা রাজা তার সভাসদ নিয়ে রাজ মহলে কি একটা জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনারত, এমন সময় রাঁধীচুকমাকে দুই জন প্রহরী রাজার কাছে নিয়ে এলো। রাজা গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,'তোমার কি চাই ?" রাঁধীচুকমা প্রণাম করে আরজী পেশ করলো,'মহারাজ মা-বাপ। আমার সন্তান ওয়াকসা এ বছর জুম চাষ করবে। আমার তো কিছু নেই। তাই জুম কাটার জন্য একটি পুরানো দা প্রার্থনা করছি।" ওয়াকসা জুম চাষ করবে শুনে রাজা-পাত্র মিত্র সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসলেন না শুধু বুড়োমন্ত্রী। রাজা বললেন,যাও। যতসব অনাসৃষ্টির কথা আমাকে শোনাইও না। প্রহরী,এ মহিলাকে রাজ প্রাসাদ থেকে বের করে দাও।' বুড়ো মন্ত্রী আর থাকতে পারলেন না। হাতজোড় করে বললেন, 'মহারাজ আপনার তো কোন কিছুর অভাব নেই। রাঁধীচুকমা একটি দা চেয়েছে মাত্র। কতো পুরানো দা পড়ে আছে রাজ প্রাসাদে। তার থেকে একটি দিলে ক্ষতি কি এমন।' রাজা বললেন,ঠিক আছে তাকে একটি পুরানো দা দিয়ে বিদায় করে দাও।'

একটি পুরনো দা পেয়ে ওয়াকসা সাত দিন-সাত রাত শুধু শান দিতে থাকলো। এমন ধারাল হলো একটি মাছি বসলেও দুই টুকরো হয়ে যায়। তারপর লেগে গেলো জুম কাটতে।

একদিনেই সাতটি পাহাড় কেটে ফেললো। হৃষ্ট মনে ওয়াকসা মাচা ঘরে ফিরে এসে মাকে বললো,মা সাতটি পাহাড় কেটে এসেছি। মা কিন্তু বিশ্বাস করলো না। ঠিক হলো পরদিন সকালে ওয়াকসার কাটা জুম দেখে আসবে। পরদিন সকালে ওয়াকসাকে নিয়ে রাঁধীচুকমা গিয়ে দেখলো জুম কাটা টাটার কোন চিহ্ন নেই। শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। ওয়াকসাও এ অবস্থা দেখে একেবারে 'থ' বনে গেলো। পরদিন আবার সাতটি পাহাড় কেটে ওয়াকসা ঝোঁপের আড়ালে চুপ করে বসে রইলো রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় সে শুনতে পেলো কে যেন এক বুড়াসা (বন দেবতা) বলে উঠলো,তোমরা সবাই উঠে দাঁড়াও। সঙ্গে সঙ্গে কাটা জঙ্গল

হুঁ হুঁ করে উঠে দাঁড়ালো। আর যায় কোথায়। এক লাফে ওয়াকসা বুড়াসার সামনে হাজির হলো। দা উচিয়ে চিৎকার করে বলল,আমার সাতটি পাহাড়ের কাটা জঙ্গল আগের মতো করে দাও। নইলে এক কোপে যমের বাড়িতে পাঠাবো। অবস্থা বেগতিক দেখে বুড়াসা আবার বলে উঠলো,তোমরা আগের মতো কাটা জঙ্গল হয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে সাতটি পাহাড় কাটা জঙ্গলে পরিণত হয়ে গেলো। সেই দিন থেকে বুড়াসা আর ওয়াকসাকে বিরক্ত করে না।

ত্রিপুরীদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব 'বৈসু' আসার আগে রাজ্যে সবাই জুম পোড়াবে। ওয়াক্সাও জুম পোড়াবে। তাই মাকে বললো,মা তুমি রাজাকে জানিয়ে দাও,আমি আগামীকাল জুম পোড়াবো। রাজার হাতী-ঘোড়া যেন বে- খেয়ালে আমার জুম এলাকায় না যায়। রাঁধীচুকমা রাজ প্রাসাদে গিয়ে সবিনয়ে রাজাকে ওয়াকসার জুম এলাকায় হাতী ঘোড়া না পাঠাতে অনুরোধ করলো। এ কথা শুনে রাজা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন,যাও। যাও। তোমার ওয়াকসা কতোখানি জুম পোড়াবে তা আমার জানা আছে। এখন বেরিয়ে যাও।

পরদিন অন্যান্যদের মতো ওয়াকসা প্রচণ্ড রৌদ্রে দিনদুপুরে সাতটি কাটা পাহাড়ে আগুন ধরিয়ে দিলো। চারিদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। রাজার হাতী-ঘোড়া সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। খবর পেয়ে রাজা সিপাহীদের হুকুম করলেন,যাও ওয়াকসাকে ধরে শুলে চড়াও।" বুড়ামন্ত্রী হাতজোড় করে বললেন,মহারাজ। ওয়াকসার কোন দোষ নেই। সে পূর্বাহ্নে আপনাকে জানিয়েছে। তাকে শুলে চড়ালে আইনের বরখেলাপ করা হবে। রাগে অপমানে রাজা জ্বলতে লাগলেন।

ওয়াকসার জুম পোড়া শেষ হয়েছে। বৈশাখী ঝড়ে মাটি নরম হয়েছে। এখন বীজ বপন করা দরকার। কিন্তু সাতটি পাহাড়ে বীজ বপন করার মতো বীজ ধান কোথায় পাবে সে ? মাকে বললো,মা তুমি আমাকে যেমন করেই হোক সাতটি বীজ ধান এনে দাও। রাঁধীচুকমা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সাতটি বীজধান সংগ্রহ করে ওয়াকসাকে এনে দিলো। ওয়াকসা সাতটি পাহাড়ে সাতটি বীজ বপন করে দিলো। কিছুদিন পর দেখা গেলো অলৌকিকভাবে সাতটি পাহাড় সবুজ ধানে ছেয়ে গেছে।

ওয়াকসা ভোর বেলায় জুমে গিয়ে কাজ করে আর সন্ধ্যায় মাচা ঘরে ফিরে আসে।

একদিন ওয়াকসা ত্রিপুরী সুরে গান গেয়ে জুম থেকে মাচা ঘরে ফিরছিলো।

আর এদিকে রাজকন্যা সখীদের নিয়ে বাগানে খেলতে খেলতে ওয়াকসার গান শুনতে পেলো। কে গান গায় দেখার জন্য রাজকন্যা বাগানে লুকিয়ে দেখলো। তাজ্জব ব্যাপার। গায়ক মানুষ নয়। ওয়াকসা। রাজকন্যা কৌতূহলী হয়ে ওয়াকসাকে অনুসরণ করলো। তখন হয়েছে কি ওয়াকসা হঠাৎ গান বন্ধ করে একটি ঝর্নায় নামলো স্নান করতে। চারদিকে একবার ভালো করে দেখে নিলো কোথাও কেউ আছে কিনা। না কেউ নেই। তারপর সে তার দেহ আবরণ খুলে ফেলো। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো এক সুন্দর সুঠাম যুবক। রূপের আলোয় ঝর্নার পানি ঝলমল করছে। দেখে রাজকন্যার মুখে টু শব্দটি নেই। এমন সুন্দর যুবক সে তার ষোল বছর বয়সে কখনও দেখেনি। নয়নভরে সে ওয়াকসার রূপ দেখে নিলো। ওয়াকসাকে একান্ত আপন করে পাবার জন্যে রাজকন্যা এক ফন্দি করলো। রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজকন্যা কঠিন অসুখে পড়লো। পেটের ব্যাথায় ছটফট করতে লাগলো। খবর পেয়ে রাজা পাত্র-মিত্র সহ অন্দর মহলে গেলেন। ডাক্তার, কবিরাজ, হেকিম, বৈদ্য ডাকা হলো কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সবার মুখে এক কথা কঠিন রোগ। কিন্তু কি রোগ তা কেউ বলতে পারে না। রানী খাওয়া দাওয়া ভুলে রাজকন্যার শিয়রে বসে চোখের পানি ফেলতে লাগলেন। আরোগ্যের লক্ষণ দেখতে না পেয়ে রাজা সভাসদবর্গের সাথে সলা পরামর্শ করে রাজ্যে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করলেন। যে ব্যক্তি রাজকন্যার কঠিন রোগ সারাতে পারবে তাকে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজ্য দেয়া হবে। ঘোষণা শুনে রাজ্যের লোক একে একে এসে রাজকন্যাকে চিকিৎসা করতে লাগলো। কতো তন্ত্র-মন্ত্র করা হলো কিন্তু সবই বৃথা গেলো। সবাই রাজার কাছে অপারগতার কথা জানিয়ে বিদায় নিলো। রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন। কে তার একমাত্র সন্তানকে বাঁচাবে। কোন কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না,এমন সময় রাজ কন্যার সখী রাজাকে গিয়ে বললো,মহারাজ রাজ্যের সব লোক তো রাজকন্যাকে চিকিৎসা করেছে কিছুই তো হয়নি। এখন বাকী আছে শুধু ওয়াক্সা। আপনি অনুমতি দিলে তাকে ডেকে আনতে পারি। রাজা ভেবে চিন্তে বললেন,ঠিক আছে নিয়ে আয়। ওয়াকসাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আনা হলো। রাজকন্যার রোগের বর্ণনা দেয়া হলো। শুনে ওয়াকসা বললো,ঠিক আছে আমি রাজকন্যাকে ভালো করতে চেষ্টা করবো। তবে আপনারা কেউ রাজকন্যার ঘরে থাকতে পারবেন না। কি আর করা সবাই রাজকন্যার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

(এখানে বলে রাখা ভালো যে, ওয়াকসাকে আনতে গিয়ে রাজকন্যার সখী পথে ওয়াকসাকে আদ্যোপান্ত সব বলেছিলো)। কিছুক্ষণ মিছামিছি তন্ত্র-মন্ত্র করার পর ওয়াকসা সবাইকে জানিয়ে দিলো যে রাজকন্যা ভালো হয়েছে। আরোগ্যের খবর শুনে রাজা রাণী পাত্র-মিত্র সবাই আসলেন। রাজ প্রাসাদে আবার আনন্দের বাতাস বইলো। ওয়াকসা রাজার ঘোষণানুযায়ী রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজ্য দাবী করলো। এতে রাজার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তাঁর একমাত্র সন্তানকে কি করে ওয়াকসার হাতে তুলে দেয়া যায়। রাজা ঘোষণার কথা অস্বীকার করলেন এবং ওয়াকসাকে রাজ প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা ভুতলে। উপায়ান্তর না দেখে অনেক ভেবে চিন্তে শেষে কন্যাকে ওয়াকসার হাতে তুলে দেয়া হলো। ওয়াকসা রাজকন্যাকে মাচা ঘরে নিয়ে এলো। এ দিকে রাজকন্যা কিন্তু সুযোগ খুঁজছিলো কখন ওয়াকসা তার দেহের আবরণ খুলবে। গভীর রাত্রে রাজকন্যা ঘুমের ভান করে মাচা ঘরে শুয়ে পড়লো। রাজকন্যা ঘুমিয়েছে ভেবে ওয়াকসা আস্তে করে তার দেহ আবরণ খুলে ফেললো। তারপর মাচা ঘরের এক কোনায় রেখে রাজকন্যার এবং পাশে শুয়ে পড়লো। যেই ওয়াকসা ঘুমিয়েছে অমনি রাজকন্যা উঠে ওয়াকসার দেহ আবরণ আগুনে পুড়িয়ে ফেললো। ওয়াকসা যত হা-হুতাশ করে রাজকন্যা তত আনন্দে নেচে উঠে।

পরদিন রাজকন্যা ওয়াকসা রাজপ্রাসাদে হাজির হলো। তাদেরকে দেখে রাজা রাণী ও সভাসদবর্গের চোখ তো ছানাবড়া। একি সম্ভব। রাজকন্যা সবাইকে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন। রাজা রাণী ও সভাসদ আনন্দে আবার নতুন করে তাদের বিয়ে দিলেন। রাজা জামাই ওয়াকসার হাতে রাজ দণ্ড তুলে দিলেন। রাঁধীচুকমাকে স্বসম্মানে রাজ প্রাসাদে আনা হলো। রাঁধীচুকমার সন্তান ওয়াকসা রাজকন্যাকে বিয়ে করে সেই দেশের রাজা হয়ে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলেন।

ওয়াকসা কিন্তু আসলে ওয়াকসা ছিলো না সে ছিলো অভিশপ্ত এক রাজ কুমার।

জুয়াংফা

অনেক অনেক দিন আগের কথা। সে সময় মহারাজ ত্রিলোচন ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করতেন। ত্রিলোচন ছিলেন একজন অতিশয় প্রজা বৎসল মহারাজা। এই মহারাজার রাজত্বকালে রাজ্যে জুয়াংফা নামে এক লোকের আবির্ভাব ঘটেছিলো। জুয়াংফার নিবাস কোথায় ছিলো, সে কি করতো তা কেউ জানতো না। জুয়াংফাকে এক নামে সবাই চিনতো, সবাই তাকে দাদা বলে সম্বোধন করতো। সব মানুষের বয়স বেড়ে বৃদ্ধকাল হতো কিন্তু জুয়াংফার বয়স বাড়তো না বৃদ্ধও হতো না। জুয়াংফা ছিলো চির যৌবনের অধিকারী। কিন্তু তার চেহারা সুরত সুন্দর ছিলনা। গায়ের রং ছিলো কুচকচে কালো,নাক ছিলো বোঁচা, চোখ দু'টি ছোট ও তীক্ষ্ণ আর দাঁতগুলি ছিলো এ্যাবরো থ্যাবরো। দেখতে শুনতে ভালো না হলেও জুয়াংফার একটা বিশেষ গুণ ছিলো। সে ছিলো বেজায় পরোপকারী। মানুষের আপদে বিপদে, দুঃখদুর্গতির দিনে সে সাহায্য করতো। এ সবের কারণে মানুষ জুয়াংফাকে কদর করতো।

সেই জুয়াংফা একদিন গিয়ে পৌঁছলো দাংগুই নারাণের গ্রামে। গ্রামটি ছিলো বিশাল। গ্রামের মাথার উপর নীল আকাশের নীচে চিলের পাল উড়তো, মোরগের বাগে,মালা শুকরের ডাকে,পাখীর, কুঞ্জনে আর শিশুদের কাকলিতে গ্রামটি সর্বদা মুখরিত থাকতো। জুয়াংফা গ্রামের এ মাথা থেকে সে মাথা, উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘুরে ঘুরে দেখলো। দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে জুয়াংফা বসে পড়লো এক বটগাছের তলে।

দাংগুই নারাণের গ্রামে ছিলো সাত সুন্দরী যুবতী। এই সাত সুন্দরী যুবতীর অবকাশ যাপনের স্থান ছিলো সেই বটগাছ। তাদের নাম ছিলো মংগিনী, দাগিনী, যোগিনী, হাম্বারী, বাবারী, খাংগিনী আর ফেঁচিলী। জুয়াংফা এই সাত সুন্দরী যুবতীর অপরূপ রূপ দেখে মুগ্ধ হলো। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো সাত সুন্দরী যুবতীর মধ্যে সে যে কোন একজনকেই বিয়ে করবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। জুয়াংফা সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে সুন্দরীদের অভিবাদন জানালো। ইনিয়ে বিনিয়ে দু'চার কথা বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু সুন্দরীরা তাকে পাত্তাই দিলো না। তারা বটগাছের উপর চড়ে এ ডাল থেকে সে ডালে, লাফ মেরে গান গেয়ে শীষ দিয়ে

ফূর্তি করতে লাগলো। জুয়াংফাও ছিলো নাছোড়বান্দা, সেও সুন্দরীদের ক্রীড়া এক মনে দেখতে লাগলো। কিছুতেই সে স্থান ত্যাগ করলো না। সুন্দরীদের প্রধান ছিলো মংগিনী। জুয়াংফার বেহায়াপনা দেখে সে নীচে নেমে এসে গালি দিয়ে বললো, তুমি কেমন পুরুষ মানুষ, আমরা এখানে এসে আমোদ করছি আর তুমি নির্লজ্জ বেহায়া হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো। জীবনে বুঝি সুন্দরী যুবতী দেখোনি। মংগিনীর গালি খেয়ে জুয়াংফার সম্বিৎ হলো। সে মনের দুঃখে ও অপমানে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলো।

এখন হলো কি। কিছুদিন পর সুন্দরী যুবতীরা দল বেঁধে হাপিং বনে গেলো শাকসবজি তরিতরকারি তুলে আনতে। হাপিং বন মানে পরিত্যক্ত জুম ক্ষেত। সুন্দরী যুবতীরা কেউ শাকপাত তুলছে,কেউ লংকা ছিঁড়ছে, কেউ চিনার মারফা সন্ধান করছে, কেউ সীম-বরবটি তুলছে এমন সময়ে তারা দেখলো জুয়াংফা কোথা থেকে এসে তাদের আগে আগে শাকসবজি উঠিয়ে সাবাড় করছে। আর যায় কোথায়। জুয়াংফার এমন কাণ্ডকারখানা দেখে সাত সুন্দরী যুবতী দিল কুকুর লেলিয়ে। কুকুরের তাড়া খেয়ে জুয়াংফা হাউ মাউ করে জুম ক্ষেত থেকে পালিয়ে গিয়ে সে যাত্রা নিজের প্রাণকে বাঁচালো বটে, তবে সেও সুন্দরীদের শাসিয়ে গেলো সে এর প্রতিশোধ নেবে।

জুয়াংফাকে আচ্ছা করে তাড়িয়ে দিয়ে সুন্দরী সাত যুবতী – গান গেয়ে,শীষ দিয়ে হেলে দুলে জুম ক্ষেতে শাকপাত তুলতে থাকলো। তুলতে তুলতে তাদের বেতের ঝুড়ি ভরে গেলো।

তারাও অনেকটা ক্লান্ত ঘর্মাক্ত হলো। জুম ক্ষেতের পাহাড় শীর্ষে ছিলো একটা গাইরেং। গাইরেং মানে বাঁশ দিয়ে তৈরী উঁচু টং ঘর। আর পাহাড়ের নীচে ছিলো একটা গিরি সরোবর। যুবতীরা তাদের সংগৃহীত শাকসবজি তুলে রাখলো টং ঘরে। তারপর পাহাড়ের নীচে নেমে গেলো গিরি সরোবরে স্নান করতে। সরোবর ঘিরে বন বনানী। যুবতীরা তাদের পরনের কাপড় ডাঙায় খুলে রেখে স্নানে মেতে উঠতে থাকলো। এদিকে জুয়াংফা লুকিয়ে থেকে তাদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলো। জলকেলীতে সুন্দরী যুবতীরা যখন মশগুল হয়ে উঠলো ইত্যবসরে জুয়াংফা তাদের পরনের কাপড় উঠিয়ে নিয়ে টং ঘরে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইলো।

জলকেলী করতে করতে এক সময় যুবতীদের হুঁশ হলো আর স্নান নয়। এবার ঘরে ফেরা যাক। কিন্তু হায়, তাদের পরনের কাপড় কোথায়। পরনের কাপড় খুঁজে না পেয়ে তারা হায় হায় করতে লাগলো। কেউ লতাপাতা দিয়ে নিতম্ব ঢেকে কাপড় খুঁজতে লাগলো, কেউ দু'হাতে স্তন ঢেকে এদিক ওদিক দেখতে

লাগলো, কেউবা দিগম্বর দেহে কুলে উঠে তাদের পরনের কাপড় খুঁজতে লাগলো। কিন্তু না। কোথাও পরনের কাপড় খুঁজে পেলো না। এদিকে জুয়াংফা বেটা সুন্দরী যুবতীদের দিগম্বর দৃশ্য দেখে মহানন্দে শীস দিতে লাগলো। যুবতী প্রধান মংগিনী ছিলো অপেক্ষাকৃত চতুর। সে সরোবরের পানিতে অর্ধেক অঙ্গ রেখে সহচরীদের ডেকে বললো, তোমরা বৃথা খোঁজাখুঁজি করো না। আমার মনে হয় জুয়াংফাই আমাদের অগোচরে কাপড় চুরি করে নিয়ে গেছে। জুয়াংফাকে ডাকো। বেটা আমাদেরকে আচ্ছা করে অপমান করেছে। মংগিনীর কথামত যুবতী সকল জুয়াংফাকে মিষ্টি বাক্যে ডাকতে লাগলো। আর বলতে লাগলো। দাদু জুয়াংফা, তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো, আমরা যা শাকপাত তুলেছি সব তোমাকে দিয়ে দেবো। তোমাকে আমরা আর কখনও কটু কথা বলবো না। তোমাকে আমাদের প্রেম দেবো। দাদু জুয়াংফা আমাদের পরনের কাপড় ফিরিয়ে দাও। জুয়াংফা জুমের টং ঘর থেকে যুবতীদের আকুতি প্রাণ ভরে শুনলো। তারপর টং ঘর থেকে গলায় খাকড়ি দিয়ে জবাব দিলো।

সুন্দরী যুবতী সকল করহ স্মরণ
হাপিং ক্ষেত থেকে মোরে করিলে তাড়ন,
কুকুর লেলিয়ে মোরে দিলে অপমান
দিব না বস্ত্র খণ্ড তোমা সন্নিধান ॥

জুয়াংফার কথা শুনে যুবতীরা আরো কাতর আকুতি জানাতে থাকে, জুয়াংফা দাদু আমাদের ভুল হয়েছে, অপরাধ হয়েছে। আমরা ঘাট মেনেছি, মাফ চাইছি। আমাদের কাপড়গুলো ফিরিয়ে দাও। যুবতীদের আকুতি শুনে জুয়াংফা বললো, এক শর্তে আমি তোমাদের কাপড় ফিরিয়ে দিতে পারি। আমার শর্ত হলো, মংগিনী বাদে তোমরা ছয় সুন্দরী দিগম্বর অবস্থায় টংঘরের নীচে এসে একে একে নিজেদের কাপড় নিয়ে যাবে। সবার শেষে মংগিনীও দিগম্বর অবস্থায় এসে টং ঘরের সাতটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে নিজের পরিধেয় কাপড় নিয়ে যাবে। আমার এই শর্তে যদি রাজী হও তাহলে তোমরা কাপড় পাবে। আর যদি রাজী না হও তাহলে তোমরা দিগম্বর হয়ে বাড়ি ফিরে যাও। সুন্দরী যুবতীরা কি আর করবে। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে জুয়াংফার শর্তে রাজী হলো। আর ছয় সুন্দরী যুবতী একে একে দিগম্বর অবস্থায় টং ঘরে গিয়ে নিজের পরণের কাপড় নিয়ে এলো। সবার শেষে ছিলো যুবতী প্রধান মংগিনীর পালা। তার উপর শর্ত ছিলো দিগম্বর অবস্থায় টং ঘরের সাত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে তার নিজের কাপড় আনতে হবে।

মংগিনী লজ্জায়, রাগে, ক্ষোভে টং ঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। সিঁড়ির

এক ধাপ বেয়ে উঠতে মংগিনী বলে – দাদু জুয়াংফা সিঁড়ির একধাপ বেয়ে উঠেছি আমার কাপড়গুলো ফিরিয়ে দাও।

জুয়াংফা টং ঘরের ভেতর থেকে খিলখিলিয়ে হেসে জবাব দেয় আরো একধাপ বেয়ে উঠো।

মংগিনী বলে উঠে – এইতো আরো একধাপ বেয়ে উঠেছি।

জুয়াংফা বলে উঠে আরো একধাপ উঠো।

এভাবে এক ধাপ দুই ধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে মংগিনীকে সাতটি সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠতেই হলো। মংগিনী যেই সিঁড়ির সাতটি ধাপ বেয়ে উঠে টং ঘরে উঠলো অমনি জুয়াংফা তাকে ঝাপটে ধরে চুমু খেয়ে বললো, শোনো, ছয় সুন্দরী যুবতী। আমি মংগিনীকে আর ছাড়বো না। তাকে আমি গন্ধর্ব মতে বিয়ে করেছি। মংগিনী এখন আমার স্ত্রী। তোমরা গ্রামে গিয়ে আমাদের কথা বলো। জুয়াংফা মংগিনী সুন্দরীকে ছাড়লোই না। ছয় সুন্দরী কি আর করবে। কিছুক্ষণ টং ঘরের উপর ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে সহচরী মংগিনীকে ফেলে গ্রামে চলে গেলো।

যুবতীরা গ্রামে গিয়ে রটিয়ে দিলো মংগিনী জুয়াংফাকে বিয়ে করেছে আর তারা জুমের টং ঘরে বসবাস করছে। মংগিনীও কি আর করবে। জুয়াংফার ঘরনী হয়ে টং ঘরে জীবন কাটাতে লাগলো। মনের দুঃখে,ও অপমানে আর বাড়ি মুখো হলো না।

জুয়াংফার কাজ হলো রাজ্যময় ঘুরে বেড়ানো। মংগিনীকে বিয়ে করার পর সে হয়ে গেলো বউ পাগলা। জুয়াংফাকে এখন আর লোকালয়ে ঘুরতে তেমন দেখা যায় না। জুয়াংফাকে অনেকে ভুলেও গিয়েছিলো। ইত্যবসরে জুয়াংফার স্ত্রী মংগিনী দুই পুত্রের মা হলো। ছেলেদের নাম রাখা হয়েছিল ততেসা, আর বাতেসা। একদিন মংগিনী সুযোগ বুঝে জুয়াংফাকে বিস্তর গালি দিয়ে বায়না ধরলো, আমি অনেক দিন পর বাপের বাড়িতে যাবো বলে মন স্থির করেছি। আমার না আছে ভালো কাপড় চোপড় না আছে গহনাগাথি। তুমি কেমন পুরুষ মানুষ, বাপের বাড়ি যাবার মতো ব্যবস্থা করতে পারো না।

খুব তো বউ পাগলা বলে জাহির করো। বউ পাগলার নমুনা অনেক দেখেছি। এবার আমি আত্মহত্যা করবো।

জুয়াংফা দেখলো তাইতো। বিয়ের পর থেকে সে বউকে তেমন কিছু দেয়নি। জুয়াংফা মংগিনীর পায়ের কাছে বসে হাত জোড় করে বললো, বউ বড় অন্যায় হয়েছে। তোমাকে ভালোবাসতে গিয়ে ওদিকে খেয়াল করিনি। কাল আমি অবশ্যই হাটে যাবো আর তোমার যা যা দরকার সব কিনে নিয়ে আসবো।

জুয়াংফা পরের দিন খুব করে সেজে গুঁজে হাটে রওনা দিলো। এদিকে মংগিনীও দুইপুত্র ততেসা আর বাতেসাকে সঙ্গে নিয়ে টংঘর ফেলে রেখে বাপের বাড়িতে চলে গেলো। হাটে গিয়ে জুয়াংফা বউয়ের জন্য ভালো ভালো কাপড় রিনাই রীসা কিনলো, রূপোর চন্দ্রহার, রূপোর হাঁসুলী, কানপাশা, নাকফুল, কানের ঝুমকা, বালা, তয়া নানা অলংকারাদি কিনলো। দুইপুত্রের জন্য কিনলো বিস্তর জামাকাপড়, মাথার টুপি, জুতামৌজা, খেলনাপত্র ইত্যাদি। এ ছাড়াও আরো কিনলো পান সুপারী, জর্দা, হাড়িপাতিল, নানা জাতের শুটকী,তৈল মরিচ, আতর, সুগন্ধি তৈল, চুড়ি চামর, মোয়া মুড়ি। কিনছে তো কিনছেই। কেনার কোন থামাথামি, নেই। রাজ্যের সব জিনিস কেনার পর দু'জন কামলার উপর মুট চাপিয়ে দিয়ে জুয়াংফা মহানন্দে টং ঘরে ফিরে এলো।

ফিরে এসে জুয়াংফা দেখে টং ঘর শূন্য। টং ঘরের দরজা হা করে খোলা, ঘরের জিনিসপত্র যত্রতত্র ছড়ানো ছিটানো। সব কিছু লণ্ডভণ্ড। জুয়াংফা ভাবলো ব্যাপার কি। বউয়ের নাম ধরে বিস্তর ডাকাডাকি করলো। কোন সাড়া শব্দ পেলো না। ছেলে দু'টোর নাম ধরে ডাকাডাকি করলো আরো কিছুক্ষণ। না কোথাও সাড়া শব্দ পেলো না।

জুয়াংফা বউকে খুঁজছে তো খুঁজছেই। টং ঘরে ছিলো একটা বিড়াল। মোয়ামুড়ির গন্ধ পেয়ে বিড়ালটা কেবল মিউ মিউ করছে। জুয়াংফা যে দিকে যায় বিড়ালটাও সেখানে গিয়ে কেবল মিউমিউ করে। বিড়ালটার প্রতি বিরক্ত হয়ে জুয়াংফা শেষমেষ তাকে জবাই করে দিলো। আর বিড়ালের চামড়া দিয়ে বানালো একটা ডুগডুগি। এরপর ডুগডুগি বাজিয়ে জুয়াংফা বনপথে বেরিয়ে পড়লো স্ত্রী পুত্রদের সন্ধান করতে।

টুম টুমা টুম টুম
স্ত্রী মোর মংগিনী
পুত্র মোর ততেসা ও বাতেসা
কোথায় গেলি আয় ত্বরা
টুম টুমা টুম টুম... ॥

ডুগডুগি বাজিয়ে বনপথে যেতে যেতে জুয়াংফা দেখলো বনে কতিপয় নারী কলাপাতা সংগ্রহ করছে। জুয়াংফা তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ওহে নারীগণ, তোমরা আমার স্ত্রী মংগিনী পুত্র ততেসা বাতেসাকে কোথাও যেতে দেখেছো কি ?

জবাবে নারীরা বললো, আগে আমাদেরকে পাতা সংগ্রহ করে দাও। জুয়াংফা বেশ করে পাতা সংগ্রহ করে দিলো। তারপর নারীরা বললো, ওহে জুয়াংফা,

তোমার স্ত্রীপুত্রগণ মইচুং পাহাড়ের দিকে চলে গেছে।
জুয়াংফা ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে মইচুং পাহাড়ের দিকে চলে গেলো। যেতে যেতে কিছু লোকজনের সাথে দেখা পেলো। তারা লাকড়ি সংগ্রহ করছিলো। জুয়াংফা তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ওহে, নরগণ, তোমরা আমার স্ত্রী মংগিনী ও পুত্র ততেসা বাতেসাকে এদিকে যেতে দেখেছো কি ?
লোকজন জুয়াংফাকে বললো, আগে লাকড়ি সংগ্রহ করে দাও। জুয়াংফা বেশ করে লাকড়ি সংগ্রহ করে দিলো। তারপর লোকজন বললো,ওহে জুয়াংফা তোমার স্ত্রীপুত্রগণকে পাহাড়ের ওই চৌরাস্তার দিকে যেতে দেখেছি।
জুয়াংফা আবার ডুগডুগি বাজিয়ে চৌরাস্তার দিকে চলে গেলো। চৌরাস্তায় গিয়ে সে দেখলো শত সহস্র পথ। সে এখন কোন পথে যাবে দিশা করতে পারলো না। হঠাৎ সে দেখলো রাস্তার ধারে বসে এক বুড়ো হুকো টানছে। বুড়োর কাছে গিয়ে জুয়াংফা জিজ্ঞেস করলো, ওহে প্রধান, আমার স্ত্রী মংগিনী ও পুত্র ততেসা বাতেসাকে এদিকে কোথাও যেতে দেখেছো কি ? বুড়ো বললো, আমার লাল গাইটা এ বনে কোথাও হারিয়ে গেছে। আগে খুঁজে এনে দাও। জুয়াংফা পই পই করে, লাল গাইটাকে খুঁজে এনে দিলো। তারপর বুড়ো বললো, ওহে জুয়াংফা তোমার স্ত্রী পুত্রগণ দাংগুই গ্রামের পথে চলে গেছে।
জুয়াংফা কি আর করবে। দুর করে ডুগডুগিটা বনে ফেলে দিয়ে দাংগুই গ্রামের পথে চলে গেলো। যেতে যেতে সে শ্বশুড়ের বাড়িতে পৌঁছে গেলো। পৌঁছলো তো পৌঁছলো, ঘরে না উঠে ঘরের আঙিনায় বসে রইলো। জুয়াংফা এসেছে জেনে পাড়াপড়শীরা দেখতে এলো। জুয়াংফা দিব্যি ঘরের উঠানে বসে রইলো। এক পড়শী বললো, ওহে জুয়াংফা উঠানে বসে আছো কেন ? ঘরের ভেতরে যাও। জুয়াংফা বললো, আমার স্ত্রী মংগিনী তো বলেনি। স্ত্রী এসে বললো উঠানে কেন ? ঘরে উঠে আসো। জুয়াংফা বললো, পুত্রগণ তো বলেনি। ততেসা বাতেসা এসে বললো, বাবা, ঘরে চলে এসো। জুয়াংফা বললো, শ্বশুর মশাইতো বলেননি। শ্বশুর মশাই এসে বললো, ওহে জামাই বাবু, ঘরে উঠে এসো। জুয়াংফা বললো, শ্যালক শ্যালিকারা তো বলেনি। শ্যালক শ্যালিকারা এসে বললো, ওহে বোনাই, ঘরে উঠে এসো।
সবার আহবানে জুয়াংফা ঘরে উঠে গেলো। বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসা জিনিসপত্র স্ত্রীর হাতে তুলে দিলো। কিনে আনা শুটকি দিয়ে ঝোল বানানো হলো। মুরগী জবাই করা হলো। কতো কিছু রান্না করা হলো। রাতে বেশ ভালো করে খেয়ে দেয়ে জুয়াংফা শুতে গেলো। শ্বশুরের বাড়িটি ছিলো মাচা ঘর। মাচা ঘরের নীচে ছিলো ৩০টি কুকুরের খোয়াড়। সে রাতে জুয়াংফাকে শুতে হলো

শ্যালকদের সাথে। এক শ্যালক ছিলো দুষ্টু প্রকৃতির। সে ছিল জুয়াংফার পাশে। মাঝ রাতে শ্যালকটি বলে উঠে, বোনাই, আমি যে বড় চাপা খাচ্ছি। আর একটু সরে যাও। ঘুমের ঘোরে জুয়াংফা আর একটু সরে গেলো। কিছুক্ষণ পর শ্যালকটি আবার বলে উঠে, বোনাই আর একটু সরে যাও। জুয়াংফা সরে যায়। এখন হলো কি, ঘুমের ঘোরে সরে যেতে যেতে বাঁশের বেড়া ভেঙে জুয়াংফা পড়ে গেলো কুকুরের খোয়াড়ে। আর যায় কোথায়। কুকুরের কামড় খেয়ে জুয়াংফা শেষে মরেই গেলো। শ্যালকরা দেখলো মহাবিপদ। লোকে জানলে হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। তাই সবার অজান্তে জুয়াংফার মাথা কেটে রেখে দেহটাকে নদীর জলে ফেলে ভাসিয়ে দিলো যাতে লোকে চিনতে না পারে। এরপর নদীর বালুর চরে গর্ত খুঁড়ে ওখানে জুয়াংফার মাথাকে কবর দেয়া হলো।

জুয়াংফাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। বউ কান্দে, পুত্রগণ কান্দে। জুয়াংফা লাপাত্তা। এখন হলো কি। কিছুদিন যাবার পর জুয়াংফার দু'পুত্র ততেসা ও বাতেসা দেখলো নদীর বালুচরে কাকে আর শেয়ালে মিলে কি যেন টানাটানি করছে আর চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। ততেসা ও বাতেসা গিয়ে দেখে ওটা তাদের বাবা জুয়াংফার মাথা। তাদের আর বুঝতে দেরী হলো না এ কাজ কারা করেছে। দু'ভাই নদীর বালুচরে বসে যুক্তি করলো বাপের পঁচা মাথা নিয়ে তারা গ্রামবাসীদের অতিষ্ঠ করবে। তারপর তারা একটি বাঁশের আগায় বাপের পঁচা ও গলানো মাথা গেঁথে নিয়ে সারাগ্রামে ঘুরতে লাগলো। আর সে সাথে বুলি আউরাতে লাগলো,

সিডল সিডল লইবানি
বাপুর মাথা কাওয়া খায়
কাওয়ার মাথা চেৎ...

চি-চি-চি দুর দুর করে উঠলো গ্রামবাসীরা। ততেসা বাতেসা থামে না। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে তারা বাপের পঁচা মাথা নিয়ে খুব করে নির্যাতন করলো। পঁচা মাথার দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে কেউ ঘর থেকে পালালো কেউবা ওয়াক ওয়াক বমি করতে লাগলো। ততেসা ও বাতেসা সারাদিন গ্রামবাসীদের এভাবে নির্যাতন করে শেষে এক জলার ধারে বাপের মাথা ফেলে দিয়ে এলো। কিছুদিন পর দেখা গেলো জুয়াংফার মাথা থেকে একটা গাছের চারা গজে উঠেছে। ক্রমে চারা গাছটি বড় হলো আর তাতে প্রচুর ফল ধরলো। আর সেই গাছটি হলো চালতা গাছ। ত্রিপুরীদের লোকবিশ্বাস-জুয়াংফার মাথা থেকে চালতা গাছের জন্ম হয়েছিলো। আর তাই চালতা ফলের ভেতরের অংশ দেখতে মানুষের মাথার মতো।

তিন মাথার কাহিনী

ত্রিপুরা রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ নগরের নাম অমরপুর। নগরের এক প্রান্তে বাস করতো এক গৃহস্থ। তার ছিলো তিনজন ছেলে। গৃহস্থের ধন সম্পদ বলতে তেমন কিছু ছিলো না। জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। সম্পত্তির মধ্যে ছিলো একখানি বাড়ি আর একখণ্ড জমি। গৃহস্থ জানতো যে, তার মৃত্যুর পর তার তিন ছেলে অনাহারে মরবে নতুবা পরের ঘরে চাকর বাকর হয়ে জীবিকা নির্বাহ করবে। কারণ ছেলেরা ছিলো একেবারেই অকর্মণ্য ও অলস প্রকৃতির। গৃহস্থ এও ভালো করে জানতো যে, তার মৃত্যুর পর বসতবাড়ি ও রেখে যাওয়া এক খণ্ড জমির জন্য ছেলেরা ঝগড়া বিবাদ করবে। তথাপি গৃহস্থ তার তিন ছেলেকে সমান ভালোবাসতো। ছেলেদের ভবিষ্যৎ দুর্দশার কথা চিন্তা করে মৃত্যুর আগে কি উপদেশ দিয়ে যাবে তার চিন্তা ভাবনা করে কূল কিনারা পেলো না গৃহস্থ। এ দিকে তার শরীরের অবস্থাও ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলো।

অবশেষে পুত্রদের ডেকে গৃহস্থ বললে,হে আমার পুত্রগণ, আমি তোমাদের কাজ-কর্ম দেখে মোটেই সন্তুষ্ট নই। আমি মরে যাবার পর ভবিষ্যতে তোমাদের অবস্থা কী হতে পারে তা আমি উত্তমরূপে জানি। কিন্তু তোমরা মনে রেখো জীবিত থাকতে আমি তোমাদের কিছুই দিয়ে যাবো না। আমার মৃত্যুর পর তোমরা নিজেরাই আমার ধন সম্পদ খুঁজে নিও। তোমাদের মঙ্গলের জন্যে আমি তিনটি উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি। আমার উপদেশ মতো তোমরা যদি চলতে পারো তা'হলে তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কল্যাণ ও শান্তি হবে। যদি তোমাদের পক্ষে আমার উপদেশ তিনটি বুঝতে কষ্ট হয় তা হলে তোমরা তিন মাথাওয়ালা মানুষের কাছে গিয়ে সঠিক নির্দেশ জেনে নিও। এখন তোমরা আমার উপদেশ মনযোগ দিয়ে শুনে নাও। প্রথম উপদেশ : আমি মারা যাবার পর তোমরা তিন ভাই মিলে মিশে বাড়ির চারপাশে হাট বসাবে। দ্বিতীয় উপদেশ : সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য বেশী করে মাছের মাথা কিনে খাবে। তৃতীয় উপদেশ : রেখে যাওয়া

এককখণ্ড জমিতে লুকানো ধন তুলে নেবে। কিছুদিন পর গৃহস্থ মারা গেলো।

পিতার মৃত্যুর পর তিন ছেলে বাড়ির চারপাশে হাট বসালো। বাজার থেকে বড়বড় রুই-কাতলা মাছের মাথা কিনে খেতে শুরু করলো আর এক খণ্ড জমিতে পিতার রেখে যাওয়া লুকানো ধনের খোঁজে প্রতিদিন মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে লাগলো। এতে করে কিছুদিন চলার পর তিনভাই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত হলো। পিতার উপদেশমতো কাজ করতে গিয়ে শেষে মহাবিপদে পড়লো। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনভাই স্থির করলো তারা তিন মাথাওয়ালা লোকের অনুসন্ধান করে পিতার উপদেশ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জেনে নেবে।

একদিন তিনভাই তিন মাথাওয়ালা লোকের সন্ধানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। পথে খাবারের জন্যে কিছু চাল, ডাল সঙ্গে করে নিলো। বাঁশের চোঙ্গায় গর্জন গাছের তেল ভরে মশাল বানিয়ে নিলো। সাত দিন সাত রাত ধরে রাজ্যময় ঘুরে দেখলো কিন্তু কোথাও তিন মাথাওয়ালা লোকের সন্ধান তারা পেলোনা। অবশেষে অতিশয় ক্লান্ত ও নিরাশ হয়ে হাচুকবাসী এক গৃহস্থের জুমের টং ঘরে রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে অতিথি হলো। গৃহস্থ যথারীতি অতিথিদের আপ্যায়ন করলো। রাতে খাবার শেষে অনেক গালগল্প হলো। এ কথা সে কথার পর একসময় গৃহস্থ অতিথি তিন ভাইয়ের কাছে তাদের দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইলো। গৃহস্থের জিজ্ঞাসায় তিন ভাইকে তাদের ভ্রমণ কাহিনী সম্পর্কে খুলে বলতে হলো। সে সঙ্গে তাদের বর্তমান জীবনাবস্থা ও দুঃখের কাহিনীও বললো। সেই জুমের টং ঘরে গৃহস্থের ৯০ বছরের বৃদ্ধ বাবাও ছিলো। অতিথিদের কথাবার্তা শুনে বৃদ্ধ লোকটি তাদেরকে কাছে ডেকে বললেন,তোমাদের পিতা ঠিক কথাই বলে গেছেন। আর তোমরা ভুল কাজ করেই চলেছো। তোমরা এখনো তিন মাথাওয়ালা লোকের সন্ধান খুঁজে পাওনি। তোমরা আমার দিকে এইবার একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখো। আমি একজন তিন মাথাওয়ালা ব্যক্তি। বৃদ্ধের কথা শুনে তিনভাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো যে, বৃদ্ধের মাত্র একটি মাথা। তিন মাথা কোথায় ? তিন ভাইয়ের মধ্যে বড় ভাই বিণয় সহকারে বললো,পিতৃব্য অপরাধ ক্ষমা করবেন। আমরা আপনার একটি মাথাই দেখতে পাচ্ছি। তিন মাথা কোথায় ? দয়া করে আমাদেরকে বুঝিয়ে বলুন। স্মিত হেসে বৃদ্ধ বললেন,তিন মাথাওয়ালা ব্যক্তি কলির

পৃথিবীতে নেই। যারা অতিশয় বৃদ্ধ লোক তারা বসে পড়লে মেরুদণ্ড কুঁজো হয়ে মাথা হাঁটুতে এসে ঠেকে। এতে দেখতে তিন মাথার মতো মনে হয়। তাদেরকে লোকে তিন মাথাওয়ালা ব্যক্তি বলে। আমি তাদেরই একজন।

তিনভাই বললে,পিতৃব্য! আমরা পিতার উপদেশ মতো সবকিছু করেছি। কিন্তু এ সব করতে গিয়ে দারিদ্র আমাদেরকে গ্রাস করেছে। এখন আপনি আমাদেরকে একটা উপায় বলে দিন।

তিন ভাইয়ের কথা শুনে তিন মাথাওয়ালা বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বললেন,শোন বাছা'রা, বাড়ীর চারপাশে হাট বসাতে তোমাদের পিতা উপদেশ দিয়ে গেছেন। এ কথার অর্থ হলো,বাড়ির চারপাশে শাক সবজি ও ফলমূলের বাগান করা। এ কাজটি করলে তোমাদেরকে আর হাট থেকে তরিতরকারী ও ফলমূল কিনে খেতে হবে না। তাজা শাক সবজি ও ফলমূল খেলে দেহের পুষ্টি সাধিত হয়। হাটে বিক্রি করে দু'পয়সা আয় করা যায়।

মাছের মাথা কিনে খেতে তোমাদের পিতা বলে গেছেন। এর অর্থহলো হাট থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট মাছ কিনে খাওয়া। ছোট মাছ দেহের চেয়ে মাথা বেশী দেখা যায়। ছোট মাছ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী ও বলকারক। এতে কম খরচে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মেটানো যায়। আর একখণ্ড জমিতে ধন লুকানোর কথা বলে গেছেন তোমাদের পিতা। এর অর্থ হচ্ছে ঐ জমি উত্তম রূপে চাষ করলে তোমাদের আর শস্য সম্পদের অভাব হবে না। যত চাষ করবে তত তোমাদের বৈষয়িক সমৃদ্ধি আসবে। তোমরা এখন আমার কথামতো বাড়িতে গিয়ে কাজ করো। দেখবে দারিদ্র ঘুচে গিয়ে তোমাদের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে।

তিন মাথাওয়ালা বৃদ্ধের কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে তিনভাই বাড়িতে এসে কাজে নেমে পড়লো। বাড়ির চারিপাশে শাকসবজি ও ফলমূলের বাগান করলো। ছোটমাছ কিনে খাওয়া শুরু করলো আর একখণ্ড জমিতে চাষবাস শুরু করে দিলো। এতে করে তাদের দুঃখ ও দারিদ্র মোচন হলো। তিন ভাইয়ের এ কাহিনী ত্রিপুরা মহারাজার দরবারেও গিয়ে পৌঁছেছিলো। মহারাজা বিচকারকে নির্দেশ দিলেন এ কথা তন্ত্রসার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রাখতে।

'বুদ্ধিতে মেলে সকল সুখ
নির্বুদ্ধিতে বাড়ে যত দুখ'।

রাজা মেঘবর্ণের দান

পুরাকালে ত্রিপুরা রাজ্যে মেঘবর্ণ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন অতিশয় দানশীল এবং অদ্ভুত চরিত্রের। তাঁর অদ্ভুত চরিত্রের জন্য মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র এবং রাজ অমাত্যবর্গকে সদা সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত থাকতে হতো। রাজা মেঘবর্ণ কখনও কখনও এমন সব কাজ করতেন যা তাঁর,অমাত্যবর্গ চিন্তা করে কোন কুল কিনারা করতে পারতেন না। রাজা মেঘবর্ণ দান করতে ভালবাসতেন। এ জন্য তিনি প্রতিদিন পাঁচ সহস্র মুদ্রা গরীব দুঃখীদের মাঝে দান করতেন। রাজা মেঘবর্ণের স্ত্রীর নাম ছিল অমরাবতী। রাণী অমরাবতী ছিলেন অতিশয় ধীর স্থির স্বভাবের এবং রূপে গুণে অনন্যা।

একদিন রাজা মেঘবর্ণ রাজ অমাত্যবর্গ পরিবেশিত হয়ে রাজ দরবারে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন। এমন সময় তিনি হঠাৎ করে বৃদ্ধ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন,মন্ত্রী বর। দান বলতে আপনি কি বোঝেন। আমি সর্বশ্রেষ্ঠ দান করতে চাই। রাজা মেঘবর্ণের এহেন প্রশ্নে সভাসদ মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল।

বৃদ্ধ মন্ত্রী হাতজোড় করে বললেন,মহারাজ দান করা একটি মহৎ কাজ। দানে মানুষের চিত্ত নির্মল হয়। ইহকালে ও পরকালে পুণ্যফল লাভ করে শান্তি পাওয়া যায়। আপনি তো প্রতিদিন স্বহস্তে পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করছেন। এ দানই তো শ্রেষ্ঠ দান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। আপনি যদি আদেশ করেন তা হলে দানের পরিমাণ আরো দুই সহস্র বাড়িয়ে সাত সহস্র করা যেতে পারে।

রাজা মেঘবর্ণ বৃদ্ধ মন্ত্রীর কথা শোনার পর গম্ভীর স্বরে বললেন,মন্ত্রীবর। আর দুই সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা বাড়ানোর দরকার নেই। আমি এমন জিনিস দান করতে চাই,যা ইতিপূর্বে কেউ কখনও করেননি।

শুনুন-মন্ত্রীবর ও অমাত্যবর্গ। আমি ঘোষণা করছি যে, কেউ যদি আমার কাছে এসে আমার চক্ষু চায় আমি তাকে চক্ষু দান করবো।

কেউ যদি আমার রক্ত মাংস চায়,আমি আমার রক্ত মাংস দান করবো।

কেউ যদি আমার মাথা চায় আমি আমার মাথা দান করবো।

কেউ যদি আমার হৃদপিণ্ড চায় আমি আমার হৃদপিণ্ড দান করবো।

কেউ যদি আমাকে দাস হিসেবে পেতে চায় আমি তার অনুগত দাস হবো।

এমনকি কেউ যদি আমার এই স্বর্গ-পুরী ত্রিপুরা রাজ্যও চায় তাহলে আমি সহাস্যে সমগ্র রাজ্যই তাকে দিয়ে দেবো।

রাজা মেঘবর্ণের এহেন ঘোষণা শুনে মন্ত্রী, অমাত্যবর্গ সবাই হায় হায় করে উঠলেন।

বৃদ্ধ মন্ত্রী হাত জোড় করে বললেন,মহারাজ। এ কি করে সম্ভব ? এ ধরনের কঠিন দান দেবতারাও করতে পারেন না। ত্রিভুবনে কেউ এ ধরনের দান করেছে বলে আমার জানা নেই। এমন কি শাস্ত্রেও নেই। এমন সর্বনাশী কর্ম থেকে আপনি বিরত থাকুন মহারাজ।

রাজা মেঘবর্ণ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,আমি এ পর্যন্ত যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার কোন দিন বিচ্যুতি কখনও ঘটেনি-ভবিষ্যতেও ঘটবে না। ঘোষণা যখন একবার দিয়েছি- তা প্রত্যাহার করা রাজধর্ম নয়। আমার সিদ্ধান্ত চুল পরিমাণও নড়বে না। আমি আপনাকে আমার সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করার জন্য আদেশ দিচ্ছি।

রাজা মেঘবর্ণের কঠোর প্রতিজ্ঞা এবং আদেশ পেয়ে মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গরা কি আর করবেন। তাই বাধ্য হয়ে-সমগ্র পৃথিবীতে রাজ আজ্ঞা প্রচার করে দিলেন। রাজা মেঘবর্ণের কঠোর ও নিঃশর্ত ঘোষণা-ইহলোক, পরলোক, চন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক রুদ্রলোক ছাড়িয়ে যম রাজ্যের কাছেও পৌঁছেছিল। যম রাজা-এহেন কঠোর দানের কথা শুনে রাজা মেঘবর্ণকে পরীক্ষা করার জন্যে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি স্বর্গের রাজা দেবরাজ ইন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন।

স্বর্গের রাজা ইন্দ্র যম রাজের আজ্ঞা পেয়ে যম পুরীতে উপস্থিত হলেন।

যমরাজা বললেন,মহারাজ ইন্দ্র। মর্ত্যের ত্রিপুরা রাজ্যের অধিপতি মেঘবর্ণ কঠোর দানের কথা ঘোষণা করেছেন। আমি তাকে পরীক্ষা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর এ পরীক্ষা করার দায়িত্ব আমি আপনার উপর দিতে চাই। আপনি আর কালবিলম্ব না করে মর্ত্যে ত্রিপুরা রাজ্যে চলে যান এবং রাজা মেঘবর্ণকে পরীক্ষা করুন। যম রাজের আজ্ঞা পেয়ে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র মর্ত্যলোকে গমন করলেন। এদিকে ত্রিপুরার রাজা মেঘবর্ণ রাজ অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে দরবার করছেন। রাজা মেঘবর্ণ বৃদ্ধমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন,মন্ত্রীবর। আমার দানের কথা ঘোষণা দেয়ার পর আজ তিনদিন অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ তো আমার দান গ্রহণ করার জন্য এলো না। আমি জানতে চাই- আমার দানের ঘোষণা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সঠিকভাবে প্রচার হয়েছে কি না ?

এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র জরাজীর্ণ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে রাজ দরবারে প্রবেশ করলেন। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে বললেন,মহারাজ মেঘবর্ণের জয় হোক।

রাজা মেঘবর্ণ দেখলেন,এক জরাজীর্ণ ব্রাহ্মণ রাজ দরবারে দাঁড়িয়ে।
ব্রাহ্মণকে দেখে রাজা মেঘবর্ণ বললেন উত্তম। বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি ?
ব্রাহ্মণ বললেন,মহারাজ। আমি আপনার দান করার ঘোষণার কথা শুনেছি। আমি অতিশয় গরীব দুঃখী ব্রাহ্মণ। আমাকে দয়া করে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করুন।
ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনে রাজা মেঘবর্ণ হেসে উঠলেন,বললেন,ব্রাহ্মণ ? আপনি কি জানতেন না যে, আমি প্রতিদিন পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করি। আপনি পাঁচ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা চাইলেন না কেন ?
ব্রাহ্মণ বললেন,মহারাজ। পাঁচ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার আমার প্রয়োজন নেই। এক সহস্র মুদ্রাই আমার প্রয়োজন। অতএব, প্রার্থনা মঞ্জুর হোক।
রাজা মেঘবর্ণ বললেন- মঞ্জুর।
জরাজীর্ণ ব্রাহ্মণ,এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করে রাজ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন।
তিন দিন পর সেই জরাজীর্ণ ব্রাহ্মণ রাজা মেঘবর্ণের রাজ প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। বললেন,'মহারাজ মেঘবর্ণের জয় হোক।'
রাজা মেঘবর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন,ব্রাহ্মণ আজ আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?
ব্রাহ্মণ বললেন,মহারাজ। আজ আমি কিছুই চাইবো না। তবে আমার একটা প্রার্থনা আছে। আমার তো ঘর বাড়ি বলতে কিছুই নেই, আপনার দেয়া এই এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা নিরাপদে কোথাও রাখার স্থান পাচ্ছি না। প্রার্থনা মঞ্জুর হলে আমি আপনার কাছে এই এক সহস্র মুদ্রা আমানত রাখতে পারি। পরে যখন প্রয়োজন হবে তখনি নিয়ে নেব।'
রাজা মেঘবর্ণ বললেন,উত্তম। আপনি রেখে যেতে পারেন। জরাজীর্ণ ব্রাহ্মণ রাজার কাছে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আমানত রেখে রাজ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন।
কিছুদিন যাবার পর এক সুদর্শন যুবক কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজা মেঘবর্ণের প্রাসাদে হাজির হলেন। রাজ সকাশে উপস্থিত হয়ে রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন,'মহারাজ মেঘবর্ণের জয় হোক।'
রাজা মেঘবর্ণ বললেন,উত্তম। বলো যুবক কি হেতু তোমার আগমন ? কি তোমার পরিচয়?
যুবক:মহারাজ। ক্ষত্রিয় কুলে আমার জন্ম। আমার পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন সবাই

রাজপুরুষ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার। আমি রাজপুরুষ হতে বঞ্চিত হয়েছি। আমার প্রবল ইচ্ছা রাজা হবার।

আপনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলে আমি এই রাজ্যের রাজা হতে পারি। আপনি দয়া করুন মহারাজ। রাজা মেঘবর্ণ:অতি উত্তম। তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর। তবে আমার স্ত্রী অমরাবতী এবং এই সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব ছাড়া-রাজ্যের সব কিছু আমি তোমাকে দিলাম।

রাজ্য দান করে রাজা মেঘবর্ণ স্ত্রী অমরাবতীকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বের পিঠে চড়ে রাজ্য থেকে অজানা উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁদের অনুসরণ করলেন। রাজা রাজ্য থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যাবার পর একজন খোঁড়া লোক রাজার পথ আগলে বললেন,মহারাজ আমি দেরী করে ফেলেছি। আপনার কাছে আমার কিছু চাইবার ছিলো। রাজা মেঘবর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন,বলুন আপনি কি চান ? খোঁড়া ব্যক্তি বললেন,মহারাজ। আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি খোঁড়া। হাঁটা চলা করতে আমার বড়ই অসুবিধা। আপনার এই অশ্বটাকে আমায় দান করুন মহারাজ। রাজা-মেঘবর্ণ বললেন,উত্তম। এই নিন অশ্ব।

খোঁড়াকে অশ্ব দান করে রাজা মেঘবর্ণ স্ত্রীকে সঙ্গে করে পায়ে হেঁটে অজানা উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

যেতে-যেতে-যেতে- যেই তেপান্তরের মাঠ পার হতে যাবেন-অমনি কোথা থেকে সেই জরাজীর্ণ ব্রাহ্মণ এসে হাজির। রাজাকে বললেন,মহারাজ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা আমার এখন ভীষণ দরকার। আমি যে আপনার কাছে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা আমানত রেখেছিলাম দয়া করে আমাকে ফেরৎ দিন।"

রাজা মেঘবর্ণ এবার মহাবিপদে পড়লেন। তিনি ভুলক্রমে সেই মুদ্রা রাজ্যের সাথে দান করে এসেছেন। তিনি বিনয়ের সাথে বললেন, ব্রাহ্মণ আমি তো ভুলক্রমে রাজ্যের সাথে সেই মুদ্রা দান করে এসেছি। আর তো ফেরত নেয়া যায় না। মুদ্রার পরিবর্তে আপনি আমাদের গ্রহণ করুন। আমরা আপনার দাস হতে রাজী আছি।

ব্রাহ্মণ বললেন,আমার দাসের প্রয়োজন নেই। আমার মুদ্রার প্রয়োজন। অতএব, আমাকে মুদ্রা প্রদান করুন।

রাজা উপায়ন্তর না দেখে বললেন,অপরের নিকট আমাদের বিক্রি করে আপনি মুদ্রা সংগ্রহ করুন। ব্রাহ্মণ বললেন,আমি বিক্রয়ের রীতি নীতি জানি না। আপনারা নিজেরাই নিজেদের বিক্রয় করে আমাকে মুদ্রা ফেরত দিন।

রাজা মেঘবর্ণ ব্রাহ্মণের কাছে এক দিনের সময় ভিক্ষা করলেন। তাতে ব্রাহ্মণ রাজী হলেন। রাজা মেঘবর্ণ এক রজকের কাছে স্ত্রী অমরাবতীকে পাঁচ শত স্বর্ণ

মুদ্রায় বিক্রি করলেন এবং নিজেকে এক বণিকের কাছে পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রায় বিক্রি করে ব্রাহ্মণের মুদ্রা পরিশোধ করলেন।

বিধাতার নির্মম পরিহাস। রাজা হলেন, দাস আর রানী হলেন দাসী। রজকের বাড়িতে দাসী হবার এক মাস আগে রানী ছিলেন গর্ভবতী। নয় মাসের পর রজকের বাড়িতে গিয়ে রানী এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে সন্তানটি মারা গেল। রজক দাসীর চরিত্রে সন্দিহান হয়ে তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এখন উপায় ? দাসী রূপী রানী মৃত সন্তানকে বুকে নিয়ে রাস্তায় নামলেন। রানী জানতেন রাজা কোথায় দাসবৃত্তি করেন। বিদ্যুতের আলোকে পথ দেখে দেখে রাজা মেঘবর্ণ যে বণিকের বাড়িতে দাস হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দাসী রূপী রানী বণিকের দাস রূপী রাজাকে দ্বার খুলে দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাজা মেঘবর্ণ কিছুতেই দ্বার খুললেন না। তিনি বললেন, আমি পরের দাস। মনিবের অনুমতি ছাড়া আমি দ্বার খুলতে পারি না। তবে মনিবের অনুমতি পেলে দ্বার খুলে দিতে পারি। বলো, কি তোমার পরিচয় ? কেন এখানে এসেছো ?

দাসী রূপী রানী অমরাবতী সত্য গোপন না করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন – আমি পূর্বে ছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা মেঘবর্ণের স্ত্রী–পরে এক রজকের দাসী। আর এখন মৃত সন্তান বুকে নিয়ে পথের ভিখারীনী।

পরিচয় জেনে বণিকের দাস রূপী রাজা মেঘবর্ণ হু হু করে কেঁদে উঠলেন,বললেন, হে রানী আমিই সেই হতভাগ্য রাজা মেঘবর্ণ। এখানে দাস হিসেবে দ্বার রক্ষক নিযুক্ত আছি। তুমি দুঃখ করো না।

তারপর রাজা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলেন। রাণী আমি, এই মৃত সন্তানের জীবন ফিরিয়ে আনবো। রানী বললেন, আপনি কিভাবে মৃত সন্তানের জীবন ফিরিয়ে আনবেন?

রাজা বললেন, রানী সত্যের উপর কোনো ধর্ম নেই। আমি সেই সত্যের প্রভাবে মৃত সন্তানের জীবন ফিরিয়ে আনবো।

তারপর রাজা হাত জোড় করে উপরের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, 'আমি বুদ্ধিমান হওয়া অবধি আমার জ্ঞাতসারে একটি ক্ষুদ্রকীটও হত্যা করিনি। আমার এই সত্যের প্রভাবে আমার মৃত সন্তান পুনঃজীবিত হোক।"

'আমি আমার সৎজ্ঞানে অপরের কোন সামান্য জিনিসও গ্রহণ করিনি। আমার এই সত্যের প্রভাবে আমার মৃত সন্তান পুনঃজীবিত হোক।

'জীবনে আমি মদ জাতীয় কোন দ্রব্য স্পর্শ করিনি। আমার আত্মা পবিত্র আছে। এই পবিত্রতার প্রভাবে আমার মৃত সন্তান পুনঃজীবিত হোক।"

'আমি জীবনে যত দান দক্ষিণা করেছি তা নিঃস্বার্থ ও শ্রদ্ধার সাথে দান করেছি। এই সত্যের প্রভাবে আমার মৃত সন্তান পুনঃজীবিত হোক।"

নিজ স্ত্রী অমরাবতী ছাড়া আমি রিপুর তাড়নায় অন্য কোন নারীর প্রতি আসক্ত হইনি কিম্বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইনি। সকল নারীকে মাতৃসম সম্মান দিয়েছি। এই সত্যের প্রভাবে মৃত সন্তান পুনঃজীবিত হোক।"

"আমি সকলের জন্য সর্বোত্তম হিতজ্ঞান প্রার্থনা করেছি। এই সত্যের প্রভাবে আমার মৃত সন্তান পুনঃজীবিত হোক। "সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক" সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক" এই বলে রাজা মেঘবর্ণ নীরব হলেন।

রাজার উদ্দীপ্ত বাণী শুনে অতঃপর রাণীও দু'হাত জোড় করে বলতে শুরু করলেন– "স্বামী আমাকে রজকের কাছে বিক্রি করেছিলেন। আমি অপরের দাসী হয়েছিলাম। কিন্তু আমি সতীত্ব রক্ষা করেছি, স্বামীর প্রতি ভক্তি হারাইনি। আমি এখন সন্তানের জন্য সত্য ক্রিয়া করছি। এর পূণ্যফলে আমার মৃত সন্তান পুনঃজীবিত হোক"।

নারীর জন্য যা করণীয় আমি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে তা সম্পাদন করেছি। কোন কার্পণ্য কিম্বা ঈর্ষান্বিত হইনি। এ সত্যের প্রভাবে আমার মৃত সন্তান পুনঃজীবিত হোক।'

'স্বামীর ধর্ম আমার ধর্ম। এই পর্যন্ত স্বামী যা কিছু পুণ্যকাজ করেছে তাতে আমি বিন্দুমাত্র বিরোধিতা করিনি। অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে সমর্থন দান করেছি। এই সত্যের প্রভাবে মৃত সন্তান পুনঃজীবিত হোক। "সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক" "সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক' "সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক"।

রাজা মেঘবর্ণ ও রানী অমরাবতীর এহেন সত্য বাক্য উচ্চারিত হওয়ায় ধর্ম রাজের তুলাদণ্ড থর থর করে কেঁপে উঠলো। যমরাজ আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি মৃত সঞ্জীবনী সুধা হাতে মুহূর্তে মর্তে নেমে এলেন। মৃত সন্তানকে প্রানদান করলেন। অত:পর যমরাজ নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন,মহারাজ মেঘবর্ণ, আমি আপনার নিঃস্বার্থ দানে সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনার দান অতুলনীয়। আপনি ধন্য। আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য আমি ইন্দ্রকে পাঠিয়েছিলাম। আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আপনি সোনার ত্রিপুরা রাজ্যে ফিরে যান এবং পৃথিবীকে ভোগ করুন। এ বলে যমরাজ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

নাউই

হয়তো অনেকের মনে পড়বে, শীতের দুপুরে হঠাৎ আকাশের অনেক ওপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে অজস্র পাখি উড়ে যাচ্ছে। ধাবমান তীরের মতো ওই বিষণ্ন, দীর্ঘ পাখিদের সারি বহুদিন হল স্মৃতির ভেতরে মরচে পড়েছিল প্রায়। বয়স্কদের শোনা কথায় ভর করে আমরা পরনের লুংগিতে অথবা গামছায় গিঁট দিতাম- তাতে নাকি ওরা পথ হারায়, নেমে আসে নিচে, পৃথিবীতে!

অনেক অনেক দিন আগের কথা। ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব প্রান্তের সীমানায় চন্দ্রনগর নামে একটি বিশাল গ্রাম ছিলো। ওই গ্রামে বাস করতো এক জুমিয়া। তার ছিলো দুই মেয়ে-কাচাকতি ও কুফুতি। কাচাকতি বড়, কুফুতি ছোট। কাচাকতি খুবই চঞ্চল ও খাই খাই স্বভাবের আর কুফুতি ধীর-স্থির, শান্তশিষ্ট স্বভাবের। একদিন দুইবোন জুমে গেলো কিছু শাক-সবজি তুলে আনতে। তাদের জুমক্ষেত ছিলো গ্রাম থেকে বেশ অনেক দূরে। জুমে পৌঁছে দুইবোন মনের আনন্দে হাচুকসুরে গুনগুনিয়ে গান করে জুম চষে বেড়ালো, শাক-সবজি তুললো। কাচাকতি ছিলো খাই খাই স্বভাবের। কাজেই তার ঝুড়িটি শূন্যই থাকলো। চিনার, মারফা, বরবটি যা হাতে পায় কাচাকতি কেবল খেয়ে ফেলে। কাঁচা-পাকা কোনটাই ধার ধারে না সে। যা হাতে পায় তাই খেয়ে ফেলে। এদিকে কুফুতি ভালো একটি চিনার পেয়ে বলে ওঠে-এ চিনারটি দাদী খাবে। সুন্দর একটি মারফা পেয়ে বলে ওঠে- এ মারফাটি মায়ে খাবে। মুঠি মুঠি বরবটি তুলতে তুলতে বলে ওঠে ঘরে গিয়ে বাপের জন্য গুদাক তরকারি রেধে দেবে ইত্যাদি।

এবার ঘরে ফেরার পালা। কাচাকতির ঝুড়িটি খালি আর কুফুতির ঝুড়ি তরিতরকারি শাক-সবজিতে পরিপূর্ণ। দিদির খালি ঝুড়ি দেখে ছোট বোন কুফুতি বললে- হ্যাঁরে দিদি, তোমার ঝুড়িটি খালি কেনো ? তুমি কি কিছুই তুলোনি? জবাবে দিদি কাচাকতি বললে-খুব করে তুলেছি। কুফুতি বললে- তা হলে ওগুলো কোথায় ? কাচাকতি বললে-ওগুলো সব পেটে। তা লক্ষ্মীবোনটি আমার তোমার ঝুড়ির ভেতর থেকে পাকা চিনারের গন্ধ পাচ্ছি। ওটা আমায় দে'না খেয়ে ফেলি। ছোটবোন আর রাগ সামলাতে না পেরে দিদিকে তিরস্কার করে বললে-তোমার

মতো রাক্ষুসি মেয়ে এ পৃথিবীতে আর একটিও নেই। অতগুলো চিনার, মারফা খেয়ে সব হজম করে ফেললে। তোমার কি মায়া-দয়া নেই। ঘরে তো আরো লোকজন আছে, ওরা খাবে কি ? দুই বোনের মধ্যে এক পশলা ঝগড়া হয়ে গেলো।

জুমের পথে ছিলো একটা বাঁশের সাঁকো। সাঁকোর নিচে সরোবর। দুই বোন সাঁকো পার হচ্ছে। কুফুতি আগে, কাচাকতি পেছনে। কাচাকতি ফের বললে- কুফুতি তোমার পাকা চিনারটি আমায় দেনা ভাই। এই বলে ছোটবোনের তরকারির ঝুড়িতে হাত দিলো কাচাকতি। কিন্তু কুফুতি দিতে নারাজ। সাঁকোর ওপর কাড়াকাড়ি লেগে গেল। হঠাৎ তাল সামলাতে না পেরে কুফুতি সাঁকো থেকে নিচে পড়ে গেলো। সরোবরে ছিলো একটা বোয়াল মাছ। সে কুফুতিকে পেয়ে গপাগপ গিলে ফেললো। কাচাকতি কি আর করবে। ছোটবোন কুফুতির তরকারির ঝুড়িটা নিয়ে বাড়ি ফিরলো। কাচাকতিকে একা বাড়ি ফিরতে দেখে মা জিজ্ঞেস করলো-কিরে কাচাকতি, একা বাড়িতে ফিরে এলি, কুফুতি কোথায় ? কাচাকতি কোনো জবাব দেয় না। চুপচাপ কেবল ঝুড়ি থেকে তরিতরকারি নামাতে থাকলো। মা ফের জিজ্ঞেস করলো-হারে কাচাকতি, কুফুতি যে এখনো ফিরলো না। এবার কাচাকতি জবাব দিলো তা আমি কি করবো। ও কামী রোয়াজার বাড়ি গেছে। ওখানে নাকি গান হচ্ছিলো। কিছুক্ষণ পর মা আবার জিজ্ঞেস করে- হ্যাঁরে কাচাকতি, কুফুতি যে এখনো ফিরলো না-ডেকে নিয়ে আয়। কাচাকতি বললে- আমি ডেকে নিয়ে আসবো কেনো। ও দাবেং বাড়ি গেছে ওখানে নাকি কারোর বিয়ে হচ্ছিলো। মা বারে বারে কুফুতির কথা জিজ্ঞেস করে আর কাচাকতি পোমাং বাড়ি গেছে, মরচুই বাড়ি গেছে- কী সব আবোল তাবোল জবাব দেয়। ঘরের উঠানে বেত তুলছিলো কাচাকতির বাবা। সে অনেকক্ষণ ধরে মা ও মেয়ের কথোপকথন শুনছিলো। মেয়ের জবাব শুনে তার সন্দেহ হলো-নিশ্চয় তার দুই মেয়ের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয়েছে। রাগেও অভিমানে ছোট মেয়ে হয়তো জুমক্ষেতে রয়ে গেছে। তাই মেয়েকে আনতে তৎক্ষণাৎ জুমক্ষেতে চলে গেলো। কিন্তু না। জুমে কোথাও কুফুতিকে খুঁজে পাওয়া গেলো না। ফেরার পথে যেই সাঁকো পার হতে যাবে-অমনি তার নজর পড়লো সরোবরের পানিতে একটা বিশাল বোয়াল মাছ হেলেদুলে সাঁতার কাটছে। মাছটি ধরার উদ্দেশ্যে সে বউকে চিৎকার করে ডেকে বললো-চৈ তবদি চৈ ? (ও বউ জাল নিয়ে এসো, জাল)। বউটা ছিলো অনেকটা কানে কালা। স্বামীর ডাক শুনে ঘরের ভেতর থেকে বাইরে এসে জবাব দিলো-দুলা ? স্বামী আবার চিৎকার করে-আরে দুলা না, দুলা না। জাল নিয়ে এসো,জাল। কিন্তু বউ শুনলো অন্য জিনিস। বললো-লাই আনবো।

স্বামী ফের চিৎকার পাড়ে-লাই না, লাই না। জাল। জাল নিয়ে এসো। স্বামী যতই জালের কথা চিৎকার পাড়ে কালা বউ শুনে ঢালা, কুলা, চালুনি, হাতা, খুন্তি ইত্যাদি। শেষে কাচাকতিই মাকে বলে দেয় : হাতা- খুন্তি তোমাকে নিতে হবে না। বাবা তোমাকে জাল নিতে বলছে। শেযে জাল নেয়া হলো। বোয়াল মাছ ধরে ডাঙায় তুলে ঘরে আনা হলো। বিশাল মাছ। পাড়া-পড়শিরাও এগিয়ে এলো। মাছের মাথা কাটা হলো বোয়াল মাছের পেট দেখে সবাই বলে উঠলো-না-জানি কতো বড়ই না ডিম হবে। পেট চিরে দুই ফালা করা হলো। কিন্তু একি! এ যে কুফুতি! ধরাধরি করে কুফুতিকে উঠানে কলাপাতা বিছিয়ে শুয়ে দেয়া হলো। বৈদ্য ডাকা হলো। বৈদ্য এসে কুফুতির নাকে মুখে শ্বাস ঢুকালো। গাছ-গাছালি আর লতাপাতা পিষে বুকে প্রলেপ দিলো। কুফুতি ধীরে ধীরে বেঁচে উঠলো। সুস্থ হয়ে ওঠার পর সবাই কুফুতির কাছে জানতে চাইলো- কি করে সে বোয়াল মাছের পেটে গেলো। কুফুতি আদ্যোপান্ত সব বলে দিলো। বড়দিদি কাচাকতিই তাকে ধাক্কা মেরে সাঁকো থেকে পানিতে ফেলে দিয়েছে। একথা শুনে পাড়া-পড়শিরা নিষ্ঠুর-নির্মম কাজের জন্য কাচাকতিকে মারতে গেলো। কিন্তু কাচাকতির বাবা সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললো, আপনারা এখন চলে যান। আমার মেয়ে, আমি দেখবো।

দিন যায়। কাচাকতির বাবা ঘরের উঠানে একটি বাঁশের খোঁয়াড় বানালো। কাচাকতি বাবাকে জিজ্ঞেস করে-বাবা, খোঁয়াড় দিয়ে কী হবে। বাবা জবাব দেয়, দাবেং বাড়ি থেকে একটা মাদী শুকর কিনেছি। ওটাকে খোঁয়াড়ে রাখবো। শুকরিটা দজ্জাল কিনা তাই মজবুত করে বাঁধছি। কাচাকতি পূর্বেকার ঘটে যাওয়া ঘটনাটি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলো। বাপকে বললে-বাবা শুকরিটা পরিচর্যা করার দায়িত্ব কিন্তু আমি নেবো। কুফুতি ছেলেমানুষ সে পারবে না। বাপ মেয়ের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বললো-আচ্ছা মা, এবার দেখো তো, খোঁয়াড়ের দরজাটা ছোট হয়েছে কি না। শুকরিটাকে ঢুকানো যাবে কি না। বাপের কথায় সায় দিয়ে কাচাকতি বলল-বাবা, দরজাটা ছোট হয়নি। ঢুকানো যাবে। বাপ বললে-আচ্ছা মা, তা আমি বুঝবো কি করে? তুমি একটু ঢুকে দেখাও তো? কাচাকতি বিনা দ্বিধায় তরতর করে খোঁয়াড়ের ভেতর ঢুকে গেলো। আর অমনি তার বাবা খোঁয়াড়ের মুখ বন্ধ করে দিয়ে বললো-মা আমার। দাবেং বাড়ির শুকরিটাকে আর আনছি না। তুমিই এ খোঁয়াড়ে থেকো। তোমার জন্যেই এটি বানানো হয়েছে। এ বলে কাচাকতির বাবা ঘরের ভেতর চলে গেলো।

কাচাকতি খোঁয়াড়ের মধ্যে বন্দি হয়ে র'লো। তাকে খাদ্যপানি কিছুই দেয়া হয় না। বুড়ি দাদী তার খাবারের অংশ বাঁচিয়ে লুকিয়ে রেখে খোঁয়াড়ে নিক্ষেপ করে

দিতো। ওটা খেয়ে, খোঁয়াড়ের ভেতর হেগে-মুতে কাচাকতি কংকালসার হয়ে বেঁচে রইলো। বাপের কঠোর নির্দেশ- কেউ কাচাকতির সাথে কথা বলতে পারবে না, সম্পর্ক রাখতে পারবে না। খাবার চাইলে খাবার দেয়া যাবে না। পানি চাইলে পানি দেয়া যাবে না। কাপড় চাইলে কাপড় দেয়া যাবে না। একদিন কাচাকতি গভীর রাতে বুড়ি দাদীকে ডেকে আকুতি জানালো তাকে যেন একটিবার মুক্ত করে দেয়। বুড়ি দাদী বললে ও কাচাকতি, লক্ষ্মী সোনা আমার, তোকে মুক্তি দিতে আমি অক্ষম। আমি তোর চেয়েও অসহায়। তোর বাপ জানতে পারলে আমাদের কারোর নিস্তার থাকবে না। তার চেয়ে বরং আমি তোকে একটি মুক্তির পথ বাতলে দিতে পারি। কিন্তু সে কাজটি বড়ই কঠিন। ওই কাজটি করতে পারলে মনুষ্য সমাজে তোর আর থাকা হবে না। পক্ষী সমাজেই তোর স্থান হবে। এছাড়া তোর আর উপায় বা কী আছে। বুড়ি দাদীর কথা শুনে কাচাকতি তীব্র আকুতি জানায়-দাদী সে পথ যতই কঠিন হোক আমি করবো। আমি মুক্তি চাই। মনুষ্যজীবন আমি আর চাই না। নাতনীর আহাজারি দেখে ও শুনে বুড়ি দাদী চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললে- ওহে দাদু আমার, সে বড়ই অবিচার কাজ। মনুষ্যকূলে জন্ম নিয়ে তুই আবার পক্ষী কুলে চলে যাবি, এমন কথা ভাবতেও তো গা শিউরে উঠছে। তোর জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়রে দাদু। তবে শোন, নাউই হলো পক্ষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠজাতি। নাউই পক্ষীর রাজা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক যাদুকর। ওই তান্ত্রিক যাদুরাজকে যদি তুই তোর অভিপ্রায় সম্পর্কে জানাতে পারিস, তাহলে সে তোকে যাদুর বলে মনুষ্যকুল থেকে পক্ষীকুলে স্থানান্তর করে নাউই পক্ষীরূপে রূপান্তর ঘটাতে পারে। শোন দাদু, শীতে নাউই পক্ষীরা খাদ্য অন্বেষণে ঝাঁকে ঝাঁকে দল বেঁধে পশ্চিম প্রান্তর থেকে পূর্বপ্রান্তে উড়ে যায়। তখন যদি তুই নাউইদের আকৃষ্ট করতে পারিস তা হলে তুই বন্দি জীবন থেকে মুক্তি পেলেও পেতে পারিস। সে বড়ই কঠিন কাজ রে দাদু। বড়ই কঠিন কাজ। বুড়ি দাদীর কথা শুনে কাচাকতি খোঁয়াড়ের ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করে-আচ্ছা দাদী, এখন কী মাস ? দাদী বলে কেন, এখন তো তালবাং (ভাদ্র) চলছে। আর তিনমাস পরেই তো শীতকাল আসছে।

শীতের অপেক্ষায় কাচাকতি খোঁয়াড়ে বন্দি অবস্থায় কালাতিপাত করতে লাগলো। বুড়ি দাদী নাতনীকে বাঁচিয়ে রাখতে নানা অজুহাতে খাদ্যের যোগান দিতে লাগলো। বুড়িকে একটা পাকা চিনার খেতে দিয়েছে তো বুড়ি ওটা নিক্ষেপ করে খোঁয়াড়ে। কেউ কথা তুললে বুড়ি বলে ওটা পচা ছিলো, পোকায় ধরা ছিলো। এমন নানা অজুহাত দেখাতো। দিনে দু'বেলা খেতে বসেছে বুড়ি, অমনি হিক্কা তুলে ভাতের থাল ফেলে দেয় খোঁয়াড়ের ভেতর। এতে কাচাকতি প্রাণে বেঁচে রইলো বটে,

ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না। বাপকে দেখলে কাচাকতি করজোড়ে আকুতি জানায়-বাবা গো, ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। পেটপুরে ভাত খেতে দিন। মেয়ের আকুতি শুনে বাপ ছোট কুফুতিকে ডেকে বলে-আমাদের এই আদরের শুকরিটার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। তাকে এক মোচা বিষ্ঠা এনে দে। ছোট মেয়ে পায়খানা ঘর থেকে কলাপাতায় মোচা বেঁধে বিষ্ঠা এনে খোঁয়াড়ে ফেলে দেয়। খোঁয়াড়ের পাশ দিয়ে পাড়া-পড়শিরা কেউ গেলে কাচাকতি করজোড়ে আকুতি জানায়-ওগো তোমরা আমাকে একটুখানি জল খেতে দাও। পাড়া-পড়শিরা অমনি খোঁয়াড়ের মাচার ওপর উঠে কাচাকতির মুখের ওপর প্রস্রাব করে দেয়। এসব দেখে শুনে বুড়ি দাদী হায় হায় করে উঠতো। কিন্তু তার কথা মানুষ শুনবে কেন!

মহাকষ্টে কাচাকতির জীবন অতিবাহিত হতে লাগলো। ভাদ্র মাস গেলো, আশ্বিন মাস গেলো, কার্তিক মাস গেলো, অগ্রহায়ণ মাস গেলো, এলো শীতকাল। কনকনে শীত। কুয়াশায় ভোরের সূর্য দেখা যায় না। কাচাকতি খোঁয়াড় থেকে আকাশে উঁকি মেরে দেখে নাউই পাখির দল যায় কিনা। প্রতিদিন আকাশে উঁকি মারে কাচাকতি। একদিন, দুইদিন, তিনদিন.... ক্রমান্বয় সাতদিন ধরে দেখলো- নাউই পাক্ষীর উড়ে যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। বুড়ি দাদীকে ডেকে জিজ্ঞেস করে-ও দাদী, কই নাউই তো উড়ে যাচ্ছে না। খোঁয়াড়ের ভেতর তিলে তিলে আমাকে কি মরতে হবে ? আমার কি মুক্তি হবে না ?

নাতনীর কথা শুনে বুড়ি দাদী কাঁপা হাত তুলে আকাশের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলে-ও দাদু, লক্ষীসোনা আমার অধৈর্য হয়ো না। সিবরাইকে (স্রষ্টা) ডাকো। তিনি মহান। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর আশীর্বাদে অবশ্যই তুমি মুক্তি পাবে।

বুড়ি দাদীর উপদেশ মতো কাচাকতি খোঁয়াড়ের ভেতর সমস্ত প্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে একাগ্র মনে বিরামহীনভাবে সিবরাইকে ডাকতে লাগলো। একদিন গেলো, দুইদিন গেলো, তিনদিনের মাথায় দেখা গেলো বিরাট দলবেঁধে নাউই পক্ষী গ্রামেরওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। নাউই দলকে উড়ে যেতে দেখে কাচাকতি খোঁয়াড়ের ভেতর থেকে গান গেয়ে ওঠে :

নাউই য়ৈ নাউই য়ৈ
আনৌ বেকারাং কালাংদি
আফা কিখ্রি বুথার না নাইয়ো
আনৌ উদুংঅী তেলাংদি।
নাউই য়ৈ নাউই...

[অনুবাদ : হে নাউই পাখি। আমি এক দুঃখিনী মেয়ে। পিতা আমার প্রতি রুষ্ট হয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছে। আমাকে দয়া করে তোমাদের একটি করে পালক

দিয়ে যাও। আমাকে তোমাদের সঙ্গে করে নাও।।

কাচাকতি চোখের পানি ফেলে নাউই পক্ষীর উদ্দেশ্য তার আকুতি জানালো। নাউই পক্ষীর দল গ্রামের ওপর একবার চক্কর মেরে উড়ে চলে গেলো। পরের দিন আবার নাউই পক্ষীর দল উড়ে এলো। কাচাকতি যথারীতি কেঁদে কেটে গান গেয়ে আবেদন জানালো। না, নাউই পক্ষীর-দল তার আবেদন শুনলো না। শুধু গ্রামের ওপর দু'বার চক্কর মেরে উড়ে চলে গেলো। তৃতীয় দিন আবারো নাউই পক্ষীর দল উড়ে এলো। কাচাকতি দু'হাত তুলে আবারো গান গেয়ে তার আবেদন জানালো। এবার নাউই দল তিনবার চক্কর দিলো। তারপর ধীরে ধীরে পূর্ব আকাশে চলে গেলো শুধু একটা বাদে। এ নাউইটি একাই বেশ কিছুক্ষণ আকাশে চক্কর দিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এসে খোঁয়াড়ের ওপর বসলো। নাউই পক্ষীটি কাচাকতিকে জিজ্ঞেস করলো-কে তুমি ? আর কেনই বা আমাদের উদ্দেশ্যে আমাদের পালকের জন্য আবেদন জানাচ্ছ! কী তোমার অভিপ্রায়। কাচাকতি বললো- হে নাউই পক্ষী, আমি এক দুঃখিনী মেয়ে। আমার বাবা আমার প্রতি রুষ্ট হয়ে খোঁয়াড়ে বন্দি করে রেখেছে। এই খোঁয়াড়েই আমাকে মরতে হবে। আমি মুক্তি পেতে চাই। তাই তোমাদের সহযোগিতা পাবার আশায় আমি আবেদন জানাই।

কাচাকতির কথা শুনে নাউই পক্ষীটি বললো- হে মনুষ্য নারী, তুমি হয়তো জানো না আমরা আমাদের সমগোত্রীয় জাত ছাড়া কাউকে সাহায্য-সহযোগিতা করি না। তুমি নিস্ফল আবেদন ত্যাগ করো। নাউই পক্ষীর কথা শুনে কাচাকতি বললো- হে সৌম্য, মনুষ্যকুলের প্রতি আমার চরম ঘৃণা উপস্থিত হয়েছে। আমি তোমাদের একজন হয়ে বাকী জীবন শেষ করতে চাই। এই আমার প্রতিজ্ঞা। নাউই যুবক আর কিছু কথা না বলে আকাশে উড়াল দিয়ে চলে গেল।

গেলো তো গেলো একেবারে নাউই যাদুকরের দরবারে গিয়ে হাজির হলো। নাউই যাদুকর আবার নাউই পক্ষীকূলের রাজাও। নাউই যুবক কাচাকতির সব আকুতি যাদুকরের কাছে বললো। সব শুনে নাউই রাজ বললো, মনুষ্য নারীর যখন এমন প্রতিজ্ঞা, তাকে সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য। আজ আমি নাউই পক্ষীকূলের উপর আদেশ জারী করে দিচ্ছি এ মর্মে যে, সকল নাউই পক্ষী প্রতিদিন একটি করে পালক কাচাকতিকে দিয়ে যাবে।

নাউই যাদুরাজের আদেশ হবার পর নাউই পক্ষীকূল প্রতিদিন পুব আকাশে উড়াল দিয়ে যাবার সময় কাচাকতির খোঁয়াড়ে পালক খসে দিয়ে যেত। সাতদিনের মাথায় অনেকগুলো পালক জমা হলো। একদিন কাচাকতি মাকে ডেকে সুঁই সুতা চাইলো। মা বলে সুঁই সুতা তো আমার কাছে নেই তোর বাপের কাছে চা।

বাপের কাছে চাইল। বাপ বলে, আমার কাছে নেই তোর দাদীর কাছে চা। দাদীর কাছে চাইল। দাদী বলল, ওরে পোড়া কপালী, তুই তাড়াতাড়ি মরে যা। এই বলে অনেক খোঁজাখুঁজির পর জং ধরা একটা সুঁই আর কিছু সুতা কাচাকতিকে এনে দিল। সুঁই সুতা পাবার পর কাচাকতি পালকগুলোর সেলাই কাজে লেগে গেল।

একদিন সকালে নাউই পক্ষীর দল আকাশে উড়াল দিয়ে চলে এলো। তাদেরকে দেখে কাচাকতি খোঁয়াড় থেকে কেঁদে কেঁদে গান গেয়ে উঠল, হে নাউইদল, অপেক্ষা করো, আমিও আসছি। এরপর কাচাকতি খোঁয়াড় থেকে সিবরাইকে স্মরণ করে সত্য বাক্য উচ্চারণ করল 'আমি যদি সতী মায়ের সন্তান হয়ে থাকি আর সিবরাইকে একাগ্র চিত্তে স্মরণ করে থাকি, এর শক্তির প্রভাবে বন্দী দশা থেকে আমার মুক্তি হোক। এই বলে কাচাকতি বাহুতে সেলাই করা নাউই পালক দিয়ে তিন ঝাপটা দিতেই খোঁয়াড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আর কাচাকতি ধীরে ধীরে উড়াল দিয়ে নাউই পক্ষী দলের সাথে ভিড়ে গেল। কাচাকতির এ কাণ্ড দেখে মা, বাবা ও বোন কত কাকুতি মিনতি জানাল। কিন্তু কাচাকতি কারোর কথা শুনল না।

শুধু আকাশ থেকে ছোট বোন কুফুতিকে উদ্দেশ্য করে বলল, কুফুতি, বোন আমার। তোমাকে বড় বেশী ভালোবাসতাম। শুধু তোমার জন্যে আমি একবার এসে দেখা করে যাবো। বিদায়, বিদায় ... নাউই হয়ে মনুষ্য নারী কাচাকতি নাউই রাজ্যে চলে গেল। নাউই যাদুরাজ বললো, তোমাকে আমি মনুষ্য নারী থেকে পক্ষী নারীতে রূপান্তর করে দিচ্ছি। এই বলে নাউই তীর্থে তিন বার ডুব দিতে বলল।

কাচাকতি নাউই যাদু রাজের আদেশ মতে প্রথম একটা ডুব দিল। এ ডুবে পায়ের তলা থেকে কোমর পর্যন্ত নাউই পক্ষীর পায়ের মত রূপান্তর হলো। এবার দ্বিতীয়বার ডুব দিল, এতে কোমর থেকে গলা পর্যন্ত সমস্ত শরীর নাউই পাখীর রূপ নিল। আর ...

এতে মাথা ছাড়া সমস্ত শরীরে পালক গজিয়ে পক্ষীতে রূপান্তর হলো। নাউইরাজ তাকে তৃতীয়বারের মতো ডুব দিতে বললো। এ আদেশে কাচাকতি হাত জোর করে বললো– হে নাউইরাজ। তৃতীয়বারের মতো আমি এখন ডুব দেবো না। আমি আমার ছোটবোনকে কথা দিয়ে এসেছি এক বছর পূর্ণ হলে আমি শেষবারের মতো তাদের দেখতে যাবো। আমার মাথা যদি পক্ষীরূপ ধারণ করে তা হলে তারা আমাকে চিনতে পারবে না এবং বিশ্বাসও করবে না। কাজেই আমি মনুষ্য মাথা নিয়ে বাপের বাড়ি যেতে চাই। নাউইরাজ বললো-ঠিক আছে, তাই হোক।

দিন যায়, মাস যায়, এক বছর পূর্ণ হলো। এলো শীতকাল। কুফুতি দিদির কথা ভুলেনি। প্রতিদিন সে আকাশ পানে তাকিয়ে দেখে নাউই পক্ষীর দল এলো কি না। একদিন সত্যি সত্যি নাউইপক্ষী দল আকাশে উড়াল দিয়ে চলে এলো। কুফুতি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে-ও নাউই দল, আমার দিদি ও বোনাই এসেছে কি ? আকাশ থেকে নাউই দল উত্তর দেয়, আমাদের সঙ্গে আসে নাই। আমরা আসার সময় তোমার দিদি ও বোনাই মদ-কাঞ্জি বানাচ্ছিল। তার পরের দিন নাউই পক্ষীর দল উড়ে এলে কুফুতি আবারো জিজ্ঞেস করে-ও নাউই দল, আমার দিদি ও বোনাই এসেছে কি ? নাউই দল আকাশ থেকে উত্তর দেয়-আমাদের সঙ্গে আসে নাই। আমরা আসার সময় তোমার দিদি ও বোনাই পিঠা তৈরি করতে ব্যস্ত ছিলো। পরের দিন নাউই দল এলে কুফুতি আবারো শুধায়-ও নাউইদল, আমার দিদি ও বোনাই এসেছে কি। নাউই পক্ষীরা উত্তর দেয়-আমাদের সঙ্গে আসে নাই। তবে আগামীকাল সন্ধ্যায় আসবে।

পরের দিন সন্ধ্যায় কাচাকতি ও তার জামাই বাপের বাড়ি বেড়াতে এলো। তাদেরকে দেখতে পাড়া-পড়শিরাও এসে জড়ো হলো। ঘরের উঠানে ছিলো একটা কাঁঠাল গাছ। কাচাকতি ও তার জামাই কাঁঠাল গাছের ডালে গিয়ে বসলো। পাড়া-পড়শিরা বলাবলি করতে লাগলো-ও কাচাকতি গাছের ডালে কেন। ঘরে এসে বসো। কাচাকতি ডানা ঝেড়ে বললো-আমরা পক্ষীজাত। গাছের ডালই আমাদের উপযুক্ত স্থান। তারপর কুফুতিকে ডেকে বললো- ও কুফুতি, বাপের জন্য মারকু চাউলের মদ বানিয়ে এনেছি, এ মদের চোঙাটা বাবাকে দাও। বিনি চালের পিঠা বানিয়েছি। এ পিঠার পুঁটলিটা মাকে দাও। বুড়িদাদীর জন্য পাগন চাউলের পিঠা নিয়ে এসেছি। এ পিঠার মোচাটা দাদীকে দাও। তোমার জন্যে লংকা বিনির পিঠা নিয়ে এসেছি,এ নাও তোমার ভাগটা। আর পাড়া-পড়শির জন্য এক কলসি কাঞ্জি নিয়ে এসেছি। এ কাঞ্জিটা পড়শিদের দাও।

কাচাকতি বাপের বাড়ি বেড়াতে এসে অনেক জিনিস নিয়ে এসেছে দেখে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। কাচাকতির বাবা মদের চোঙা মুখে পুরে এক গণ্ডুষ মদ পান করলো। অমনি চিৎকার করে উঠলো ওয়াক থু। মা পিঠার পুঁটলিটা খুলে একটা পিঠা মুখে দিতেই ওয়াক থু বলে বমি করে দিলো। কুফুতি তার ভাগের অংশমুখে দিতেই ওয়াক থু করে মুখের লালা ঝরাতে লাগলো। শুধু বুড়ি দাদীটা নিরবে পিঠা খেতে লাগলো।

সবাইকে নাজেহাল করে কাচাকতি পই পই করে বললো-ও বাপ। পানির তৃষ্ণায় যখন আমার বুক ফেটে যাচ্ছিলো তখন তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম। তুমি পানির বদলে মুত এনে দিয়েছিলে-এখন নাউইদের মুত খেতে কেমন লাগে?

মাকে উদ্দেশ করে বললো, ও মা। ক্ষিধায় যখন পেট জ্বলে যাচ্ছিলো তখন তোমার কাছে দু'মুঠো ভাত চেয়েছিলাম। তুমি ভাতের বদলে বিষ্ঠা এনে দিয়েছিলে। এখন নাউইদের নাদী দিয়ে তৈরি পিঠা খেতে কেমন লাগে? ছোট বোন কুফুতিকে বললো- আমি যখন ক্ষিধেয় কাতরাচ্ছিলাম তখন তোমার কাছে ভাত চেয়েছিলাম, তুমি ভাতের বদলে আমার মুখের ওপর শুকরের বিষ্ঠা ঢেলে দিয়েছিলে। এখন নাউই পক্ষীর বিষ্ঠা দিয়ে বানানো পিঠা খেতে কেমন লাগে? আর পাড়া-পড়শিদের উদ্দেশে কাচাকতি বললো ও পড়শিগণ, আমার বাবা আমার ওপর রুষ্ট হয়ে খোঁয়াড়ে বন্দি করেছিলো। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছিলো, তোমাদের কাছে পানি চেয়েছিলাম, তখন তোমরা খোঁয়াড়ের মাচার ওপর উঠে আমার মুখে মুতে দিয়েছিলে, এখন নাউই পক্ষীর মুত দিয়ে তৈরি কাঞ্জি খেতে কেমন লাগে? এ কথা বলে কাচাকতি খুব জোরে হা হা হি হি করে হাসতে লাগলো। হাসি থামিয়ে আবার বলে উঠলো-আমি তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নিলাম। প্রতিশোধ নিলাম। কাচাকতির এরূপ আচরণে সবাই নিরব হয়ে রইলো। কেউ মুখে রা শব্দটি বের করলো না। ছোট বোন কুফুতিকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো কাচাকতি- শোন কুফুতি, বুড়ি দাদীর কথা মতো আমি দাংদু বাজিয়ে সিবরাইকে আরাধনা করেছিলাম দুঃখ-দুর্গতি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। সিবরাই আমাকে তোমাদের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছে। তুমি যদি জীবনে কখনো দুঃখ পাও, বিপদে পড়ো তাহলে পরিত্রাণ পাবার জন্য দাংদু বাজিয়ে সিবরাই এর আরাধনা করো। তোমার প্রতি এই আমার উপদেশ থাকলো। বুড়ি দাদীকে তোমরা কখনও কষ্ট দিও না। তোমাদের সাথে আর কখনো আমার দেখা হবে না। জীবনের তরে বিদায় নিলাম, বিদায়। এই বলে কাচাকতি ও তার জামাই ধীরে ধীরে আকাশে উড়াল দিলো।

দাংদু যন্ত্র বাজিয়ে কাচাকতি সিবরাইকে আরাধনা করে দুঃখ-দুর্গতি থেকে মুক্তি পেয়েছিলো বলে ত্রিপুরা জনজীবনে আজও দাংদু বাজিয়ে সিবরাইকে আহবান করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে দুঃখ-দুর্গতিতে আক্রান্ত লোকেরা এখনও গভীর রাতে দাংদু বাজিয়ে সিবরাইকে আরাধনা করে থাকে। আর এটির নামাঙ্কিত হয়েছে 'নাউই বিল নাই'। ত্রিপুরা সঙ্গীতের অসংখ্য রাগ-রাগিনীর মধ্যে 'নাউই বিল নাই' বিশেষ স্থান দখল করে আছে। 'নাউই বিল নাই' রাগ বিরহের রাগ বলে বিবেচিত হয়।

কর্মলেখা

সত্য যুগের কথা। তখন নাকি ত্রিপুরা রাজা শ্রী শ্রী চন্দ্রমাদেব রাজত্ব করতেন। সে যুগে বর্তমান কালের মত যোগাযোগের ব্যবস্থা ভালো ছিলো না। শহর বন্দর ছিল গ্রাম থেকে অনেক অনেক মাইল দূরে। তাই সে যুগের লোকেরা একবার হাটে গিয়ে এক বছরের জন্য যা যা প্রয়োজন সব কিনে নিয়ে আসতো। অবশ্য সে যুগে চারিদিকে শান্তি ছিল-সাধারণ মানুষেরা সুখে-শান্তিতে বাস করত। আহার, বস্ত্র, বাসস্থানের অভাব ছিল না। মজার ব্যাপার হলো সে যুগে কেউ মিথ্যে কথা বলতে জানতো না।

তৈসামাই গ্রামের এক গৃহস্বামীর কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রয়োজন হওয়ায় রামগড় হাটে যাবার মনস্থ করল। কিন্তু ঘরে পোয়াতি বউ থাকাতে যাবারও ইচ্ছা ছিল না। না-জানি কখন প্রসব বেদনা শুরু হয়। সাত পাঁচ ভেবে সে হাটে যেতে মনস্থ করল এবং সঙ্গে কাউকে না নিয়ে একা একা হাটে রওনা দিল। রামগড় হাট ও তৈসামাই গ্রামের পথ আসা-যাওয়া করতে আট দিন সময় লাগতো। চারদিন অবিরাম হাঁটার পর গৃহস্বামী রামগড় হাটে গিয়ে পৌছল। যা যা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে একটা ঝুলিতে ভরে ফের বাড়ির অভিমুখে রওনা দিল। পথে রাত হওয়াতে ধারে কাছের একটা বিশাল বটগাছের তলায় রাত্রি যাপন করতে সে মনস্থ করল। ঝর্না থেকে জলপান করে বট গাছের শিকড়ে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল। রাত গভীর হলে গৃহস্বামীটি শুনতে পেল পাশের বিরাট গর্জন গাছটা বট-গাছটাকে উদ্দেশ্যে করে বলছে –"ও মারে (সই) তৈসামাই গ্রামের এক নারীর প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে। সবাই যাচ্ছে সেখানে। আমিও যাচ্ছি। তুমি যাবে নাকি ? বটগাছটি উত্তর দিল, না মারে। আমি আজ যেতে পারব না। আমার বাড়িতে আজ অতিথি রয়েছে। অতিথিকে একা রেখে আমি যাই কি করে ? তোমরা গিয়ে আমাকে ভালো মন্দের খবর জানাবে। এরপর চারিদিকে হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। গৃহস্বামী এ ধরনের আশ্চর্য কথা বার্তা শুনে শেষে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোর রাতে কিসের যেন ডাকাডাকিতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে শুনতে পেল পাশের গর্জন গাছটা বটগাছটাকে উদ্দেশ্যে করে বলছে" ও মারে জেগে আছ নাকি ?

বটগাছ উত্তর দিল, হ্যাঁ মারে জেগে আছি। তো কী খবর ? প্রসব ঠিকমত হয়েছে তো? গর্জন গাছটা উত্তর দিল, হ্যাঁ মারে প্রসবে তেমন অসুবিধা হয়নি। তবে নবজাতকের

কর্মলেখা ভালো নয়।
বটগাছ ফের জিজ্ঞাসা করল, কর্মলেখা কেমন ?
গর্জন গাছ বলল, নব জাতক হবে বলবান ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। যৌবন বয়সে সে দু'বার বিয়ে করবে। দুই বউয়ের মধ্যে ধান ভানার জন্য ঢেঁকি গাছ কাটতে সে জঙ্গলে যাবে এবং সেখানে বাঘের কামড়ে তার মৃত্যু হবে।
বটগাছ বলল, হায়, হায় এমন বলবান জাতকের কেন এত সকাল সকাল অকাল মৃত্যু হবে ? তোমরা এ ব্যাপারে কেউ কিছু করোনি?
গর্জন গাছটি বলে উঠল, আমরা তো খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্রহ্মার লেখা খণ্ডন করার কারোর সাহস হয়নি। তাই এটাই থেকে গেল।
গৃহস্বামী বটগাছের তলায় শুয়ে তাদের সব কথাবার্তা শুনল। মনে মনে ভাবল সেটা তার বউ ও নবজাতক সন্তান কিনা ? পরদিন ভোর হতেই সে দ্রুত রওনা দিল বাড়ির অভিমুখে। বেলা থাকতে সে বাড়িতে পৌঁছে গেল। গিয়ে দেখল সত্যি সত্যি তার একটা নবজাতক পুত্র সন্তান হয়েছে। প্রসবের সময় লগ্ন সব মিলিয়ে দেখল যে, বটগাছের তলায় সে যা শুনে এসেছিল তা সব মিলে যাচ্ছে। গৃহস্বামী সব জেনে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল। কিছুতেই সে তার ছেলেকে বাঘের হাতে মরতে দেবে না।
দিন যায় রাত আসে এমনি করে যথানিয়মে ছেলেটি বড় হয়ে বিয়ে করল। গৃহস্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেলে আরো একটা বিয়ে করল। বাবা সব কিছু লক্ষ্য করে চলল। একদিন ধান-ভানার জন্যে ঢেঁকি নিয়ে দুই বউয়ের লাগল ঝগড়া। ঝগড়া মিটাবার জন্যে একটা কুড়াল কাঁধে করে ছেলেটি ছুটলো জঙ্গলের দিকে। গৃহস্বামী প্রমাদ গুনলেন। বাপের বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সে ঢেঁকি গাছ কাটতে বনে গেল। গৃহস্বামীও একটা বড় কৃপাণ হাতে করে ছেলেকে অনুসরণ করল। ছেলে গভীর বনে ঢুকে ঢেঁকি গাছ কাটতে শুরু করল। আর গৃহস্বামী চুপিসারে লুকিয়ে রইল ছেলের পেছনে। হঠাৎ গৃহস্বামী দেখতে পেল ইয়া বড় গোঁফ ওয়ালা একটা বাঘ শিকারের উদ্দেশ্যে লেজ নাড়ছে। এবং ছেলেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গৃহস্বামীও প্রস্তুত ছিল। বাঘ লাফ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃপাণ দিয়ে সে বাঘকে কেটে দু'টুকরা করে ফেলল। এ হেন অবস্থা দেখে ছেলে হতভম্ব হয়ে বাপকে ব্যাপারটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। গৃহস্বামী ছেলেকে বিস্তারিতভাবে পূর্ব কাহিনী খুলে বলল। এতে অহংকারী ছেলে বাঘের মুখে থু থু ছিটিয়ে সজোরে কষে একটা লাথি মারল। এতে তার পায়ে বাঘের দাঁত বিধে গেল। দাঁতের বিষ আস্তে আস্তে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং হতভাগা ছেলেটি সেখানেই মৃত্যুবরণ করল।
এভাবেই বাঘ তার মৃত্যুর কারণ হলো। জন্ম দাতা পিতা মাতা কর্ম লেখে বিধাতা।

দাবেং পণ্ডিতের আক্কেল সেলামী

ত্রিপুরা রাজ্যের এক গল্পকার। তার নাম ছিল দাবেং। লোকটি নানান জনের কাছ থেকে সুকৌশলে নানান বিষয়ে গল্প শুনতো আর সে সব শোনা গল্পগুলো রাজ্যের আরেক প্রান্তে বড় বড় ধনী লোকদের শুনিয়ে টাকা কামাই করতো। এতে সুধীমহলে তার বেশ জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছিলো। আর এতে করে তার অহংকারবোধও অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছিলো। দাবেং গর্ব করে বলতো ত্রিপুরা রাজ্যে তার মতো পণ্ডিত দ্বিতীয়টি আর নেই। কিন্তু এক পশু শিকারী (ব্যাধ) কিছুতেই দাবেংয়ের দাবী স্বীকার করে না। ব্যাধের কথা হলো রাজ্যে দাবেংয়ের চেয়ে হাজারগুণ জ্ঞানী ও পণ্ডিত মানুষের অভাব নেই। দাবেং তো বাচাল প্রকৃতির লোকমাত্র। ব্যাধের কথা শুনে অতিশয় ক্ষিপ্ত হয়ে নিজকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য দাবেং করলো কি, নগরে নগরে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করে জানিয়ে দিলো, জীবনে কখনো শুনে নাই এমন গল্প যে ব্যক্তি তাকে শোনাতে পারবে তাকে পণ্ডিত স্বীকৃতি স্বরূপ দু'আড়ি পরিমাপে রূপার রাং মেপে দেবে। রাং অর্থ টাকা। ত্রিপুরা রাজ্যে মুদ্রাকে রাং বলে।

এদিকে দাবেংয়ের ঘোষণা শুনে সহস্র সহস্র লোকজন আসতে শুরু করলো দাবেংকে গল্প শোনাবার জন্যে। কিন্তু দাবেং নানান উছিলা দেখিয়ে বলতো, আরে ধ্যুৎ, এটা আমার অনেক আগেকার শোনা গল্প। গর্ব করে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতো, এমন কোনো গল্প বলো যা আমি কোনদিন শুনি নি। সহস্র সহস্র লোক এসে তাকে গল্প শোনাতো কিন্তু দাবেং সবাইকে একটি কথা বলে বিদায় করতো, আহা এ গল্প তো আমার অনেক আগেকার শোনা গল্প। বাজে গল্প বলে আমার সময় নষ্ট করলে।

একদিন রাজ্যের বিরাশি মুড়ার উত্তর প্রান্তর থেকে এক অচাই এসে বললো, ভাই আমি আপনার ঘোষণার কথা শুনেছি। আজ আমি অতীতে ঘটে যাওয়া একটি গল্প শোনাতে এসেছি। আমার গল্প নিছক একটি বাস্তব ঘটনা বৈ আর কিছু নয়।

দাবেং গর্ব করে বলল, আরে তোমার বয়ান রাখো। কী বলতে চাও বলো দেখি শুনি।

অচাই বলতে শুরু করলো, আজ থেকে প্রায় একশত বছর আগে আমার পিতামহ

একবার আপনাদের মুল্লুকের ধারে কাছে গিয়ে জুম চাষ করেছিলেন। আমার পিতামহ একজন দক্ষ কারুশিল্পী ছিলেন। বাঁশ ও বেত দিয়ে নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর গৃহস্থালী দ্রব্য বানাতে পারতেন। পিতামহ এমন নিখুঁতভাবে বেত ছাঁচতেন যে, তা নিজের চোখের পাতার উপর টেনে পরীক্ষা করতেন বেত মসৃন হলো কিনা। এভাবে নানান দ্রব্য বানিয়ে এবং সেগুলো হাটে বিক্রি করে পিতামহ ধনী মানুষে পরিগণিত হয়েছিলেন।

একদিন হয়েছিল কী। পিতামহর শরীর অসুস্থ বোধ হওয়ায় কাজে ক্ষান্ত দিয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় দাদী জুম থেকে ফিরে এসে পিতামহকে শোয়া দেখে তিরস্কার করে বললেন – এই কুড়ের পাতশাকে (বাদশা) দিয়ে কোনো কাজই হবে না। এতোদিন পই পই করে বললাম আমার খুমচকগ্রীটা বানিয়ে দিতে কিন্তু পাতশা বেটা কেবল শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছেন। (খুমচকগ্রী মানে ফুলের সাজি না)।

পিতামহ বুড়ির প্যানপ্যানানিতে অসহ্য হয়ে বেত ছাঁচতে শুরু করলেন। বেতটি মসৃণ হয়েছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে যেই চোখের পাতার উপর টান দিলেন অমনি চিন্ করে ব্যাথা পেলেন। বেতের ছোট্ট একটি আঁশ শলা চোখে বিঁধে গিয়েছিলো। অনেক চেষ্টা করেও তা উঠানো সম্ভব হয়নি। বেতের আঁশ শলাটি চোখে থেকেই গিয়েছিলো। পরের দিন ঘরের সবাই দেখলো পিতামহের আঘাত প্রাপ্ত চোখটি সবুজ আবরণে ছেয়ে গেছে। এরপর দু'দিন যেতে না যেতেই চোখে একটি বাঁশের চারা গজিয়ে উঠলো। তার পাশে আরো একটি চারা এভাবে পিতামহের একটি চোখ বাঁশ বনে পরিণত হলো। পিতামহ সেই বাঁশ বন থেকে বাঁশ কেটে, বেত ছেঁচে নানান দ্রব্য বানিয়ে প্রচুর টাকা পয়সা উপার্জন করেছিলেন। একবার রাজ্যে অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিলো। দুর্ভিক্ষ হয়েছিলো। শত সহস্র লোক মারা গিয়েছিলো খেতে না পেয়ে। কিন্তু পিতামহের কোনো প্রকার চিন্তা ছিলো না। উপার্জিত অর্থ দিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে খেয়ে পরে বেঁচেছিলেন। সেই বছরে আপনার দাদু লেবাংফা আমার পিতামহের কাছে চার আড়ি পরিমাপের রাং কর্জ নিয়েছিলেন। কর্জ নেয়ার সময় শর্ত ছিলো আপনার দাদু জীবদ্দশায় যদি কর্জ পরিশোধ করে যেতে না পারেন তা হলে তার নাতিপুতিরা পরিশোধ করে দেবে। কিন্তু, আপনার দাদুর একান্ত দুর্ভাগ্য যে, কর্জ শোধ না করে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে নরকে চলে গেলেন। আপনার দাদুর এই কাহিনী আপনি কী কখনো শুনেছেন!

তখন উপস্থিত দর্শক শ্রোতা দাবেংকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো,

দাবেং মশাই, আপনার দাদুর নাম কি লেবাংফা ?

দাবেং চাতুরী দেখাতে পারলো না। বললে, হ্যাঁ আমার দাদুর নাম লেবাংফা। দর্শক শ্রোতাদের মধ্য থেকে আরেকজন জিজ্ঞাসা করলেন, দাবেং মশাই, আপনার দাদু কি কলেরায় মারা গেছেন ?

দাবেং উত্তর দিলেন – হ্যাঁ। চার আড়ি পরিমাপের টাকা কর্জ নিয়েছিলেন আপনার দাদু এ কাহিনী কি সত্যি ?

এ প্রশ্নে দাবেং পড়লো মহাবিপদে। যদি বলে শুনেছি, তা হলে চার আড়ি পরিমাপের টাকা পরিশোধ করতে হয়। আর যদি বলে, শুনি নাই – তারপরও নিজের পূর্ব ঘোষণা মতে দু' আড়ি পরিমাপের টাকা দিতে হয়। উভয় সংকটে পড়ে দাবেং বুদ্ধি করে বললো, চোখের ভেতর বাঁশ বন জন্মাতে পারে এমন সব আজগুবি কাহিনী আমার চৌদ্দ পুরুষও শোনেনি। তুমি একটা বানোয়াট কাহিনী বলে আমাকে শুনিয়েছো।

তখন উপস্থিত দর্শক শ্রোতা বলে উঠলো, গল্পটি যখন আপনি শোনেননি তা হলে তো শর্ত মতে অচাইকে দু'আড়ি পরিমাপের রূপার রাং মেপে দিতে হয়। দাবেং আর কি করবে, নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা, বুঝতে পেরে শর্তানুযায়ী অচাইকে দু'আড়ি পরিমাপের রাং আক্কেল সেলামী দিতে বাধ্য হলেন।

পুণ্য ফল

ত্রিপুরা রাজা চিত্র সেন এর রাজত্বকালে তাঁর রাজ্যের পূর্ব প্রান্তর বরাবর তৈ-কুচুক নামের এক গ্রামে এক অন্ধ অচাই বাস করতেন। অন্ধ অচাইয়ের ছিল একটি মাত্র কন্যা। কন্যা সন্তানটি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ভিক্ষা করত আর ভিক্ষালব্ধ মুষ্ঠি চাল ও অর্থ দিয়ে অন্ধ পিতাকে পালন করতো। ক্রমে ক্রমে কন্যাটি কিশোরী প্রাপ্ত হলে সে একদিন এক ভিন গ্রামীণের বাড়িতে ঝি-এর চাকরী নিল। তৈ-কুচুক গ্রাম থেকে ভিন গ্রামীণের বাড়ির দূরত্ব ছিল প্রায় তিন মাইল এবং বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কন্যাটি প্রতিদিন সকাল তিন মাইল বনপথ হেঁটে গ্রামীণের বাড়িতে কাজ করতে যেতো আবার সন্ধ্যায় নিজ কুটিরে এসে অন্ধ পিতাকে রান্না বান্না করে খাওয়াতো। এভাবে তাদের দিন যাচ্ছিল।

একদিন কন্যাটি খুব ভোর থাকতে তার মনিবের বাড়িতে রওনা দিল। পথে প্রকৃতির ডাক পড়লো। কন্যাটি জঙ্গলে প্রবেশ করলো। কিন্তু জঙ্গলের ভেতর গিয়ে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো। সে দেখলো একটা পুরাতন শিব মন্দির সেখানে রয়েছে। চারিদিকে বন্য গাছ গাছড়াও লতা পাতায় জড়ানো। ভেতরটা পরিস্কার। মন্দিরের ভেতর উঁচু করে একখানা বেদী। বেদীর উপর মহাদেবের প্রতিকৃতি। বাহির থেকে বুঝা যায় না যে এ বনে একটি শিব মন্দির বিদ্যমান। এহেন অবস্থা দেখে কন্যাটি প্রকৃতির ডাক ভুলে গিয়ে মন্দির পরিচর্যার কাজে লেগে গেলো সে মন্দিরে জড়ানো লতাপাতা টেনে ঝাড়-ফু দিয়ে পরিস্কার করলো এবং এক জোড়া বুনো ফুল দিয়ে মহাদেবের অর্চ্চনা করলো। মন্দির সংস্কারের কাজে ব্যস্ত থাকায় সেদিন গ্রামীণের বাড়িতে পৌঁছতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গ্রামীণ কিছুই বলল না। ভোরের বেলায় মন্দিরে গিয়ে পূজা অর্চ্চনা করতে কন্যাটির অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সে গ্রামীণের বাড়িতে যাবার পথে একবার আবার সন্ধ্যায় ফিরে আসার সময় আরেকবার মন্দিরে প্রবেশ করে মহাদেবের পায়ের কাছে এক জোড়া বুনোফুল ও দ্বীপ জ্বালিয়ে আসত। এতে তার গ্রামীণের বাড়িতে পৌঁছতে যেমন দেরী হতো তেমনি নিজ কুটিরে ফিরতেও তার রাত হতো।

একদিন কন্যাটি কুটিরে ফিরতে অধিক রাত হওয়ায় তার অন্ধ বাবা বিপদাশঙ্কা

অনুমান করে পথে বেরিয়ে পড়লো। একে তো অন্ধ মানুষ তার উপর অমাবশ্যার রাত। অন্ধ অচাইয়ের একটা পা হঠাৎ গর্তের ভেতর পড়ে গেল। এবং আঘাত পেয়ে সে আর্তনাদ করতে লাগল। ঠিক ঐ সময় সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক সন্ন্যাসী। অন্ধের বেগতিক অবস্থা দেখে তাঁর করুণা হল এবং অন্ধকে সেবা শুশ্রূষা করে রাতে পথে বের হবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অন্ধ অচাই তার দুঃখের কথা বিস্তারিতভাবে সন্ন্যাসীকে বর্ণনা করলো। সব কথা শুনে সন্ন্যাসী বললেন, তোমার দুঃখ মোচন সম্ভব হতে পারে যদি তুমি তোমার এই কুটিরের পূর্ব দিকের বনে অবহেলায় পড়ে থাকা মহাদেবের মন্দিরটি সংস্কারের জন্য একশত মুদ্রা দান করতে পারো। সন্ন্যাসীর কথা শুনে অসহায় অন্ধ অচাই অকল্পনীয় সামর্থ্যের কথা চিন্তা করতে গিয়ে কোন উত্তর দিতে পারল না। সন্ন্যাসী অন্ধ অচাইকে তার কুটিরে পৌঁছে দিয়ে নিজ পথে গমন করলেন। কিছুক্ষণ পর অন্ধ অচাইয়ের কন্যা কুটিরে ফিরলে পর অন্ধ অচাই সন্ন্যাসীর কথা তার মেয়েকে খুলে বলল। সে মেয়েকে এও বলল যে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সন্ন্যাসী কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারে না এবং একশত মুদ্রা মহাদেবের মন্দির সংস্কারের জন্য দান করতে পারলে নিশ্চয়ই তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব হবে এবং তার অন্ধত্ব মোচন হবে। পিতার কথা শুনে কন্যাটি অসহায় চোখে তাকানো ছাড়া আর কোন জবাব দিতে পারল না।

একদিন অমাবশ্যা তিথিতে কন্যাটি সূর্য উঠার আগে গ্রামীণের বাড়ির উদ্দেশ্যে বন পথ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়লো কতিপয় লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। কন্যাটি পালালো না। সে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। সে দেখল পাঁচজন সন্ন্যাসী তাকে দেখে দাঁড়িয়েছে। তাদের একজন তাকে প্রশ্ন করল,

– কন্যা – তুমি এই ভোর সকালে কোথায় যাচ্ছ ?

– আমি ভিন গ্রামীণের বাড়িতে যাচ্ছি। সেখানে আমি ঝি এর কাজ করি।

– তোমার কি কেউ নেই ? এই যেমন মা-বাবা-ভাই বোন ?

– না। এক অন্ধ বাবা ছাড়া তিনকূলে আমার কেউ নেই। আমি মানুষের বাড়িতে কাজ করে বাবাকে পালন করি। দয়া করে পথ ছাড়ুন। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। কন্যাটির কথা শুনে পাঁচজন সন্ন্যাসী নিজেদের মধ্যে কি যেন ফিসফিস করে আলাপ করলো। তারপর ফের একজন বলে উঠল, আমরা সন্ন্যাসী। আমাদের নিত্য দিন পূজা অর্চ্চনা করতে হয়। পূজার উপকরণ সাজিয়ে দেয়ার জন্য আমরা তোমার মত একজন ষোড়শী কন্যা খুঁজছি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো আমাদের সাথে আসতে পারো। তোমাকে এ কাজের জন্য মাসিক একশত মুদ্রা

আমরা প্রদান করবো।

– একশত মুদ্রা ?

– হ্যাঁ। একশত মুদ্রা তুমি প্রতি মাসে পাবে।

কন্যাটি আর কোন চিন্তা করতে পারলো না। তার একশত মুদ্রা চাই। একশত মুদ্রা দান করতে পারলে তার বাবার অন্ধত্ব ঘুচবে, তাদের দুঃখ দুর্দশা আর থাকবে না। কাজেই সে রাজী হয়ে গেল। পাঁচজন সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সে অগ্রিম একশত মুদ্রা গ্রহণ করলো এবং মহাদেবের মন্দির সংস্কারের জন্য দান করে ফেলল। কন্যাটি সেদিন আর গ্রামীণের বাড়িতে না গিয়ে নিজ কুটিরে ফিরে এলো। কুটিরে এসে সে পিতাকে সব কিছু খুলে বলল। কন্যার কথা শুনে অন্ধ অচাই ডুকরে কেঁদে উঠলো, বললে মাগো – তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। আমার চোখ ভাল হওয়ার প্রয়োজন নেই।

তুমি ঐ একশত মুদ্রা সন্ন্যাসীদের ফেরত দিয়ে এসো। এই বলে অন্ধ অচাই অজ্ঞান হয়ে পড়লো। কন্যাটি অতি কষ্টে পিতার মাথায় ও বুকে জল সিঞ্চন করতে করতে জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। পিতাকে বলল,

– বাবা আমি তো চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছি না। শুধুমাত্র এক মাসের জন্য তাদের কাজ করবো। তারপর আবার তোমার কাছেই তো চলে আসবো।

– আমি কিছুই জানি না মাগো। মহান ঈশ্বর তোমায় মঙ্গল করুণ।

কন্যাটি সেদিন যত্ন সহকারে রান্না করে পিতাকে খাওয়ালো। ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া কাঁথা-জোড়াতালি দিয়ে সেলাই করল এবং তার অবর্তমানে কি কি করতে হবে সব কিছু পিতাকে শিখিয়ে দিল। পরের দিন খুব ভোরে কন্যাটি পিতাকে একা কুটিরে রেখে সন্ন্যাসীদের সাথে চলে গেল। সন্ন্যাসীরা ছিল তান্ত্রিক সাধক। যোগিক সাধনা সিদ্ধি লাভের জন্য তারা এরূপ সুবর্ণা, সুলক্ষনাযুক্ত ষোড়শীর খোঁজে বেড়াচ্ছিল। ঘোর অমাবশ্যার রাত্রে পূজার বেদীতে সুলক্ষনাযুক্ত সুন্দরী কন্যা বলি দিতে পারলে তাদের সিদ্ধি লাভ হবে। তাই তারা একশত মুদ্রার লোভ দেখিয়ে কন্যাটিকে বাগে আনতে পেরেছিল। অপরদিকে সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের কার্যকলাপ দেখার জন্য ত্রিপুরা রাজকুমার তাদেরই অনুসরণ করছিল। সন্ন্যাসীরা গভীর বনে এসে আস্তানা করল এবং রাত বাড়ার সাথে সাথে তান্ত্রিক পূজায় মেতে উঠলো। কন্যাটির জীবনাশংকায় রাজকুমার প্রমাদ গুণলেন। রাত তৃতীয় প্রহরে সন্ন্যাসীরা কন্যাটিকে পাশের ঝর্নায় নিয়ে গিয়ে স্নান করালো এবং নতুন কাপড় পড়তে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে কন্যাটিকে পূজার বেদীতে প্রণাম করতে বললে তার প্রাণ রক্ষা করার জন্য রাজকুমার আর চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি নিজে যাদুমন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তাৎক্ষণিক বাঘের রূপ ধারণ করে

পূজার স্থলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সন্ন্যাসীরা অবস্থা বেগতিক দেখে কন্যাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গাছে আরোহন করল। বাঘও নাছোড়বান্দা। গাছে আরোহণ করার সেও কসরত করতে লাগলো। উপায়ন্তর না দেখে একজন সন্ন্যাসী বলে উঠল, কন্যাকে মাটিতে ফেলে দিন। বাঘ তাকে মেরে মাংস ভক্ষণ করে উদরপূর্তি করে চলে যাক। নতুবা আমাদের কারোর নিস্তার নেই। সন্ন্যাসীরা বাধ্য হয়ে কন্যাটিকে মাটিতে বাঘের সামনে নিক্ষেপ করল। মুহূর্তে বাঘ কন্যাটিকে গ্রাস করে বনে ঢুকে পড়ল। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা বাঘের হাত থেকে রেহাই পেল। কন্যাটি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো তখন সে দেখতে পেল-গভীর বনে একজন বলিষ্ঠ যুবকের পাশে সে শুয়ে আছে। যুবকটি তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে। তার কাছে সবকিছু স্বপ্ন বলে মনে হল।

– আমি বুঝতে পারছি তুমি অবাক হয়েছো ? কেমন করে এখানে এসেছো –আমিই বা কে এই তো?

– হ্যাঁ।

– বলছি শোন। আমি তোমার সব কথা জানি। পূজায় সহায়তা করার জন্যে যে সন্ন্যাসীরা তোমাকে এনেছিল তারা ছিল তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। পূজার বেদীতে তোমাকে বলি দিয়ে তারা যোগিক সিদ্ধি লাভ করত আর অকালে তুমি প্রাণ হারাতে। আমি তাদেরকে অনুসরণ করে এসেছিলাম। আমি এ রাজ্যের যুবরাজ। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি তোমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাই। কন্যাটি লজ্জায় মাথা অবনত করে আস্তে আস্তে বলল,

– আপনি আমার উদ্ধারকর্তা। আপনি আমার মতো একজন দুঃখীনি কন্যাকে বিয়ে করতে চাইছেন এতো আমার সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু ... এত সৌভাগ্য কি আমার কপালে সইবে ?

যুবরাজ আর দেরী না করে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। বিয়ের আয়োজন করে মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, আমার এ বিবাহ উৎসবে রাজ্যের সব অন্ধ লোকদের নিমন্ত্রণ করুন। শুভদিনে যথারীতি বিবাহ কার্য সমাধা হল। রাজা ও রানী সানন্দে কন্যাটিকে পুত্রবধু হিসাবে গ্রহণ করলেন। রাজ্যের অগণিত অতিথিদের আপ্যায়ন চলতে লাগলো। কন্যাটি পথের দিকে নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইল যদি তার অন্ধ পিতা আসে এ প্রতীক্ষায়। সত্যিই সত্যিই তার পিতাকে আসতে দেখে কন্যাটি তার অন্ধ বাবাকে জড়িয়ে ধরলো এবং বলল বাবা আমি তোমার মেয়ে। এখন এ রাজ্যের যুবরানী। মেয়েকে চিনতে পেরে অন্ধ অচাই ডুকরে কেঁদে উঠলো। বার বার আশীর্বাদ করতে লাগলো। যুবরাজ কাছে এসে নিজের পরিচয়

দিয়ে বললেন, বাবা আমি আপনার কন্যার স্বামী। এ রাজ্যের যুবরাজ। আপনি আমাকে পদধুলি দিন।

অন্ধ অচাই রাজ জামাতাকে আশীর্বাদ করলেন। স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে পুরাতন মহাদেবের মন্দির পুনঃ সংস্কার করে পূজা অর্চ্চনার যাবতীয় ব্যবস্থাদি করলেন যুবরাজ। অন্ধ অচাই মহাদেবের প্রতিকৃতি ছোঁয়া মাত্রই অন্ধত্ব মোচন হল। পুনঃবার এই সুন্দর পৃথিবীকে দেখতে পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। চারিদিকে খুশির বন্যা বইলো। কন্যার পুণ্যফলের গুণে অন্ধ অচাই তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলো। পরবর্তীতে যুবরাজ সে দেশেরই রাজা হয়ে অনেক পুণ্য কাজ করে অমর হয়ে রইলেন। আর কন্যাটি হলেন দয়ামতী রাণী।

ভূত ও মদের কাহিনী

অনেক অনেক দিন আগের কথা। সে সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা শুক্রদেব ছিলেন অতিশয় ধার্মিক ও প্রজা বৎসল রাজা। রাজা শুক্রদেব সব সময় তাঁর রাজ্যবাসী সকল প্রজাদের মঙ্গল কামনা করতেন এবং প্রতিদিন রাজ্যের আনাচে কানাচে গুপ্তচর পাঠিয়ে প্রজাদের সুখ দুঃখের খবরাখবর নিতেন। এমন রাজার রাজত্বকালে একদিন এক গুপ্তচর দরবারে এসে রাজাকে কুর্নিশ করে বললেন,মহারাজা একটি দুঃসংবাদ।

রাজা শুক্রদেব বললেন,গুপ্তচর, তুমি নির্ভয়ে বলো। কি এমন দুঃসংবাদ।

গুপ্তচর বললেন, মহারাজ! রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে বসবাসকারী প্রজারা ভূতের অত্যাচারে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। ভূতেরা এমন অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে যে, মেয়েরা ঝর্ণায় পানি আনতে গেলে ঢেলা ছুড়ে কলসি ভেঙে দেয়। লোকেরা খেতে বসলে ভাতের হাঁড়িতে মল বিষ্ঠা গুলিয়ে দেয়। কেউ ঘুমালে চুল ধরে টানাটানি করে। কেউ নীরবে বসে থাকলে তাকে সুড়সুড়ি দেয়। আরো কত কি অত্যাচার।

গুপ্তচরের মুখে ভূতের অত্যাচারের কাহিনী শুনে রাজা শুক্রদেব কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন,ভূতের অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে প্রজারা কিছুই করেনি ?

গুপ্তচর বললেন, মহারাজ। করেছে। দক্ষিণ অঞ্চলের নারাণ (নারাণ: আগেকার দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে আঞ্চলিক শাসনকর্তাকে নারাণ বলে) আগুন জ্বালিয়ে ভূত তাড়াবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এতে ভূতেরা ক্ষেপে গিয়ে নারাণকে এলোপাতাড়ি ঢিল ছুঁড়ে মেরে ফেলেছে। এ অবস্থা দেখে প্রজারা আর ভূত তাড়াবার সাহস করেনি। মহারাজা! আপনার রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চল মূলত:এখন ভূতের রাজত্ব চলছে। রাজা শুক্রদেব গুপ্তচরকে বিদায় দিয়ে দরবার আহবান করলেন। বুড়োমন্ত্রী, সেনাপতি,পাত্রমিত্র জ্ঞানীগুণী মিলে তিনদিন তিনরাত্রি সভা করলেন। কিন্তু কেউ ভূত তাড়াবার কার্যকর সিদ্ধান্ত দিতে পারল না। সেনাপতি বললেন, মহারাজ,ভূতের সংগে যুদ্ধও

করা যায় না। কারণ তাদেরকে দেখা যায় না। অদৃশ্যের কারণে তারা দিব্যি লোকালয়ে চলাফেরা করতে পারে। একজন পাত্র বললেন, মহারাজ, সেনাপতি মহোদয়ের কথাটা ঠিক। এখন আমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি ভূত তাড়াবার পরিকল্পনা গ্রহন করে এবং ভূতেরা যদি জানতে পারে তাহলে তারও বিপদ হতে পারে।

পাত্র মিত্রের কথা শুনে রাজা শুক্রদেব হুংকার দিয়ে উঠলেন। তার মানে তোমরা বলতে চাও এই সোনার ত্রিপুরা রাজ্যে ভূতের রাজত্ব চলুক। আর আমরা ভূতের গোলামগিরি করে জীবন কাটাবো ? এ অসম্ভব। যেমন করে হোক ভূতের অত্যাচার থেকে প্রজাদের উদ্ধার করতে হবে। মন্ত্রী মহোদয়! এ যাবত আপনি কিছু বলছেন না। আমি আপনার কথা শুনতে চাই। আর তা না হলে আমি আপনাদের জ্যান্ত পুঁতে রাখার নির্দেশ দেবো।

রাজার তেজোদীপ্ত কথা শুনে বুড়োমন্ত্রী হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে বললেন,মহারাজ! ভূতের সঙ্গে লড়াই করা কঠিন ব্যাপার। তাদের সঙ্গে সন্ধিও করা যায় না। আবার বশ্যতাও স্বীকার করা যায় না। মহারাজ! আপনি অনুমতি দিলে আমি এই মর্মে একটি ঘোষণা জারি করতে পারি যে,'যে ব্যক্তি ৭ দিনের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ভূত তাড়াতে পারবে কিংবা তাদের শায়েস্তা করতে পারবে তাকে রাজ দরবারের সভা পণ্ডিত মর্যাদায় ভূষিত করা হবে এবং একটি অঞ্চলের জায়গীর প্রদান করা হবে। সেই সাথে ত্রিপুরার ইতিহাসে ঐ ব্যক্তিকে বিশেষ গুণীব্যক্তি হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে।' বুড়ো মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা শুক্রদেব বললেন, উত্তম! মন্ত্রী মহোদয়, আপনি এক্ষুনি আমার আদেশ ও প্রতিজ্ঞা জারি করে দেবার ব্যবস্থা করুন। অত্যাচারী ভূতদের শায়েস্তা করা চাই-ই চাই। বুড়ো মন্ত্রী অনুমতি পেয়ে রাজার আদেশ ও প্রতিজ্ঞা রাজ্যময় ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করে দিলেন। রাজার আদেশ ভূতদের কানেও পৌছল। রাজার আদেশ শুনে টেংরা ভূত, গোয়াং ভূত, চুংচুং ভূত, ছেঁ ছেঁ ভূত- সব ভূতের গোষ্ঠী মিলে নাচানাচি করতে লাগলো আর বলতো লাগলো মানুষের শক্তি কতটুকু তারা ৭ দিনের মধ্যে দেখে নেবে। তারপর দক্ষিণ অঞ্চল থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে অত্যাচার শুরু করে দেবে। দেখি মনুষ্য রাজার শক্তি কত ?

এদিকে রাজ্যের উত্তর প্রান্ত সীমানায় বিশাল এক বট গাছের তলায় একতান্ত্রিক বৈদ্য বাস করতেন। বয়সের ভারে চুল দাঁড়ি সাদা হয়ে

গিয়েছিলো। তেমন চলাফেরা করতেও পারে না। সেই বুড়ো তান্ত্রিক বৈদ্যের কানেও রাজার ঘোষণা পৌছুল। ধার্মিক রাজার ঘোষণা শুনে বুড়ো বৈদ্য ভাবলেন সে ব্যতীত আর কোনো ব্যক্তি ভূতদের শায়েস্তা করতে পারবে না। আশি বছর ধরে তান্ত্রিক বৈদ্য ভূত-প্রেত, জ্বীন, পরী, সিংগী, মাংগী প্রভৃতির উপর তপ, সাধনা করে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি অর্জন করেছে। প্রজার কর্তব্য রাজার আদেশ পালন করা। তাই বুড়ো তান্ত্রিক বৈদ্য আর দেরী না করে রাজধানীর দিকে রওয়ানা দিলেন। রাজধানী সে তো অনেক দূরের পথ।

এদিকে একদিন দুইদিন তিনদিন করে ছয় দিন পার হয়ে গেলো কোন ব্যক্তি ভূত তাড়াবার সাহস নিয়ে এগিয়ে এলো না। আর ভূতরা মহানন্দে রাজ্যময় অত্যাচার শুরু করে দিল। রাজার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। রাজা হয়েও প্রজাদের মঙ্গল সাধন করতে পারছেন না এ চিন্তায় দরবার হলে পায়চারী করতে লাগলেন। বুড়ো মন্ত্রী, পাত্র মিত্র-জ্ঞানী গুণীদের মুখে রা শব্দটি নেই। এমন সময় বুড়ো তান্ত্রিক বৈদ্য হাঁপাতে হাঁপাতে দরবারে হাজির হলেন। রাজাকে কুর্নিশ করে বললেন, মহারাজ ! আপনার ঘোষণা আমি শুনেছি। কিন্তু বুড়ো মানুষ চলতে ফিরতে কষ্ট, তাই দেরী হয়ে গেলো। আপনি অনুমতি দিলে মহারাজ, আমি ভূত তাড়াবার ও শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করতে পারি।

বুড়ো বৈদ্যের কথা শুনে রাজা শুক্রদেব বললেন,উত্তম! আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন হলে এক্ষুণি তা বলতে পারেন। বুড়ো বৈদ্য বললেন, মহারাজ তেমন কিছু প্রয়োজন হবে না তবে ১মণ সরিষা ৭মণ আতপ চাউল, ৭মণ ছাই, ৭মণ তুষ ও ৭মণ কাঁচা হলুদ লাগবে। রাজা তক্ষুনি বুড়ো বৈদ্যর চাহিদা মোতাবেক জিনিসগুলো এনে দিতে ভাণ্ডারিকাকে নির্দেশ দিলেন।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেয়ে বুড়ো তান্ত্রিক বৈদ্য সরিষাদানা, চাউল, ছাই, তুষ ও কাঁচা হলুদ এক সঙ্গে মিশিয়ে তাতে আঠারো কুড়িবার মন্ত্র জারন করলেন। এবং তা সাত কুড়ি মানুষের মাধ্যমে রাজ্যময় ছিটিয়ে দিলেন। মন্ত্র জারন করা সরিষাদানা, চাউল, ছাই, তুষ ও কাঁচা হলুদের গুড়ো গিয়ে পড়লো ভূতদের গায়ে। আর যায় কোথায়? ভূতদের সারা শরীর যন্ত্রণা ও জ্বালা করতে লাগলো। মানুষের প্রতি অত্যাচার, দাপাদাপি বেমালুম ভুলে গিয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে ভূতরা পালাতে লাগলো। কিন্তু কোথায় পালাবে।

যে দিকে পালায় সেদিকে সরিষাদানা, চাউল, ছাই, তুষ কাঁচা হলুদের গুড়ো। অঙ্গ জ্বলে গেলো আর কি। ভূতরা হাউ মাউ কান্না জুড়ে দিল। সবাই রাজার কাছে গিয়ে কৃতকর্মের জন্য মাফ চাইলো। ইয়া লম্বা লম্বা নখ, লম্বা লম্বা দাঁত, কালো কালো লোমে ঢাকা ভূত দেখে তো রাজা একেবারে 'থ'। তারপরও ভূতদের প্রতি রাজার মায়া হলো। তিনি বুড়ো তান্ত্রিক বৈদ্যকে বললেন,বৈদ্য মশাই, ভূতদের উচিত শাস্তি হয়েছে। তাদেরকে ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে যেতে বলুন। আর বলে দিন তারা যেন ভুলেও কখনো এ রাজ্যে না আসে।

রাজার কথা শুনে বুড়ো বৈদ্য বললেন, মহারাজা ভূতের জাতটা বড়ই অকৃতজ্ঞ। তারা খুবই বিশ্বাসঘাতক। সময় ও সুযোগ পেলে আবার অত্যাচার করে বসবে। তার চেয়ে মহারাজ ! ভূতদের গোলাম করে রাখা ভালো। আমি এই ৭টি তাবিজ আপনার রাজ্যের সাতজন নারাণের হাতে দেবো। যার হাতে এ তাবিজ থাকবে সে হবে ভূতের প্রভু। সে যা চাইবে ভূতরা তাৎক্ষণিক তা এনে দেবে। তবে সাবধান ! কোন ভাবেই যদি তাবিজগুলো হাতছাড়া হয় তা হলে ভূতেরা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। সাবধান। এই বলে বুড়ো বৈদ্য সাতজন নারাণের হাতে ৭টি তাবিজ দিয়ে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার আস্তানার পথে রওয়ানা দিলেন। রাজাও সবার মঙ্গল কামনা করে বিদায় করে দিলেন।

এদিকে হলো কি,তাবিজের গুণে ক্ষমতা পেয়ে রাজ্যের সাতজন নারাণ ভূতদের দিয়ে সব কাজ আদায় করতে লাগলেন। জংগল থেকে লাকড়ি নিয়ে এসো বললে ভূতরা লাকড়ি এনে দেয়। মাঠে কাজ করো বললে ভূতরা দল বেঁধে মাঠে কাজ করে। জমি চাষ করো বললে ভূতরা জমি চাষ করে। জঙ্গল সাফ করো, রাস্তা সাফ করো, ধান ভানো, কাপড় কাচো ইত্যাদি যা হুকুম হয় ভূতরা অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করতে লাগলো আর রাজ্যবাসীরা কাজ কর্ম না করে অলস হয়ে মহাসুখে জীবনাতিপাত করতে লাগলো।

একদিন একভূত ঝর্ণার ধারে পানি আনতে গেলো। সেখানে সে দেখা পেলো রেংরেং নামে এক যুবতী ভূতের। সে ভূতটি ছিলো ভিন্ দেশের ভিন্ গোষ্ঠীর। সে যুবতী ভূতটি ব্যঙ্গ করে বললো—কী কপাল রে তোমাদের। সারাদিন গোলামী করো এরচেয়ে মরে যাওয়া ভালো। পুরুষ ভূতটি বললো কি করবো বলো ? ক্ষমতার তাবিজ যে মানুষের হাতে রয়েছে। আরে ধুৎ!

ব্যঙ্গ করে বললে রেংরেং যুবতী ভূতটি। তোমাদের মাথায় কোন বুদ্ধি নেই। আমি যা বলি শোন। আমি তোমাকে এক পেয়ালা মদ দেবো। তোমাদের ক্ষমতাধর নারাণদের খেতে দিবে। তারপর যা করার আমি করবো। তবে একটা শর্ত। তোমরা যদি মুক্তি পাও তা হলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে। বুঝলে ? পুরুষ ভূতটি বললে, তা কেমন করে হয়। তুমি হচ্ছো ভিন্ গোষ্ঠীর মেয়ে। আমাদের সমাজ কিছুতেই মেনে নেবে না। রেংরেং যুবতী ভূত বললে,সেটা আমি পরে দেখবো। তুমি এখন যাও। তোমাদের ক্ষমতাধর নারাণদের মদ খাওয়াও। পুরুষ ভূতটা ঝর্নার পানির পরিবর্তে পাত্রে করে মদ নিয়ে গেলো। আর তা পান করে নারাণ ও লোকজন নেশায় মাতাল হয়ে নাচানাচি শুরু করে দিল। ভূতটা চোখের পলকে সাতজন নারাণের এলাকায় মদের পাত্র দিয়ে এল। নারাণ মশায় পান করে, প্রজারা পান করে। সবাই মাতাল হয়ে হৈ-হুল্লোড় শুরু করে দিল। এ সুযোগে রেংরেং যুবতী ভূতটি এক পরমাসুন্দরী হয়ে নারাণদের মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তাবিজগুলো খুলে নিয়ে এলো। তারপর ভূতরা গোলামীমুক্ত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে চম্পট দিল। সংগে নিয়ে গেলো টাকা পয়সা, সোনারূপা-ধন দৌলত। আর মনুষ্য নারীদের শিখিয়ে দিয়ে গেলো কি ভাবে মদ তৈরি করতে হয়। মদের নেশার ঘোর কাটিয়ে যখন নারাণ ও প্রজাদের হুশ হলো তখন দেখতে পেলো তাবিজ খোয়া গেছে। ভূত নেই। কোন হুকুম তামিল হচ্ছে না। রাজ্যবাসী রাতারাতি গরীব হয়ে গেলো। সবাই হায় হায় করতে লাগলো। কিন্তু মদের স্বাদ ভুলতে পারলো না। তারপর রাজ্যবাসীরা নিজেরা মদ তৈরি করে পান করতে আরম্ভ করলো এবং সেই অবধি ত্রিপুরারা মদ পানে অভ্যস্ত হতেই সারা দুনিয়ায় মদের রাজত্ব কায়েম হল। এভাবে ভূতরা মানুষের ক্ষতি করলেও এখন আর সরাসরি আক্রমণ করার সাহস পায় না বুড়ো বৈদ্যের ভয়ে। আর এ জন্যেই ভূতে ধরা মানুষকে তাবিজ দিলে নাকি ভাল হয়।

মুকুট কাহিনী

ত্রিপুরা রাজন্যবর্গের মধ্যে মহারাজা মাইচুং ফা ছিলেন অতিশয় খেয়ালী রাজা। অদ্ভুদ অদ্ভুদ চিন্তা ভাবনা রাজার মাথায় খেলতো। পাত্র মিত্র ও অমাত্যবর্গ মহারাজার খেয়ালী জবাব দিতে গিয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো।

একদিন যথারীতি দরবার শুরু হলে পর রাজ্যের নানান বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে মহারাজা মাইচুংফা রাজপণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা রাজপণ্ডিত মশাই, বলুন তো দেখি আমার এই ত্রিপুরা রাজ্যে মনুষ্যকূল আগে না পক্ষীকূল আগে ঘুম থেকে জেগে উঠে ?

রাজপণ্ডিত মহারাজার এ ধরনের প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন – মহারাজাধীরাজ। আমাদের রাজ্যে প্রাচীনকাল থেকেই একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে তা হলো 'পাখীর ডাকে ভোর হয় মহারাজ'। এ প্রবাদ বাক্যটি যদি সত্যি হয় তা হলে পক্ষীকূলরাই ভোরে সবার আগে জেগে উঠে। কিন্তু রাজমন্ত্রী, রাজপণ্ডিতের কথা কিছুতেই মেনে নিতে না পেরে বলে উঠলেন, ত্রিপুরেশ্বর ? রাজপণ্ডিতের কথা – কিছুতেই গ্রাহ্য হতে পারে না। মানুষ হয়ে পাখীকূলের কাছে হার মানা অতিশয় লজ্জাষ্কর ব্যাপার। মনুষ্যকূলই সবার আগে ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে।

রাজমন্ত্রী ও রাজপণ্ডিতের যুক্তি তর্কের কারণে দরবার হলে, বেশ গুঞ্জরণ সৃষ্টি হলো। কেউ রাজপণ্ডিতকে, কেউবা রাজমন্ত্রীর পক্ষাবলম্বন করে যুক্তি তর্কে মেতে উঠলো। এরূপ অবস্থায় মহারাজা মাইচুংফা দরবারস্থ সবাইকে থামিয়ে বলে উঠলেন, আমি তিনদিনের মধ্যে এর উত্তর চাই। মহামন্ত্রীকে আদেশ দিলেন এ কথা যেন রাজ্যময় প্রচার করে দিতে। বললেন, মহামন্ত্রী ! আগামী তিন দিনে, যে আমায় প্রথম ঘুম থেকে জেগে তুলতে পারবে সেই হবে বিজয়ী। তা মনুষ্যকূলই হোক কিংবা পক্ষীকূলই হোক। এ জন্যে একটি স্বর্ণখচিত মুকুট ও দুইটি রূপার চামচ পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে।"

সেদিনের মতো দরবার অনুষ্ঠান শেষ হলে পরে মহামন্ত্রী সারা ত্রিপুরা রাজ্যে চোপাদার পাঠিয়ে মহারাজার আদেশ প্রচার করে দিলেন।

এদিকে হলো কী স্বর্ণমুকুটের লোভ মহামন্ত্রীকেও পেয়ে বসেছিল। এ ছাড়া

মহারাজাকে ভোরে সবার আগে ঘুম থেকে তোলার কৃতিত্বও তিনি নিতে চাইলেন। মহামন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিলেন তিনিই সবার আগে ভোরে মহারাজাকে ঘুম থেকে জেগে–তুলবেন। রাত নেমে আসতেই রাজ্যের মনুষ্যকূল ও পশুপক্ষীকূল ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লো। শুধু ঘুমালো না মহামন্ত্রী। কখন ভোরের পূর্বাভাস হবে এ প্রত্যাশায় জেগে রইলেন। রাজধানী নিঝুম নীরব। মাঝে মধ্যে নগর রক্ষী বাহিনীর ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ থেকে থেকে শোনা যেত। প্রাসাদ রক্ষীগণ সতর্ক হয়ে রাজপ্রাসাদ পাহারা দিচ্ছে। সবার – কৌতুহল, সবার জিজ্ঞাসা - কে মহারাজার ঘুম ভাঙাতে আসবে। কে সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ?

এমন সময় রক্ষীরা দেখতে পেলো পূর্বাকাশে আলোর আভা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে আর হঠাৎ প্রাসাদের চূড়ায় বসে ভোরের আগমনী বার্তা ঘোষণা করে গান গাইছে ততেকেলেং পাখী। সেই গানে মহারাজা ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং জানালা খুলে দেখলেন পূর্বাকাশে আলোর আভায় রাজ্যের রাজধানী,নগর,জনপদ, লোকালয় ধীরে ধীরে – আলোকিত হয়ে উঠছে, ভোরের পাখিরা গান করছে, ভোরের সুশীতল বাতাস বইছে। অলির লোভে ভোঁমরা উড়ছে, ফুলের কলি পাঁপড়ি ছড়াচ্ছে, শিব মন্দিরে শঙ্খধ্বনি হচ্ছে, লতা গুল্ম মাথা দোলাচ্ছে। মহারাজা প্রাসাদের চূড়ায় তাকালেন। দেখলেন একটি ছোট্ট পাখি মিষ্টিসুরে ভোরের গান গাচ্ছে। মহারাজা পাখিটিকে উদ্দেশ্য করে সুপ্রভাত জানালেন এবং মিষ্টি গানে রাজাকে ঘুম থেকে জেগে তোলার জন্য রাজ দরবারে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন। প্রতিদিন পাখির মিষ্টি গানে মহারাজা ঘুম থেকে জেগে উঠতেন এবং ভোর আগমনী গানের জন্য পাখিদের সুপ্রভাত জানিয়ে রাজ দরবারে আসতে আমন্ত্রণ জানাতেন। এভাবে তিনদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলো রাজ্যের কোনো মানুষ পাখিদের আগে ভোরে মহারাজাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে পারলো না। যে মহামন্ত্রী মহারাজাকে ভোরে জেগে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি প্রতিবারেই পক্ষীকূলের কাছে হার মানলেন।

তিন দিন অতিবাহিত হবার পর মহারাজা দরবার আহবান করলেন। সারা রাজ্যে সবার মুখে একটি কথা কে মহারাজাকে ভোরে সবার আগে ঘুম থেকে জেগে তুলতে সক্ষম হলো ? মনুষ্যকুল না পক্ষীকুল ? কে পাবে স্বর্ণমুকুট ও রূপার চামচ। যথারীতি দরবার অনুষ্ঠিত হলো। লোকে গিজ গিজ। কোনো ঠাঁই নেই। এক সময় রাজ দরবারে দুন্দভি বেজে উঠলো।

মুহূর্তে নীরব হয়ে গেলো রাজ দরবার। যেন পিনপতন শব্দ নেই। ত্রিপুরা মহারাজা মাইচুংফা রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন, প্রিয় ত্রিপুরা রাজ্যবাসীগণ, ভোরে কে আগে জেগে উঠে "এ যুক্তিতর্কে এবং তিনদিনের মধ্যে কে আমাকে

ভোরে সবার আগে জেগে তুলবে–এ প্রশ্নে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে– পক্ষীকূলরাই ভোরে সবার আগে জেগে উঠে এবং গত তিন দিনে পাখীরাই ভোরে আগমনী গান গেয়ে আমাকে ভোরে জাগিয়ে তুলেছে। মনুষ্যকুল নয়। আমি পক্ষীকুলকে বিজয়ী ঘোষণা করছি এবং পুরস্কৃত করছি।" মনুষ্যকুলের পরম্পরা জানার জন্যে 'বিচক' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্যে রাজপণ্ডিতকে নির্দেশ দিচ্ছি। মহারাজার ঘোষণার পর রাজ দরবারে আরেক দফা গুঞ্জন হলো। এক সাহসী যুবক মহারাজাকে কুর্নিশ করে বলে উঠলেন 'মহামান্য ? বিজয়ী দল পক্ষীকূল এ দরবারে আসেনি এবং সোনার মুকুট ও রূপোর চামচ তারা গ্রহণ করবে কি করে !

এ প্রশ্নের উত্তরে মহারাজা বললেন, সোনার মুকুট ও রূপোর চামচ লংতরাই পর্বতের চূড়ায় রেখে আসা হোক। মহারাজার আদেশে সৈন্যরা লংতরাই পর্বতের চূড়ায় গিয়ে বিজয়ী পক্ষীকুলের পুরস্কার রেখেছিল। এরপর থেকে নাকি কাঠ ঠোকরা পক্ষীর মাথায় মুকুট গজে উঠে। মহারাজাকে যে পাখী ভোরের আগমনী গান গেয়ে ঘুম থেকে জেগে তুলেছিল সে পাখীটি ছিল কাঠ ঠোকরা পাখী।

শক্তি পরীক্ষা

ত্রিপুরা মহারাজা শ্রী ধন্য মানিক্য ছিলেন প্রজাবৎসল রাজা। তিনি নিজেই ছিলেন ধার্মিক এবং প্রতিনিয়ত তিনি প্রজাদের সার্বিক কল্যাণে কাজ করতেন। প্রজাদের যাতে কল্যাণ হয় যাতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে এ সব বিষয় নিয়ে তিনি তাঁর মন্ত্রী, পাত্র, মিত্রদের নিয়ে সভা করতেন। রাজ কর্মচারীরা কোন অন্যায়-অবিচার কাজ করতে সাহস করতো না। রাজা ধন্য মাণিক্য কখনও প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য ছদ্মবেশে রাজ্যময় ঘুরে বেড়াতেন। রাজ্যের কোন এলাকায় কোন প্রজার অভাব অনটন ও অশান্তি দেখলে সে এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত নারাণদের ডেকে কৈফিয়ত তলব করতেন। প্রয়োজনে শাস্তি প্রদানে দ্বিধাবোধ করতেন না। ফলে রাজ্যের প্রজারা সুখে শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করতো। এ হেন সুখের রাজ্যে কিনা ঘটল এক অঘটন। রাজ্যের উত্তরাংশে বসবাসকারী প্রজারা একদিন দলে দলে রাজধানীতে এসে রাজ প্রাসাদে হাজির। প্রজাবৎসল রাজা প্রজাদেরকে রাজ দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করলেন। প্রজারা রাজাকে প্রণাম করে তাদের দুর্দশার কথা বলল যে, বেশ কিছুদিন যাবত তাদের এলাকায় এক অজানা জন্তুর আবির্ভাব হয়েছে। তার অত্যাচারে তাদের ক্ষেতের ফসল ধ্বংস হয়েছে, অসংখ্য গবাদি পশুর ক্ষতিসাধন হয়েছে এবং কোন কোন লোকালয় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তাজ্জব ব্যাপার। তাজ্জব কাণ্ড। প্রজারা এর প্রতিকারে আবেদন জানালো।

প্রজাবৎসল রাজা প্রজাদের অভিযোগ পেয়ে তাৎক্ষণিক দশজন সেনা পাঠালেন অজানা জন্তুকে মারার জন্য। আর একজন রাজ কর্মচারী পাঠালেন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরুপনের জন্য। দশজন সেনা উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে তরবারী, বর্শা ও বল্লম হাতে নিয়ে সন্ধ্যার আগে জুম ক্ষেতের একটি মাচাং ঘরে বসে রইল অজানা জন্তুর অপেক্ষায়। ক্রমে সন্ধ্যা পার হয়ে রাত নেমে এল। চারিদিকে নিঝুম, নিস্তব্ধ। শুধুমাত্র রাত জাগা পাখী মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। কিন্তু দূরে কোথাও ত্রিপুরা গ্রাম থেকে উদাসী বাঁশীর সুর ভেসে আসছে। কিন্তু

অজানা জন্তুর কোন হদিস রাজসেনারা অনুসন্ধান করে পেল না। তাই পালাক্রমে পাহারা দেবার মনস্থ করে পাঁচজন সেনা ঘুমিয়ে পড়ল। বাকী পাঁচজন সেনা চোখ-কান সজাগ রেখে বসে রইল মাচা ঘরে। গভীর রাত হঠাৎ তারা জুম ক্ষেতের দক্ষিণাংশ থেকে অদ্ভুত গরম হাওয়া অনুভব করল। রাজ সেনারা দেখতে পেল কি যেন একটা জন্তু আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আগুনের ফুলকি দেখে বাকী পাঁচজন সেনাও জেগে উঠলো। ভয়ে কাঁপতে লাগলো তারা। দুইজন সেনা বর্শা ছুড়ে মারলো কিন্তু অজানা জন্তুর কিছুই হলো না। জন্তুটি যতই এগিয়ে আসে ততই গরমের লু হাওয়া বাড়তে থাকে। শেষে সেনারা একযোগে জন্তুটাকে ঠেকাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সব চেষ্টা বিফল হয়ে আগুনের হলকায় পুড়ে মরে পড়ে রইল। জন্তুটি ক্ষেতের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে চলে গেলো। পরদিন প্রজারা জুম ক্ষেতে এসে দেখে যে, তাদের ফসলের ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে বেশি আর রাজ সেনারা পুড়ে মরে পড়ে আছে।

এহেন অবস্থা দেখে প্রজারা সেনাদের মরা দেহ রাজার সমীপে নিয়ে গেল। রাজা শ্রী ধন্য-মাণিক্য দেখলেন সেনাদের সারা শরীর পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে। রাজা এবার বেশি পরিমাণে সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য। যতবার পাঠায় ততবারই মৃতদেহ হয়ে ফিরে আসে। রাজা প্রমাদ গুণলেন। মন্ত্রী ও পাত্র মিত্রদের সাথে শলা-পরামর্শ করলেন। অদ্ভুদ অজানা জন্তুকে মেরে প্রজাদের শান্তি রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর কোন বীর এ কাজে সাহসী হল না। তারা সবিনয়ে রাজাকে তাদের অপারগতার কথা জানাল। এখন কি করা যায়। সেনাপতি রায় কাচাক রাজধানীতে নেই। রোসাংগ যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছেন। রাজা, মন্ত্রী, পাত্র মিত্র মহাভাবনায় পড়লেন। রাজা নির্দেশ দিলেন যেমন করে হোক অজানা জন্তুকে মেরে ফেলতে হবে। প্রজাদের শান্তি রক্ষা করতে হবে। রাজ্যময় ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা দেয়া হল যে বীর অজানা জন্তুকে মেরে ফেলতে পারবে তাকে এক হাজার রাং (মুদ্রা পুরস্কার দেয়া হবে। একদিন, দু'দিন-তিন দিন না কোন বীর রাজ দরবারে এলো না। এখন কি করা যায়। তাহলে কি অজানা জন্তুর অত্যাচারে রাজ্যের অবস্থা বিপর্যয় হবে ? হতেই পারে না। মহারাজা শ্রী ধন্য মানিক্য রাজ সভাসদকে নিয়ে আবার সভা করলেন। সকলেরই মত রোসাংগ যুদ্ধ থেকে সেনাপতি রায় কাচাককে আনা হোক। সেনাপতি ছাড়া এ অজানা জন্তুকে কেউ সামলাতে পারবে না। শেষ মেষ সিদ্ধান্ত তাই হল। রাজা সেনাপতি রায় কাচাককে

রাজধানীতে ডেকে পাঠালেন। সেনাপতি আসলে পরে রাজা অজানা জন্তুকে মেরে ফেলে রাজ্যের শান্তি রক্ষার জন্য নির্দেশ দিলেন। সেনাপতি রায় কাচাক ছিলেন অতিশয় বলশালী বীর। সেকালে তার সমকক্ষ কোন বীর ছিল না। রাজাও তাকে সমীহ করে চলতেন।

শক্তিগর্বে অহংকারী সেনাপতি রায় কাচাক তার দেড়মন ওজনের তরবারী খাপে ঝুলিয়ে বেলা থাকতে রওনা দিলেন উপদ্রুত এলাকায়। সুবিধামত একটি উঁচু মাচাং ঘরে বসে চারিদিকে দেখতে লাগলেন তেমন কোন অজানা জন্তুর সন্ধান মেলে কি না ? ক্রমে ক্রমে রাত বাড়তে লাগলো। সেনাপতি রায় কাচাক রাত গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে রইলেন। হঠাৎ তার নজরে পড়ল দক্ষিণ দিক থেকে লম্বা আকারে একটা অজানা জন্তু তার দিকে এগিয়ে আসছে এবং দেহ থেকে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে রায় কাচাক খাপ থেকে তার দেড়মন ওজনের তরবারীখানা নিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে – জিজ্ঞাসা করলেন – কে তুমি ? কি তোমার নাম ? অজানা জন্তু বাজখাই গলায় বলে উঠলো – আঁমি শঁক্তি। শঁক্তিই আঁমার পঁরিচয়। কাঁর বাঁহুতেঁ কত জোঁর আঁছে আঁমি তাঁই পঁরীক্ষা কঁরি। এঁসো কাঁর শঁক্তি বেঁশী আঁমরা পঁরীক্ষা কঁরে দেঁখি।

রায় কাচাক বললেন–বটে। কিন্তু তাৎক্ষণিক ভেবে দেখলেন অজানা জন্তুর দেহ থেকে যেভাবে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে এতে কাছে গিয়ে যুদ্ধ করা মানে পুড়ে যাওয়া। তাই তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে বললেন–আমরা কিভাবে লড়াই করবো। অজানা জন্তু বলল – তোঁমার যেঁমন খুঁশী তেঁমন কঁরে যুঁদ্ধ কঁরতে পাঁরো। সেনাপতি রায় কাচাক বললেন–আসুন আমরা প্রথমে পেছন থেকে ধাক্কাধাক্কি করি।

অজানা জন্তু বলল–ঠিঁক আঁছে। তঁবে কেঁ আঁগে ধাঁক্কা দেঁবে। রায় কাচাক বললেন – তুমি আগে দাও। দেখি আমি ফিরাতে পারি কি না।

অজানা জন্তু বলল – ঠিক আঁছে। তাঁ হঁলে ধাঁক্কা ফিঁরাও। আমিঁ সাঁমনে কিঁছু দূঁর থেঁকে দৌঁড়ে এঁসে তোঁমাকে ধাঁক্কা দেঁব। প্রঁস্তুত হঁও। জঁলদি। রায় কাচাক তার দেড়মন ওজনের তরবারি খানা সোজা করে সজোরে ধরে রাখলেন আর বিদ্যুৎ বেগে চলে আসা অজানা জন্তুর পিঠ বরাবর তরবারিটা ঢুকে গেল। আঁই অ্যাঁ বলে অজানা জন্তুটি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সেনাপতি রায় কাচাক দেখলেন – জন্তুর দেহ থেকে যে রক্ত বেরুচ্ছে তা যেন রক্ত নয় আগুনের ফুলকি। রায় কাচাকের দেহও কিছু অংশ আগুনের ফুলকি লেগে পুড়ে গিয়েছিল তথাপি বুদ্ধির জোরে তিনি শত্রুকে পরাজিত করলেন। শ্রী ধন্য

মাণিক্য এর সেনাপতি রায় কাচাক ইতিহাসেও রণ কৌশলী বীর যোদ্ধা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শত্রু মারা গেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে এলো। ত্রিপুরা মহারাজা শ্রী ধন্য মাণিক্য বিচকারকে আদেশ দিলেন – এ বিস্ময়কর ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বংশ পরম্পরা জানতে পারে।

ঘুঘু পাখির বংশ বিস্তার কাহিনী

অনেক অনেক দিন আগের কথা। তখন ত্রিপুরা রাজ্যের অধিশ্বর ছিলেন মহারাজ দেবাঙ্গ। সে যুগে পৃথিবীর প্রাণীকূলের মুখের ভাষা এক ছিল। মানুষ, পশুপাখি, জীবজন্তুর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হলে ভাব বিনিময় করতে পারতো, দু'দণ্ড বসে সুখ দুঃখের কথা বলতে পারতো। যার ফলে পৃথিবীর প্রাণীকূল একে অপরকে আপদে বিপদে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারতো।

সেই সুন্দর যুগে ত্রিপুরা রাজ্যের এক প্রান্তে আশি বছরের এক বুড়ো দম্পতি বাস করতেন। তাদের ছেলেপেলে ছিল না। একদিন বুড়ো এক শীতের সকালে বাড়ির আঙিনায় বসে বেতের কাজ করছিলো। এমন সময় কোথা থেকে একটি ঘুঘু পাখি উড়ে এসে বুড়োর সামনে অনবরত ঘুগ্ ঘুগরে ঘু, ঘুগ্ ঘুগরে ঘু ডাকতে লাগলো। এতে বুড়োর কাজে খুব ডিস্টার্ব হচ্ছিলো। বাঁশের কন্‌চি দিয়ে বুড়ো যত তাড়িয়ে দেয় তত উচ্চস্বরে ঘুগ্ ঘুগরে ঘু ডাক দেয়। ঘুঘু পাখি কেবল ডাকতে লাগলো ঘুগ্ ঘুগরে ঘু-আমাকে ধরে জবাই করো। ঘুঘু পাখির ডাকে বুড়ো ভাবলো – এ কি অলক্ষুণের কথা।

ঘুঘু পাখির কথা শুনে শেষ মেষ বুড়ো রাগের চোটে ঘুঘু পাখিটাকে ধরে জবাই করে ফেললো এবং গুনগুনিয়ে বেতের কাজ করতে লাগলো। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই মরা ঘুঘু পাখিটি আবার ডেকে উঠলো–ঘুগ্ ঘুগ রে ঘু আমাকে কেন কুটে না। বলে কি! বুড়ো ঘুঘু পাখির চামড়া ছুলে ফেলে দিয়ে টুকরো টুকরো করে কুটে ফেললো। বুড়ো মাংসগুলোকে একটি পাত্রে রেখে দিয়ে আবার বেতের কাজে গুনগুনিয়ে মন দিলো। কিছুক্ষণ পর পাত্র থেকে ঘুঘু পাখির টুকরো টুকরো মাংস আবার ডেকে উঠলো – ঘুগ্ ঘুগরে ঘু আমাকে কেনো মসলাপাতি দিয়ে রান্না করে না। কথাটা শুনে বুড়ো তো একেবারেই তাজ্জব। বুড়ো বুড়িকে ডেকে বললো, একটা ঘুঘুপাখি মেরেছি। দুপুরের খাওয়াটা ভালো জমবে। তুমি তাড়াতাড়ি বেশী করে মসলা পাতি দিয়ে মাংস রান্না করো। এ্যঁ হেঁ হেঁ। বুড়ি ভালো করে মসলা দিয়ে ঘুঘু পাখির মাংস রান্না করলো। তারপর জল আনতে ঝর্নায় গেলো। বুড়ি চলে যেতেই রান্না করা ঘুঘু পাখির মাংসগুলো হাঁড়ি থেকে ডেকে উঠলো, ঘুগ্‌রে ঘুগ আমাকে কেন খাও না। ঘুঘু পাখির ডাক শুনে বুড়োর

আর সহ্য হলো না। তাড়াতাড়ি বুড়িকে ঝর্না থেকে ডেকে এনে দু'জনে মিলে আচ্ছা মজা করে মাংসগুলো খেয়ে ফেললো। খাওয়া দাওয়ার পর বুড়ো আঙিনায় বসে আয়েশ করে তামাক খাচ্ছিল আর বুড়ি তর্জনীতে চুন মেখে পান সুপারী চিবুচ্ছিলো। এমনি সময়ে বুড়োবুড়ির পেটের ভেতর থেকে আবার ঘুঘু-পাখির মাংসগুলো ডেকে উঠলো–ঘুগ্ ঘুগরে ঘু, বুড়োবুড়ি কেন মল ত্যাগ করে না। সত্যি সত্যি বুড়োবুড়ির পায়খানার বেগ এসে গেলো। কী আর করা। বুড়ো বুড়ি পাশাপাশি বসে মল ত্যাগ করতে বসে গেলো।

বুড়োবুড়ি মল ত্যাগ করতে যেই বসে গেছে অমনি মলদ্বার থেকে ফুস্ স্ স্ স্ করে প্রথমে গ্যাস বের হলো। তারপর মলদ্বার থেকে কেবলই ঘুঘু পাখি বের হতেই লাগলো। বের হচ্ছে তো হচ্ছেই। কোন থামাথামির লক্ষণ নেই। বুড়োবুড়ি সারাদিন বসে কেবল ঘুঘু পাখির মল ত্যাগ করতে লাগলো। এভাবে রাজ্যময় কেবল ঘুঘু পাখিতে ভরে গেলো। কেমন করে জানি এ আজব ঘটনাটি ত্রিপুরা রাজা দেবাঙ্গের কানে গেলো। রাজা দেবাঙ্গ সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য তাঁর বুড়ো মন্ত্রীকে ঘটনাস্থলে পাঠালেন। বুড়ো মন্ত্রী ঘটনাস্থলে এসে সরেজমিনে তদন্ত করে রাজাকে জানালেন, মহারাজা ! ঘটনা অতীব ধ্রুব সত্য। আমি যখন সরেজমিনে তদন্ত করি তখনো হতভাগা বুড়োবুড়ির দম্পতি বসে বসে কেবলই ঘু ঘু পাখির মল ত্যাগে অতি ব্যস্ত রয়েছে। মন্ত্রীর মুখে এ ধরনের অদ্ভুদ কাহিনী শুনে ত্রিপুরা রাজা দেবাঙ্গ তাঁর রাজপণ্ডিতকে নির্দেশ দিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এ বিস্ময়কর তথ্য লিপিবদ্ধ করতে। বলাবাহুল্য, আমরা সেই রাজপণ্ডিত কর্তৃক লিখিত ইতিহাস থেকে এ তথ্য জানতে পেরেছি কেমন করে ঘুঘু পাখীর বংশ বিস্তার হয়েছিলো। আগামীতে এ সুন্দর পৃথিবীতে আরো যত মানুষ জন্ম নেবে তারাও সেই রাজপণ্ডিত কর্তৃক লিখিত ইতিহাস থেকে এ তথ্য জানতে পারবে।

ভাগ্য পরীক্ষা

অনেক অনেক দিন আগের কথা। তখন মানুষের সাথে পশুপাখি ও প্রকৃতিপুঞ্জের ভাব বিনিময় করা যেত। সে সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে বিক্রম মনি নামে একজন মহারাজা রাজত্ব করতেন। রাজার ছিল ৪ পুত্র। পুত্ররা কিছুতেই বিয়ে করতে চাচ্ছে না। এদিকে রাজা বুড়ো মানুষ। কখন মরে যায় তার কোন ঠিক নেই। বুড়ো রাজার ইচ্ছে ছিল চারপুত্রের বউদেরকে তিনি দেখে যাবেন এবং ভাগ্যে জুটলে নাতিনাতনীদের সাথে বাকী জীবন কাটাবেন। কিন্তু সব ইচ্ছের গুড়েবালি, ছেলেরা কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে বুড়ো রাজা তারই মতো বৃদ্ধ মহামন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে এ বিষয়ে কি করা যায় পরামর্শ জানতে চাইলেন।

বৃদ্ধ মহামন্ত্রী হাতজোড় করে বললেন, মহারাজা, ছেলেদের ইচ্ছের উপর ছেড়ে দিলে আপনি নাতিনাতনীর কথা তো দূরের কথা বউদের মুখও দেখতে পাবেন না। আপনাকে একটুখানি কঠোর হতে হবে। জোর করে ছেলেদের বিয়ে করাতে হবে। আপনি ছেলেদের নিয়ে একটা জনসভা করবেন এবং ওই সভাতে ছেলেদেরকে নির্দেশ দিবেন পাত্রী নির্বাচন করতে। মহামন্ত্রীর পরামর্শ শুনে বুড়ো রাজা বললেন, মহামন্ত্রী মহাশয়, জানা নেই, শোনা নেই প্রকাশ্যে জনসভায় অন্যের কন্যাকে পাত্রী নির্বাচন করতে আদেশ দেয়া কি ঠিক হবে? এতে প্রজাসাধারণ যে ক্ষেপে যেতে পারে। মহামন্ত্রী বললেন, মহারাজ, রাজকুমারগণ কন্যা দেখে পাত্রী নির্বাচন করবে না। ভাগ্যের উপর নির্ভর করে তারা পাত্রী নির্বাচন করবে। রাজকুমারগণ ধনুর্বিদ্যায় খুবই পারদর্শী। সভাস্থলে রাজকুমারগণকে তীর নিক্ষেপ করতে বলবেন। তীর যেখানে গিয়ে অর্থাৎ যার বাড়ীতে গিয়ে পড়বে সে বাড়ীতে যদি অবিবাহিত কন্যা থাকে তা হলে তার সঙ্গে রাজকুমারের বিয়ে হবে। বুড়ো রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ শুনে অনেক ভেবে চিন্তে সম্মতি দিয়ে বললেন, মহামন্ত্রী আপনি ব্যবস্থা করুন। বুড়ো মহামন্ত্রী রাজার সম্মতি পেয়ে যথাযথ দিন তারিখ ঠিক করে জনসভা আহ্বান করলেন। রাজ্যের পাত্র মিত্র, উজির, নাজির এবং প্রজা সাধারণ দলে দলে এসে জড়ো হলো সভাস্থলে। সবার কৌতুহল। বুড়ো রাজার প্রতি।

যথাসময়ে বুড়ো রাজা জনসভা স্থলে এসে উপস্থিত হলেন। প্রজা সাধারণ বুড়ো রাজার জয়ধ্বনি দিতে লাগলো। বুড়ো রাজা সভামঞ্চে আরোহণ করে সবাইকে হাতের ঈশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, শুনুন আমার প্রিয় প্রজাসাধারণ। আমি বুড়ো মানুষ। আর ক'দিন বেঁচে থাকবো জানি না। আমার ৪ পুত্র কেউ বিয়ে

করছে না। আমি যদি মরে যায়, তা হলে অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে আমাকে মরে যেতে হবে। তাই আমি নিরুপায় হয়ে আপনাদের সম্মুখে আমার ৪ পুত্রকে জোর করে বিয়ে দেব বলে মনস্থ করেছি। আমার ৪ রাজকুমার ভাগ্যের উপর নির্ভর করে পাত্রী নির্বাচন করবে। আপনারা সবাই জানেন যে, আমার ৪ রাজকুমার ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। এই ৪ পুত্র চারদিকে তীর্থ ছুঁড়বে। তাদের ছোঁড়া তীরই তাদের জন্য পাত্রী নির্বাচন করে দেবে। আপনারা সমবেত প্রজা সাধারণ সবাই এ বিয়ের সাক্ষী থাকবেন। বুড়ো রাজার ঘোষণায় সমবেত প্রজাসাধারণ করতালি দিয়ে সভাস্থল মুখরিত করে তুললো। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে রাজ কুমারদের কপালে কেমন পাত্রী জোটে তা দেখার জন্য।

সভাস্থল নীরব নিস্তব্ধ। সবাই বুড়ো রাজার মুখের পানে তাকিয়ে। বুড়ো রাজা কিছুক্ষণ নীরব থেকে জ্যৈষ্ঠ রাজকুমারকে নির্দেশ দিলেন পূর্বদিকে তীর ছুঁড়তে। জ্যৈষ্ঠ রাজকুমার বাপের নির্দেশ পেয়ে পূর্বদিকে তীর মারলেন। তীর শাঁ শাঁ করে উড়ে গেলো। তীরের নিশানা ধরে সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহী সৈন্যগণও ছুটে গেল সেদিকে। গিয়ে দেখে তীরটা পড়েছে এক জমিদারের বাড়ীতে। জমিদারের রয়েছে অপূর্ব্ সুন্দরী এক কন্যা। কন্যাকে নিয়ে হাজির করা হলো রাজসভা স্থলে। বুড়ো রাজা জমিদারের কন্যার সাথে জ্যৈষ্ঠ রাজকুমারের বিয়ে দিলেন। সমবেত প্রজাবৃন্দ এক বাক্যে বলতে লাগলো এমন সুন্দরী কন্যা আর হয় না। ধন্য জ্যৈষ্ঠ রাজকুমার বলে জয় ধ্বনিতে মুখরিত হলো চারিদিক। এরপর বুড়ো রাজা দ্বিতীয় রাজকুমারকে উত্তর দিকে তীর ছুঁড়তে আদেশ দিলেন। তীর শাঁ শাঁ করে উড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহী সৈনিকগণও ছুটে গেল সে দিকে। গিয়ে দেখতে পেলো তীরটা গিয়ে পড়েছে এক সওদাগরের বাড়ীতে। সওদাগরের ছিল এক পরমা সুন্দরী কন্যা। কন্যা নিয়ে হাজির করা হলো রাজ সভাস্থলে। প্রজাবৃন্দ করতালি দিয়ে স্বাগতম জানালো কন্যাটিকে আর পরমা সুন্দরী বলে জয়ধ্বনি করলো। বুড়ো রাজা সওদাগরের কন্যার সাথে দ্বিতীয় রাজকুমারের বিয়ে দিলেন। এবার তৃতীয় রাজ কুমারকে আদেশ দেয়া হলো পশ্চিম দিকে তীর ছুঁড়তে। তৃতীয় রাজকুমার পিতার আদেশ মতো পশ্চিম দিকে তীর ছুঁড়লো। তীর শাঁ শাঁ করে উড়ে গেল। সৈনিকগণ ছুটে গেল সে দিকে। দেখতে পেলো তীরটা গিয়ে পড়েছে এক কৃষকের বাড়ীতে। কৃষকের ছিল এক লক্ষ্মী কন্যা। কন্যাকে সভাস্থলে হাজির করা হলো। প্রজাবৃন্দ বিপুল করতালি দিয়ে স্বাগতম জানালো কৃষকের কন্যাকে। সবাই একবাক্যে বলে উঠলো এমন শান্ত ও লক্ষ্মী কন্যা আর হয়না। এ যেন গোবরে পদ্মফুল। বুড়ো রাজা কৃষকের কন্যার সাথে তৃতীয় রাজকুমারের বিয়ে দিলেন। এবার চতুর্থ রাজকুমারের পালা। চতুর্থ রাজকুমার এতোক্ষণ বড় ভাইদের বিয়ের ভাগ্য পরীক্ষা নীরবে দেখছিলো।

এবার নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালো। বুড়ো রাজা ৪র্থ রাজকুমারকে দক্ষিণ দিকে তীর ছুঁড়তে নির্দেশ দিলেন। তীর বিদ্যুৎ বেগে শাঁ শাঁ করে উড়ে গেলো। অশ্বারোহী সৈন্যগণও সে দিকে ছুটে গেল। গিয়ে দেখতে পেল তীর গিয়ে পড়েছে জনমানব শূন্য ধূ ধূ তেপান্তরের মাঠের রুক্ষ এক বট গাছের ডালে। সবাই হায় হায় করতে লাগলো। তা হলে কি চতুর্থ রাজকুমারের ভাগ্যে বিয়ে নেই? উৎসুক জনতা বটগাছের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো চতুর্থ রাজকুমারের তীরটা যে ডালে গিয়ে বিঁধেছে সে ডালের কোটরে কি যেন একটা নড়াচড়া করছে। এক সৈনিক তর তর করে গাছে উঠে গেল এবং কোটর থেকে ধরে নিয়ে এলো একটা বানরী।

না ছোট রাজ কুমারের বিয়ের ভাগ্য নেই। ছোট রাজকুমার চিরকুমার থাকবে এমন কথা বলাবলি করতে করতে সবাই চলে এলো রাজ সভাস্থলে। এক সিপাই বানরীর গলায় শিকল পরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এলো সভাস্থলে। প্রজারা বুড়ো রাজাকে বললো, মহারাজ, ছোট রাজকুমারের বিয়ের ভাগ্য নেই। বুড়ো রাজা সবাইকে হাতের ঈশারায় থামিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর সমবেত প্রজাবৃন্দের উদ্দেশ্যে বললেন, শুনুন আমার প্রিয় প্রজাবৃন্দ। ছোট রাজকুমারের কপাল মন্দ বটে কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অনড়। এই বানরীর সাথে ছোট রাজকুমারের বিয়ে হবে। বুড়ো রাজার সিদ্ধান্ত শুনে সমবেত প্রজাবৃন্দ আপত্তি জানিয়ে বললো, মহারাজ, মানুষের সাথে পশুর বিয়ে হতে পারে না। এ অসম্ভব মহারাজ! আপনি দয়া করে আপনার সিদ্ধান্ত পরিহার করুন মহারাজ! ছোট রাজকুমারকে দ্বিতীয়বারের মতো তীর ছুঁড়তে আদেশ দিন। বুড়ের রাজা বললেন, এক কথা, এক সিদ্ধান্ত। প্রয়োজন হলে ছোট রাজকুমার দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে। তবে প্রথমবার বিয়ে করতে হবে এই বানরীকে।

সমবেত প্রজাবৃন্দ আর কি করবে। বুড়ো রাজার কঠোর সিদ্ধান্ত তাদেরকে মেনে নিতে হলো। সভাস্থলে ছোট রাজকুমারের সাথে বানরীর বিয়ে হলো।

চার রাজকুমারের জন্যে ৪টি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করা ছিল। তিন রাজকুমার সুন্দরী বউ নিয়ে যার যার প্রাসাদে চলে গেল। আর দুর্ভাগ্য ছোট রাজকুমার, লজ্জায়, অপমানে মুখ মলিন করে বানরীকে টানতে টানতে নিজ প্রসাদে চলে গেল। প্রজারাও ছোট রাজকুমারের দুর্ভাগার কথা বলতে বলতে যে যার বাড়িতে চলে গেল।

ছোট রাজকুমারের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে বুড়ো রাজাও মানসিক অশান্তিতে দিনযাপন করতে লাগলেন। বুড়ো রাজা ভাবলেন একটা কিছু করা দরকার। বেশ কিছু দিন যাবার পর বুড়ো রাজা চার রাজকুমারদের ডেকে পাঠালেন। বললেন, বহু বছরতো রাজভোগ খেয়ে জীবন কাটিয়েছি। এবার বউদের রান্না

করা খাবার খেতে চাই। আমি আগামীকাল বউদের রান্না করা খাবার দিয়ে প্রাতঃরাশ করতে চাই। আগামীকাল তোমরা নিজ নিজ বউয়ের রান্না করা খাবার নিয়ে আসবে। এখন তোমরা চলে যেতে পারো।

বাপের অভিলাষ জেনে তিন রাজকুমার খুশী হয়ে বাড়ীতে গিয়ে বউদের জানালো। আর বউরা নিজেদের পারদর্শীতা দেখবার জন্য রান্নার কাজে লেগে গেলো। কিন্তু ছোট রাজকুমার! যার বউ বানরী সে রাঁধবে কি করে? আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ছোট রাজকুমার অনেক দেরীতে করে মলিন মুখে বাড়ীতে ফিরলো। বানরী বউটা তখন ঘরের উঠানে বসে ছোট রাজকুমারের জন্য অপেক্ষা করছিলো। ছোট রাজকুমারকে ঘরে ফিরতে দেখে তিরিং করে লাফিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, শ্বশুর বাবা তোমাদের ডাকলো কেন? বানরীর আচরণে ছোট রাজকুমার অতিশয় বিরক্ত হয়ে ধমক দিলে বললো তোর জেনে লাভ কি? তুমি হচ্ছো বানরী। বন্যজন্তু। কি অলুক্ষণেই না আমি দক্ষিণ দিকে তীর ছুঁড়েছিলাম। তোমাকে আমি মেরে ফেলবো। ছোট রাজকুমারের বিরক্তিভাব দেখে বানরী ফিক্ করে হেঁসে ফের জিজ্ঞেস করলো; আমি তো বানরী। আমার দ্বারা তোমার কোন উপকার হবে না জানি। কিন্তু জানার অধিকারতো আছে। ছোট রাজকুমার বললো, বাবা বউদের রান্না খেতে চেয়েছেন। আগামীকাল বউদের রান্না করা খাবার দিয়ে তিনি প্রাতঃরাশ করবেন। ছোট রাজকুমারের কথা শুনে বানরী আবারো ফিক্ করে হেসে বললো, ও এই কথা। তার জন্য তুমি এতো চিন্তা করছো কেন? শ্বশুর বাবা বউদের রান্না খেতে চেয়েছেন। খুবই ভালো কথা। রেঁধে দেবো। বানরীর কথা শুনে ছোট রাজকুমার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললো তুই কি করবি? তুই রাঁধতে পারিস না রাঁধতে জানিস। বললেই হলো রেঁধে দেবো। বানরী কোথাকার! বানরী আবারো ফিক্ করে হেসে বললো, আমি রাঁধতে পারি কি পারি না সেটা পরে দেখা যাবে। তুমি এখন বাজার করে এনে দাও। আমি রাতে রান্না করবো। ছোট রাজকুমার ভাগ্যের উপর কষাঘাত করে বাজার করে এনে দিল। আর নিজের শোবার ঘরে প্রবেশ করে খিল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠতে ছোট রাজকুমারের অনেকটা দেরী হয়ে গেল। বানরীর ডাকে জেগে উঠে দেখলো, অনেক বেলা হয়েছে। ইতিমধ্যে তিন রাজকুমার নিজ নিজ বউদের রান্না করা খাদ্য সামগ্রী নিয়ে বাপের সামনে হাজির হয়েছে। ছোট রাজকুমার ভাবলো সে যাবেনা। কিন্তু বানরী ছোট একটা কৌটরী ছোটরাজ কুমারের হাতে দিয়ে বললো, এই কৌটায় শ্বশুর বাবার জন্য প্রাতঃরাশ দেয়া আছে। বাবাকে দিয়ে আসো। কোথায় বড় বড় পাত্রে করে খাবার নিয়ে যাবে সেখানে কি না ছোট্ট একটা কোটা। ছোট রাজ কুমার কৌটাটি

বগলের নীচে লুকিয়ে বাপের সামনে গিয়ে হাজির হলো। তিন রাজকুমার বড় বড় পাত্রে করে খাবার নিয়ে এসেছে। বুড়ো রাজা আয়েশ করে খেতে বসেছেন। প্রথমে দেয়া হলো জ্যৈষ্ঠ রাজকুমারের বউয়ের রান্না করা খাদ্য সামগ্রী। তারপর দ্বিতীয় রাজকুমারের বউয়ের রান্না করা খাদ্য সামগ্রী। তারপর তৃতীয় রাজকুমারের বউয়ের রান্না করা খাদ্য সামগ্রী। বুড়ো রাজা একাগ্রচিত্তে তিন বউয়ের রান্না খেয়ে ঢেকুর তুলে বললেন, খুব ভালো রান্না হয়েছে। এমন রান্না আর হয় না। তিন বউয়ের রান্না খেয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারিফ করলেন বুড়ো রাজা। এবার ছোট রাজকুমারের বউয়ের রান্না খাবেন তিনি। ছোট রাজকুমারকে বললেন, কোথায় তোমার বউয়ের রান্না। দিয়ে দাও। ছোট রাজকুমার আমতা আমতা করে বললো, বাবা আমার বউতো বানরী, সে কি আর রান্না করবে। এই একটা ছোট কৌটরী পাঠিয়েছে বলে বগলের তলা থেকে বের করে বাপের সামনে রেখে দিল। আর অমনি সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। ছোট রাজকুমার কি আর করবে রাগে, ক্ষোভে ও লজ্জায় মাথা নীচু করে ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে রইলো।

বুড়ো রাজা বললেন, ঠিক আছে। তোমার বউ কি রেঁধে পাঠিয়েছে দেখি বলে কৌটরীর মুখটা খুললেন। আর অমনি অপূর্ব সুঘ্রান ছড়িয়ে পড়লো গোটা রাজপ্রাসাদে। যার নাকে সুঘ্রান গেছে তাদের নাড়ীভূড়ি মোচড় দিয়ে উঠলো ক্ষিধায়। বুড়ো রাজা কোটরী ভর্তি খাদ্য এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললেন। আর নিজের অজান্তে বলে ফেললেন আহা, কি অপূর্ব স্বাদ। প্রাণটা জুড়িয়ে গেলো। বুড়ো রাজার পাশেই ছিল করঙ্কিনীর দল। (করঙ্কিনী মানে যারা রাজাকে তামাক সেজে দিত, পান বানিয়ে খাওয়াতো তাদেরকে বলা হয় করঙ্কিনী)। তারা হাত জোড় করে বললো কোটারীটি আমাদের দিন। আমরা কোটরীটা ধূয়ে জলপান করবো। বুড়ো রাজা কোটারীটা করঙ্গিনীদের হাতে দিলেন। করঙ্গিনীরা বড় এক গামলা পানিতে কোটরীটা ধূয়ে নিল এবং সবাই একে একে সে পানি পান করলো। যত খায় তত খেতে ইচ্ছে করে। সবাই বানরীর রান্নাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

বানরীর রান্না সবার কাছে প্রশংসীত হলো। ছোট রাজকুমার উৎফুল্ল চিত্তে বাড়ী ফিরে গেলে পর বানরী জিজ্ঞেস করলো "হেঁ গো, আমার রান্না কি শ্বশুর বাবা খেয়েছেন? ছোট রাজ কুমার বানরীর কথার কোন জবাব না দিয়ে একটুখানি মুচকি হেসে নিজ কামরায় চলে গেল।

এদিকে বুড়ো রাজা বানরীর রান্না খেয়ে ভাবতে লাগলো যে, এমন সুস্বাদু রান্না তিনি জীবনে কোথাও খাননি। বানরীর পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হলো। নিশ্চয়ই কোন গোপন রহস্য রয়েছে। তাই বুড়ো রাজা আবারও পরীক্ষা করে দেখার

জন্য ছেলেদের ডেকে পাঠালেন।
বাপের আদেশ পেয়ে ছেলেরো এসে উপস্থিত হলো। বুড়ো রাজা বললেন, শোনো তোমরা, আমার রাজ পোশাক বেশ পুরানো হয়েছে। রাজ কোষাগারের অর্থ খরচ করে পোশাক বানাতে মন চাচ্ছে না। এখনতো আমার চার পুত্রের চার পুত্র বধু রয়েছে। আমার একান্ত বাসনা পুত্র বধুরা তিন দিনের মধ্যে রাজ পোশাকের জন্য কাপড় বুনে দিক। বাপের অভিপ্রায় জেনে তিন রাজ কুমার সম্মতি প্রকাশ করে হাসিমুখে বিদায় নিল। কিন্তু ছোট রাজকুমার মলিন মুখে কিছু না বলে বাড়ী ফিরে গেলো। ছোট কুমারের অপেক্ষায় ছিল বানরী। ছোট কুমারকে ফিরে আসতে দেখে তিড়িং করে লাফিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হেঁ গো, আজ কি জন্যে শ্বশুর বাবা তোমাদেরকে ডেকেছেন? ছোট রাজ কুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, তোমার জেনে দরকার নেই। যা তুমি পারবেনা তা শোনে লাভ কি! বানরী বললো, পারি আর নাই পারি। জানতে তো মানা থাকতে পারে না। তুমি বলো আমি জানতে চাই। ছোট কুমার বললো, বাবা তাঁর রাজপোশাকের জন্য বউদের হাতে বয়ন করা কাপড় চেয়েছেন। তাও আবার তিন দিনের মধ্যে দিতে হবে। তুমি তো বানরী। কাপড় বুনবে কি করে? এ যাত্রায় আমার মানসম্মানের আর কোন রক্ষা থাকবে না।

ছোট কুমারের কথা শুনে বানরী ফিক করে হেসে বললো, তোমাকে অত কিছু ভাবতে হবে না। এখন আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ তেপান্তরের মাঠ রয়েছে, যেখানে তোমার তীর গিয়ে পড়েছিল বটগাছে। সে বটগাছ থেকে আরো দু'ক্রোশ গেলে ছোট একটি হাট পাওয়া যাবে সে হাটে এক বুড়ো সুত্রধর বাস করে। সে হরেক রকমের সুতা বিক্রী করে। তার কাছ থেকে তুমি আগর সুতা কিনে নিয়ে আসো। ঐ সুতা দিয়ে আমি শ্বশুর বাবার জন্য রাজ পোশাকের কাপড় বানাবো। যদি তোমার মানসম্মান রক্ষা করতে চাও, তা হলে আর দেরী না করে শীঘ্রই এনে দাও।

বানরীর কথা শুনে ছোট রাজ কুমার আর দেরী না করে ঘোড়ায় চড়ে তীর বেগে ছুটে গেলো সে হাটে। অনেক চেষ্টা করার পর সে বুড়ো সুত্রধরের দোকান খুঁজে পেলো। ছোট রাজ কুমার দেখলো সুত্রধরের দোকানে নানা রংয়ের ঝমকালো সুতার ভাণ্ডার। আগর সুত্রধর তার হাতে দিল একটি ছোট প্যাকেট। ছোট কুমার সেই প্যাকেটটা নিয়ে দ্রুতবেগে ফিরে এসে বানরীর হাতে তুলে দিল। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বানরী ঘরের একটি কক্ষে প্রবেশ করলো আর ছোট কুমারকে ডেকে বললো, দুই দিন দুই রাত্রি যেন বানরীকে কেউ ডিসটার্ব না করে এবং কক্ষের দরজা খোলার চেষ্টা না করে।

দুই দিন দুই রাত্রি শেষ হলো। পরের দিন বুড়ো রাজার হাতে বউদের বানানো

কাপড় তুলে দেয়ার তারিখ। তিন রাজকুমার বউদের বয়ন করা কাপড় নিয়ে উপস্থিত হলো বাপের সামনে। এদিকে ছোট কুমার অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলো। বানরী কখন কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসবে। শেষে যখন ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে দরজা ভাঙ্গতে যাবে অমনি হাতে একটি কোটরা নিয়ে বানরী বের হয়ে এলো কক্ষ থেকে। কোটরাটি ছোট কুমারের হাতে দিয়ে বললো, এবার তুমি শ্বশুর বাবার কাছে যাও আর কোটরাটি হাতে তুলে দাও। ছোট কোটরার সাইজ দেখে ছোট কুমার রেগে গিয়ে বললো, এই বানরী, তোমার কি মাথা খারাপ! এই কোটরা দেখলে রাজ্যশুদ্ধ লোকে হাসাহাসি করবে। আমাকে লোকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে। এই কোটরা নিয়ে আমি বাপের সামনে যেতে পারবো না। কপালে যা ঘটে ঘটুক। ছোট কুমারের অমন রাগ অভিমান দেখে বানরী বললো, আমি বলছি তুমি যাবে এবং শ্বশুর বাবার হাতে কোটরাটি তুলে দেবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবারও তুমি বিজয়ি বেশে ঘরে ফিরে আসবে।

কি আর করবে ছোট কুমার। নিজকে অসহায় ভেবে বানরীর কথায় কোটরাটি বগলে করে রওয়ানা হলো রাজ প্রসাদের উদ্দেশ্যে। এদিকে তিন রাজ কুমার তাদের বউদের বয়ন করা রাশি রাশি কাপড় বুড়ো রাজাকে দেখাতে লাগলো। বুড়ো রাজা খুব নিষ্ঠার সাথে তিন পুত্রবধূর বয়ন করা কাপড় দেখলেন আর প্রশংসা করলো। সবার শেষে ছোট রাজকুমারের বউ বানরীর বয়ন করা কাপড় দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলো। ছোট কুমার কক্ষের এক কোণায় দাঁড়িয়ে বড় বৌদিদের বয়ন করা কাপড় দেখছিল আর নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। সে ভয়ে ভয়ে বগলের তলা থেকে ছোট কোটরাটি বের করে বুড়ো রাজার হাতে দিল। কোটরাটি এতো ছোট যে, দেখে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। শুধু হাসলেন না বুড়ো মন্ত্রী। সবাই বলতে লাগলো এ কেমন কাপড় যে, একটা ছোট কোটরায় ঢুকানো যায়? একটা রুমাল রাখতেতো মুঠো পরিমাণ সাইজের কোটরা লাগে। আর রাজ পোশাকের কাপড় কি-না এই ছোট কোটরাতে বলে আরেক দফা হাসাহাসি করলো। ছোট কুমার সংকুচিত হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো।

বুড়ো রাজা কোটরাটি হাতে তুলে নিলেন। তারপর আস্তে করে কোটরার ঢাকনা খুলে ভেতর থেকে কাপড় বের করতে লাগলেন। সে কি কারুকার্য খচিত নকশা করে নিপুন হাতে বয়ন করা কাপড়। কোটরা থেকে বের হচ্ছে আর বের হচ্ছে। পুরো কক্ষটাই ভরে গেল। কাপড়ের গুণগত মান দেখে বানরীকে প্রশংসা করতে লাগলো আর সবাই বলতে লাগলো এমন মসৃণ কাপড় আর হয় না। বুড়ো রাজা খুশী হয়ে বললেন, আমি বানরীর হাতে বোনা কাপড় দিয়ে রাজপোশাক বানাবো। বুড়ো রাজার কথা শুনে ছোট রাজকুমার প্রফুল্ল মনে ঘরে ফিরে গেল আর মনে মনে বানরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালো।

পর পর দু'বার পরীক্ষায় ছোট কুমারের বউ বানরী উত্তীর্ণ হলো। এবার বুড়ো রাজা শেষ বার পরীক্ষা করবেন বলে মনস্থ করলেন। এবারও তিনি ছেলেদের ডেকে বললেন, আগামীকাল আমি রাজ পূণ্যাহ আহবান করবো। আমার এই রাজ পূন্যায় দেশ বিদেশের রাজ রাজন্যবর্গ উপস্থিত থাকবেন। রাজ দরবার অনুষ্ঠানে আমার সিংহাসনের বায়পার্শ্বে আমন্ত্রিত রাজা মহারাজাদের আসন নির্ধারিত থাকবে আর সিংহাসনের ডান পার্শ্বে থাকবে আমার চার পুত্র ও পুত্র বধূগণ। অতএব, তোমরা সেভাবে প্রস্তুত হয়ে দরবারে উপস্থিত থাকবে। বুড়ো রাজার এমন কথা শুনে তিন রাজকুমার মহাখুশী হলো কারণ তাদের বঁউরা ছিল অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু ছোট কুমার! ছোট কুমারের বউতো বানরী। তাই সে আবারও মলিন মুখে ঘরে ফিরে গেল। তিন রাজকুমারও তাদের বউরা ভাবলো আর যাই হোক এবার ছোট কুমার জিতেব পারবেনা। ছোট কুমার অপমানিত হবেই হবে। ছোট কুমারকে মলিন মুখে ঘরে ফিরতে দেখে বানরী জানতে চাইলো, কি ব্যাপার আবার মলিন মুখ কেন? ছোট কুমার বললো, আগামীকাল রাজপূণ্যাহ হবে। সেখানে দেশ বিদেশের রাজা মহারাজা উপস্থিত থাকবেন। বাবা বলেছেন, আমরা চার ভাই ও চার পুত্রবধূ যেন দরবারে উপস্থিত থাকে। আমার বৌদিরাতো অপরূপ সুন্দরী সবার দৃষ্টি তারা কেড়ে নেবে। তুমিতো বনের পশু, বানরী। আমি তোমাকে নিয়ে কীভাবে দরবারে যাবো? এবার আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন গতি নেই। ছোট কুমারের কথা শুনে বানরী বললো ও এই কথা। তাতে তোমার আত্মহত্যা করার তো কোন কারণ দেখছিনা। আগামীকালের সকাল হোক তখন দেখা যাবে। তবে হ্যাঁ। তুমি আজ আমাকে ঘরে, আমার সাথে শোবে। এ কথা যেন অন্যথা না হয়। অগত্যা ছোট কুমার কি আর করবে। বানরীর কক্ষে গিয়ে বানরীর সাথে এক বিছানায় শুয়ে পড়লো। কিন্তু শুয়ে পড়লে কি হবে? বানরের সাথে কি শোয়া যায়? তার শরীর গিন্ গিন্ করতে লাগলো। মাঝ রাত হলে পর, বানরী ছোট কুমারকে ডেকে তুললো। আর বললো, আমাকে তোমার আর ঘৃণা করার প্রয়োজন হবে না। আমি হিমালয় রাজ্যের রাজকন্যা। এক তান্ত্রিক যাদুকর আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেম নিবেদন করেছিল। আমি তান্ত্রিক যাদুর প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় সে আমাকে যাদু মন্ত্র বলে বানরী বানিয়ে গিয়েছিল তিন বছরের জন্য। আজ তার তিন বছর পূর্ণ হয়েছে। আমি এখন সম্পূর্ণ মানবী। তুমি একটু সাহায্য করো। আমার দেহ থেকে বানরের চামড়াটি খুললে আমি মানবী হয়ে উঠবো। বানরীর কথায় ছোটকুমার তাড়াতাড়ি চামড়াটি খুলে দিল। আর অমনি বানরীরটি অপরূপা সুন্দরী মানবী রূপে আবির্ভূত হলো। রূপের আলোতে ঝলমল করে উঠলো সারা ঘর। ছোট কুমার অমন রূপসী ও

লক্ষ্মী বউ পেয়ে বার বার সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালো এবং নিজেকে বড়ই ভাগ্যবান মনে করলো।

পরদিন সকাল হলে পর, রাজ দরবার অনুষ্ঠিত হলো। দেশ বিদেশের রাজা মহারাজাদের আগমনী বার্তা বার বার বিউগলে ধ্বনিত হতে লাগলো। রাজ কুমারগণও বউদের নিয়ে দরবারে হাজির হলো। প্রথমে তিন রাজ কুমার বউদের নিয়ে একে একে দরবারে হাজির হলো। উপস্থিত জনতা বিপুল করতালি দিয়ে তাদেরকে সম্ভাষন জানালো। সবার শেষে দরবারে উপস্থিত হলো ছোট কুমার ও তার বউ। তাদের আগমনী বার্তা বিউগলে ঘোষিত হলো। রাজ্যশুদ্ধ লোকের কৌতুহল ছিল বানরীকে নিয়ে ছোট কুমার কেমন করে দরবারে উপস্থিত হয় তা দেখার জন্যে। কিন্তু ছোট কুমার যে মানবীকে নিয়ে দরবারে উপস্থিত হলো তা অপ্সরী কিন্নরীকেও হার মানায়। ছোট কুমার ও তার বউকে করতালি দিয়ে সম্ভাষণ জানানোর কথা ভুলে গিয়ে রাজ্যশুদ্ধ লোক হা করে চেয়ে রইলো। সবারই এক কথা, এমন কন্যা তারা জীবনে দেখাতো দূরের কথা, গাল গল্পেও শোনেনি। আমন্ত্রিত দেশ বিদেশের রাজা মহারাজারাও নিস্পালক চোখে তাকিয়ে রইলেন। শেষে ছোট কুমারের বউ সভা স্থলের নীরবতা ভেঙ্গে বললেন, পরম শ্রদ্ধেয় আমার শ্বশুর বাবা, মান্যবর আমন্ত্রিত রাজা রাজন্যবর্গ, এবং এ রাজ্যের পাত্রমিত্র অমার্ত্যবর্গ ও প্রাণপ্রিয় প্রজাবৃন্দ। আপনারা এতোদিন জানতেন যে, এ রাজ্যের ছোট কুমার ভাগ্যদোষে বনের জন্তু বানরীকে বিয়ে করেছিল। আজ আপনারা আমাকে দেশে আশ্চর্য্য হচ্ছেন এ ভেবে যে, বানরী কিভাবে মানবী হলো? সত্যি কথা হলো এই, এক তান্ত্রিক যাদুকর আমাকে যাদু বলে বানরীরূপে রূপান্তর করে অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিল। এর মেয়াদ ছিল তিন বছর। কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো ছিল যে, ছোট কুমারের তীর আমার কাছে গিয়ে পড়েছিল বলে তার সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল। গতকাল আমার অভিশাপের কাল শেষ হয়। ফলে আমি পূর্ণ মানবী রূপ ফিরে পেয়েছি। আমি হিমালয় রাজার কন্যা চন্দ্রাবতি।

চন্দ্রাবতি নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমন্ত্রিত রাজা রাজন্যবর্গ চমকে উঠলেন। সে কারণ রাজ কুমারী চন্দ্রাবতির রূপের খ্যাতি তারাও শুনেছিল নানাভাবে। সে চন্দ্রাবতিকে চাক্ষুষ দেখতে পেয়ে তারা অতিশয় পুলকিত হয়ে অভিবাদন জানালো।

ছোট কুমারের ভাগ্য প্রসন্ন হলো। বুড়ো রাজা ছোট কুমার ও তার বউয়ের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে বানপ্রস্থ হলেন। চারিদিকে একথা ছড়িয়ে পড়লো। আর সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

বীর জ্যোতিষী

সে অনেক দিন আগের কথা। তখন পরাসুত নামে এক মহারাজা ত্রিপুরা রাজ্যে রাজত্ব করতেন। মহারাজা ছিলেন অতিশয় ধার্মিক ও দানবীর। ত্রিপুরা রাজদরবারে প্রতিদিন সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির, ভিক্ষু, ওঝা, পুরোহিত, গনক, জ্যোতিষী, বিদ্বান, বিচক্ষণ সব ধরনের লোকের খুব আনাগোনা হতো। ত্রিপুরা মহারাজা পরাসুত তাঁদের সম্মান দিতেন আর পুরস্কৃত করতেন। একদিন এক জ্যোতিষী মহারাজার দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। মহারাজাকে কুর্নিশ করে বললেন, মহারাজ, আমি আপনার রাজ্যের বর্ষফল ও ভাগ্য গণনা করতে এসেছি। আপনি অনুমতি দিলে আপনার রাজ্যের প্রজাসাধারণের ভাগ্য ও রাজ্যের বর্ষফল সম্পর্কে আমি অবহিত করতে পারি।

জ্যোতিষীর আর্জি শুনে মহারাজা পরাসুত উত্তর দিলেন, "অতি উত্তম হে জ্যোতিষী, আপনি নিঃসংকোচে আমার রাজ্যের ভূত ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারেন। এতে আমি খুশী হবো।"

ত্রিপুরা মহারাজার অনুমতি পেয়ে আগন্তুক জ্যোতিষী নিখুঁতভাবে গণনা কাজ সম্পন্ন করলেন। মহারাজা খুশী হয়ে জ্যোতিষীকে রাজকীয় খাবার চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় সব ধরনের খাদ্য খেতে দিলেন আর উপহার স্বরূপ একটি ঘোড়া ও একটি চাবুক দিলেন।

রাজখানা ও উপহার পেয়ে জ্যোতিষী অতিশয় হৃষ্ঠ চিত্তে নিজ বাড়ী অভিমুখে রওনা দিলেন। কিন্তু রাজ খানা গলা পর্যন্ত খেয়ে আসার কারণে পথে তার পায়খানার বেগ প্রবল হল। বনপথে ঘোড়া থামিয়ে জ্যোতিষী পায়খানা করতে গেল ঝোপের আড়ালে। জ্যোতিষী এত ভীষণ করে মলত্যাগ করলো যে, ঘোড়াটি ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। জ্যোতিষী এদিক সেদিক খুঁজে দেখলো কিন্তু কোথাও হুদিশ পেলো না। এদিকে সন্ধ্যাও নেমে আসলো। জ্যোতিষী বনের মাঝপথে আটকা পড়ল। আশেপাশে কোথাও লোকালয় ছিলনা। চারিদিকে বনজঙ্গল, পাহাড় পার্বত, ছড়া নদী আর হিংস্র জীব জন্তুর আনাগোনা জ্যোতিষী নিজকে স্থির করল। বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে নিজকে রক্ষা করার জন্য চাবুক হাতে নিয়ে একটি ঝোঁপের আড়ালে আশ্রয় নিল। রাত গভীর হতেই সেখানে এক বাঘ এসে হাজির। বাঘ এসেছিল মানুষের গন্ধ পেয়ে। শিকারের আশায়। এদিকে জ্যোতিষী রাতের অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে ঘোড়া ভেবে এক লাফে বাঘের পীঠে চড়ে বসল আর চাবুক মেরে বললো, চল রাজবাড়ী চল। বাঘের জীবনে এমন বিশ্রী ঘটনা কখনো ঘটেনি। জান বাঁচাতে সে এলোপাতারি

ছুটে পালালো। এদিকে জ্যোতিষীও বুঝলো যার পিঠে সে চড়েছে তা ঘোড়া নয়। তারও বিপদ ভারী। সে বাঘের পিঠের উপর সজোরে আর এক চাবুক মেরে এক লাফে নেমে গেল।

আতঙ্কগ্রস্ত বাঘ ছুটতে ছুটতে অনেক দূরে গিয়ে থামলো। আপদ গেছে ভেবে ক্লান্ত শরীরে এক গাছের তলে শুয়ে বিশ্রায় নিল। সেখানে সে অন্য একটি বাঘের সাক্ষাৎ ঘটে গেল। দ্বিতীয় বাঘটি জানতে চাইল কেন প্রথম বাঘটির এমন দশা হলো। প্রথম বাঘ দ্বিতীয় বাঘকে সব কথা খুলে বললো। এতে দ্বিতীয় বাঘ প্রথম বাঘকে কুলাঙ্গার বলে তিরস্কার করলো আর স্বজাতির অপমানে প্রতিশোধ নিতে ছুটে গেল।

এদিকে গভীর রাতের অন্ধকারে জ্যোতিষী ভয়ে আতঙ্কে ঝোঁপের আড়ালে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলো। দ্বিতীয় বাঘ প্রতিশোধের নেশায় চোখ বড় বড় করে অগ্রসর হলো। একেতো রাতের অন্ধকারে বাঘের চোখকে তীব্র দেখায়। জ্যোতিষী কোন রকম সাহস সঞ্চয় করে দ্বিতীয় বাঘকে প্রচন্ড জোরে চাবুক মারলো। আচমকা চাবুকের আক্রমণে দ্বিতীয় বাঘটি প্রতিশোধ নেয়ার তো দূরের কথা প্রাণ নিয়ে বায়ুবেগে পালালো এবং প্রথম বাঘের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশ্রী ঘটনার কথা বর্ণনা করলো।

রাগে, ক্ষোভে অপমানিত হয়ে দুই বাঘ মিলে নীরবে পথ চলছিলো তখন দেখা পেল বানরের। বানরের সাথে বাঘ দু'টোর কথাবার্তা হল। বানর সমবেদনা জানিয়ে বললো চলো আমরা তিনজন মিলে প্রতিশোধ গ্রহণ করি। তিন বন্ধু মিলে ফের প্রতিশোধ নিতে আবারও অগ্রসর হলো।

জ্যোতিষী ভাবলো প্রাণে বাঁচতে হলে তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে। সে প্রানপণে একটি বড় গাছের উপর চড়ে বসলো। গাছের উপর উঠে জ্যোতিষী দেখতে পেল ডালের গোড়ায় একটি কোটর। সে কোটরে ঢুকে কোন রকমে নিজকে লুকিয়ে রাখলো। দুই বাঘ ও এক বানর এসে দেখলো কেউ কোথাও নেই। তারা রেগে গজ্ গজ্ করতে লাগলো। বানরটি দুই বাঘকে নীচে পাহারায় রেখে গাছের ডালে ডালে বিচরণ করে শত্রুকে খুঁজতে লাগল।

এদিকে জ্যোতিষী শত্রুর আগমণ পূর্বাভাস পেয়ে শক্ত হাতে চাবুক ধরে কোটরে চুপ করে রইলো। বানরটি এ ডাল থেকে ও ডালে বিচরণ করতে করতে যেই জ্যোতিষীর কাছে এসে পৌঁছলো অমনি জ্যোতিষী সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বানরের মুখের উপর দু'ঘা চাবুক বসিয়ে দিল। আচমকাভাবে চাবুকের আঘাত পেয়ে বানরটি গাছ থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়ে গেল।

বাঘ ও বানর শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নিতে না পেরে স্ব-স্ব রাজার কাছে ঘটনাটি

জানালো। বাঘ ও বানর মিলে সভা করলো। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এই মুল্লুকে বাস করা তাদের জন্য নিরাপদ নয়। মুল্লুক ত্যাগ করার আগে সবাই মিলেমিশে প্রীতিভোজ খাবে। দায়িত্ব বন্টন করা হলো। বাঘেরা জোগার করবে হরিণ ও শুয়োরের মাংস। বানরেরা যোগার করবে ফল, মূল, পাতা লাকড়ি ইত্যাদি। সব কিছু আয়োজন করা হলো। রান্নাও শেষ হলো। শুধু খাওয়ার কাজটা বাকী। এমন সময় একদল কাঠুরিয়া ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা গহীন অরণ্যে বাঘ ও বানরের উপস্থিতি টের পেলো এবং মাংস রান্নার গন্ধ পেল। গন্ধ কোথা থেকে ভেসে আসছে অনুসন্ধান করতে করতে তারা জ্যোতিষীকে গাছের কোটরে দেখতে পেলো। ভয়ে, আতঙ্কে ও অনাহারে জ্যোতিষী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জ্যোতিষীর কাছে কাঠুরিয়াগণ সব কথা জানতে পারল। তারপর লাঠিসোটা নিয়ে বাঘ ও বানরের উপর আক্রমণ চালালো। আচমকা আক্রমণে বাঘ ও বানর দল দিশাহারা হয়ে যে যেদিকে পারলো পড়ি কি মরি করে মুল্লুক ছেড়ে চলে গেলো। অদুরে ছিল গোমতী নদী। নদীতে ছিল অসংখ্য নৌকা, ভেলা আর বোড়। বাঘ ও বানরদল গোমতী নদীর মায়া ত্যাগ করে আরাকান মুল্লুকে চলে গেল। শুধু পালাতে পারলোনা গর্ভবতী এক বানরী ও এক বাঘিনী। তারা গোমতী নদীর পাহাড় কন্দরে লুকিয়ে জীবন রক্ষা করলো। প্রাণে বেঁচে থাকা বানরী ও বাঘিনীর সন্তানেরাই ত্রিপুরা রাজ্যে বংশবিস্তার করেছিল। উক্ত ঘটনার পর বহু বছর যাবৎ নাকি ত্রিপুরা রাজ্যে বাঘ বানরের উপদ্রব ছিল না। বাঘের উপদ্রব না থাকায় গৃহস্থের গরু ছাগল হাঁস মুরগী দিবা রাত্রি যত্রতত্র বিচরণ করতে পারতো আর বানরের উপদ্রব না থাকায় জুমিয়াদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হতো না।

ছাতিম গাছ

অনেক অনেক দিন আগের কথা। সবুজ শ্যামল পাহাড় পর্বত নদী ঝর্ণায় পরিপুষ্ট ত্রিপুরা রাজ্যের উণকোটি পর্বতের পাদদেশে বাস করতো এক জুমিয়া। জুমিয়া পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ জন। বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। বিধিবাম, এমন সুখের সংসারে কিনা দুঃখের বোঝা নেমে এলো একদিন।

একদিন জুমিয়ার পুত্র কন্যা জুমে গিয়েছিল। জুম ক্ষেতে চিনার, মারফা, সীম, কুমড়া ধরেছে তা সংগ্রহ করার জন্য ভাইবোন দু'জনে মিলে গিয়েছিল। দু'জনই উঠতি বয়সের যুবক যুবতী। জুমে যাবার পথে ছোট বোনটা আগে আগে যাচ্ছিল আর বড় ভাইটা ছিল অনেক পেছনে। পথে ছিল একটা ছড়া নদী। ছড়া নদীটা পার হয়ে গেলেই তাদের জুম ক্ষেত।

ছোট বোনটা ভাবল বড় ভাই যেহেতু দুরে পেছনে রয়েছে তাই সে আগে ভাগে ছড়া নদীটা পার হয়ে যাবে। এ ভেবে সে হাঁটু পর্যন্ত পরনের কাপড় তুলে নদী পার হলো। বড় ভাইটা ছিলো পেছনে। সে ছোট বোনের অনাবৃত ফর্সা পা দু'খানি দেখে ফেললো। আর তাতেই কাম প্রবৃত্তি জেগে উঠলো। ছোট বোনকে বিয়ে করতে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসলো।

জুমে ক্ষেত থেকে বাড়ীতে ফিরে আসার পর বড় ভাইটি কেমন যেন নীরব নিথর হয়ে থাকলো। ছেলের এ অবস্থা দেখে জুমিয়া ও তার বউ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। চারটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্র ছেলে, চোখের মনি কেন এমন হলো সবাই ভাবতে লাগলো। বৈদ্য ডেকে আনা হলো। না কোন রোগ ব্যাধি নেই। ভূত প্রেত ধরেছে কিনা দেখার জন্য ওঝা ডেকে আনা হলো। ওঝা সব কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললো, কোন ভূত প্রেতের আছর নেই। বৈদ্য ওঝা চলে গেলো। ছেলেটি নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে বিছানায় পড়ে রইলো। এভাবে তার শরীরের অবস্থা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হতে লাগলো। খবর পেয়ে পাড়া পড়শীরা দলে দলে এসে দেখে যেতে লাগলো আর সবাই হায় হায় করতে লাগলো। এমন সুন্দর সুঠাম ছেলে সে কিনা তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটার করুন অবস্থা দেখে সবাই নিরবে চোখের পানি ফেলতে লাগলো।

নাতিনের করুণ অবস্থা দেখে বৃদ্ধা দাদী শিয়রে বসে কাঁদতে লাগলো। আর বিড় বিড় করে বলতে লাগলো। আমি বড়ই দুর্ভাগা নারী। সবার আগে মরে যাবার কথা। অথচ মরছি না। শেষকালে নাতির মরা মুখ আমাকে দেখতে যেতে হবে। এমন পাপিষ্ঠ এ জগতে আর কে আছে। বৃদ্ধা কাঁদছে আর বিড় বিড় করে নাতির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বৃদ্ধা ভাবলো লোকাচার মতে মৃত্যু পথের যাত্রীর

মনের শেষ ইচ্ছা জেনে নিতে হয়। তাই সে নাতিকে জিজ্ঞেস করলো "ও দাদু ভাই, ও সোনা তুমি অমন করে নিজকে শেষ করো না। তোমার যদি কোন কামনা বাসনা থাকে তা হলে আমাকে বলো। আমরা চেষ্টা করবো তোমার বাসনা পূরণ করতে। তুমি বলো বলো। আমরা বাসনা জানতে চাই।

বৃদ্ধা দাদীর কথা শুনে নাতি আস্তে আস্তে চোখ খুলে একবার দাদীর মুখের দিকে তাকালো। তারপর দাদীর কানে ফিস্ ফিস্ করে বললো "দাদী আমি ছোট বোনকে বিয়ে করতে চাই। যদি আমি ছোট বোনকে না পাই তাহলে আমি এভাবে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে মরে যাবো। ছোট বোনকে বউ হিসাবে না পেয়ে আমি মরে যাবো। আমি আত্মহত্যা করবো। এই আমার প্রতিজ্ঞা, এই আমার বাসনা, এই আমার শেষ কথা। নাতির কথা শুনে বৃদ্ধা দাদীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। বৃদ্ধা এবার বুঝতে পারলো তার নাতির আসল রোগ। বৃদ্ধা নাতিকে বোঝালো দাদু, তা হয় না, তোমার বাসনা দেশাচার বিরুদ্ধ, শাস্ত্র বিরুদ্ধ, ধর্মাচার লোকাচার বিরুদ্ধ। লোকে জানলে সবাই ছিঃ ছিঃ করবে। তোমাকে সমাজচ্যুত করবে। পাপী কুলাঙ্গার বলে গালি দেবে। জ্যান্ত মেরে ফেলবে। তুমি এমন পাপ কর্মের প্রতিজ্ঞা করোনা। পাড়া প্রতিবেশীতে অনেক সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে রয়েছে। যাকে তোমার পছন্দ হয় তুমি নির্বাচন করে দিও। আমরা যেমন করেই হোক তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করবো। কিন্তু দাদু ছোট বোনকে বিয়ে করার বাসনা ত্যাগ করো। ভাগ্যিস আমি একা জেনেছি, তা না হলে সমাজে থাকা দায় হতো। আর যদি তোমার ছোট বোনটা জানতে পারে তা হলে সে লজ্জায়, অপমানে আত্মহত্যা করতো। দাদু, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করো। তোমার দিব্যি রইল।

দাদীর এত কথা বোঝানোর পরও নাতি তার মত পরিবর্তন করলোনা। তার এক কথা ছোট বোনকে সে বিয়ে করবেই। আর বিয়ে করতে না পারলে সে ক্ষয়ে ক্ষয়ে আত্মহত্যা করবে। নাতিকে কিছুতেই বোঝাতে না পেরে তার বৃদ্ধা ছেলে ও ছেলের বউকে ডেকে একান্ত গোপনে নাতির কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করলো। এমন অনাচার ও অসামাজিক প্রতিজ্ঞাটি যাতে কেউ জানতে না পারে তা যথাসম্ভব গোপন রাখার ব্যবস্থা করা হলো। নাতির মত পরিবর্তন হতে পারে এ কথা মাথায় রেখে বৃদ্ধা দাদী রাজী হয়ে নাতিকে বললো, ওরে ও লক্ষী দাদু আমার প্রাণের প্রাণ, তুমি অবশ্যই ছোট বোনকে বিয়ে করবে। তবে এখন নয়। আর ছয়মাস পর প্রকৃতিতে যখন বসন্তে হাওয়া বইবে, গাছে গাছে যখন ফুল ফুটবে, শিমূল পলাশের ডালে পাখীকুল যখন গান করবে, কোকিলের গানে যখন চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠবে সেই ফাল্গুন মাসে তোমার বিয়ে হবে। এখন তুমি স্বাভাবিক হও, খাও দাও, কাজ কর্ম করো। বৃদ্ধা দাদীর কথা শুনে নাতি বেটা

বিছানা থেকে উঠে গেলো। গোপন কথাটি বৃদ্ধা, ছেলে ও ছেলের বউয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো। ছোট বোন ঘুর্ণাক্ষরেও কিছুই জানতে পারলো না।

কয়েক মাস পরেই জুমের ধান পাকতে শুরু করলো। সোনালী আভা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। জুমিয়ারা হৈয়া হৈয়া আনন্দ ধ্বনি তুলে একে অপরকে আহ্বান করে নতুন ধান ঘরে তোলার কাজে ব্যস্ত রইল। নাতি এখন স্বাভাবিক হয়ে কাজে মগ্ন। অপরদিকে নাতনীও ঘরের কাজে ব্যস্ত। বৃদ্ধা দাদী ঘরের উঠানে তলই বিছিয়ে নতুন ধান শুকাচ্ছিল। এমন সময় ঘরের মোরগটা বার বার এসে ধান খেয়ে যাচ্ছিল। বৃদ্ধা দাদী একটা লম্বা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তাড়লেও মোরগটা কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এসে ধান খেতো। বারবার মোরগ তাড়াতে গিয়ে বৃদ্ধা দাদী বিরক্ত হয়ে গালি দিল। ওহে মোরগ, তুই আর কত জ্বালাতন করবি। আমার নাতির সঙ্গে নাতিনীর যেদিন বিয়ে হবে তখন তোমাকে জবাই করতে বলবো। বৃদ্ধা দাদী যখন রেগে গিয়ে মোরগটাকে গালি দিচ্ছিল তখন অদুরে কাজে ব্যস্ত ছিল নাতনী। আসলে মুখ ফসকে গিয়ে বৃদ্ধার মুখ দিয়ে গোপন কথা বেরিয়েছিল। দাদীর মুখে এমন কথা শুনে নাতনী বিদ্যুৎ বেগে দাদীকে ঝাকুনী দিয়ে এ কথার অর্থ জানতে চাইল। দাদী পড়ে গেলো মহাবিপদে। অগত্যা কি আর করবে। সত্য কথাটাই বলে ফেললো। দাদীর মুখে সব শুনে নাতনী বাকরুদ্ধ হয়ে হিম হয়ে রইল। কি কুলক্ষণের কথা। এ কথা শোনার আগে তার মরণ হওয়া উচিত ছিল।

গ্রামের দক্ষিণ মাথায় বাস করতো এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। নাতনী সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কাছে ছুটে গিয়ে প্রার্থনা করলো, হে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, আমার মা বাবা আমাকে বড় ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিতে মনস্থ করেছে। এমন পাপ ও অনাচার আমি সহ্য করবো না। আমি মৃত্যু কামনা করছি। আমি আত্মহত্যা করতে চাই। আত্মহত্যা করার পথ বলে দিন। আমি চির ঋণী থাকবো। তখন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নাতনীর প্রবল আকুতি দেখে বললো, ওগো নাতনী আত্মহত্যা করা মহাপাপ। তার চেয়ে তোমাকে একটা পথ বাতলে দিতে পারি। আমার কাজটি যদি করতে পারো তা হলে তোমার আত্মহত্যা করা লাগবে না। তুমি মেঘের রাজ্যে গিয়ে বসবাস করতে পারবে। আমার কথা মনযোগ দিয়ে শোনো। ছড়ার ধারের কাছে কোথাও ছাতিম গাছ আছে কি না দেখো। যদি খুঁজে পাও তাহলে পান সুপারী দিয়ে গাছের গোড়ায় ভেট দিও। ধূপ দীপ দিও। তারপর তোমার বিপদের কথা বয়ান করে তার সাহায্য কামনা করো। ছাতিম গাছই তোমাকে বড় ভাইয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে। তোমাকে আমি মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। মনযোগ সহকারে শোনো আর অর্চ্চনা করো।

মন্ত্র ঃ চেতুয়াং ঐ চেতুয়াং
আং ননো ভজে ফাইয়ো

দাদা বাই আনো কাই নানি হিনো
নং আনো ফিয়ফদি
তর চেতুয়াং তক
লক চেতুয়াং লক ॥

মর্মার্থ ঃ হে মহান ছাতিম গাছ, আমি অভাগিনী তোমায় ভজনা করছি। বড় ভাইয়ের সাথে আমার বিয়ে হচ্ছে। আমাকে তুমি পরিত্রাণ করো। তুমি দ্রুত বড় হও। তুমি দ্রুত বড় হও। তুমি দ্রুত লম্বা হও। আমাকে মেঘের রাজ্যে পৌঁছে দাও।

তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কথা মতে নাতনী অনেক খোঁজাখুজির পর ছড়ার ধারে একটা ছাতিম গাছ খুঁজে পেল। তারপর যথাযথ ভেট দিয়ে অর্চ্চনা করতে লাগলো। দেখতে দেখতে সত্যি সত্যিই ছাতিম গাছ বড় ও লম্বা হতে লাগলো। নাতনী অবিরাম ভাবেই অর্চ্চনা করে চললো। অবিশ্বাস্য এ কথা জানাজানি হতেই বহু লোক সমবেত হয়ে এ দৃশ্য দেখতে লাগলো। সবাই নাতনীর প্রতি সমবেদনা জানাতে লাগলো আর বড় ভাইকে অভিশাপ আর ধিক্কার দিতে লাগলো। ছাতিম গাছ বড় হতেই নাতনী সে গাছে চড়ে বসলো।

এদিকে বড় ভাই খবর পেয়ে তড়িৎ গতিতে ছুটে এলো। এসে দেখে ছোট বোন ছাতিম গাছের শিখরে বসে অর্চ্চনা করছে। বোনকে হারাতে যাচ্ছে দেখে সেও নিলর্জ্জভাবে গাছে গিয়ে উঠলো। নাতনীর কাতর অর্চ্চনায় ছাতিম তর তর করে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো এবং মেঘের রাজ্যে পৌঁছে দিল। আর বললো হে নাতনী তুমি এখন বিপদ মুক্ত। মেঘের রাজ্যে চলে যাও। যাবার সময় আমার মাথা ভেঙ্গে দিয়ে যাও, যাতে তোমার লম্পট দাদা মেঘের রাজ্যের নাগাল না পায়।

নাতনী ছাতিম গাছের মাথা ভেঙ্গে দিয়ে মেঘের রাজ্যে গিয়েছিল বলে ছাতিম গাছের কোন মাথা নেই। মাথায় ভাঙ্গার কারণে বড় ভাই বোনের নাগাল পেলনা। বোন মেঘের রাজ্য থেকে বড় ভাইকে অভিশাপ দিল, হে লম্পট, পামর, দুরাচার দাদা, তুই কখনও আমাকে পাবি না। আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, জন্ম জন্মান্তরে তুই কাকলাস (চাতক) হয়ে থাকবি। বর্ষাকালে যখন মেঘের রাজ্য উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠবে তখন আমি আমার পরণের খুলে তোমাকে দেখাবো। তখন তুমি অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। বড় ভাইকে অভিশাপ দিয়ে ছোট বোন মেঘের রাজ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাই বলা হয়ে থাকে বর্ষাকালে যখন মেঘ গর্জন করে তখন বিজলী চমকায়। এই বিজলী চমকানো নাকি ছোট বোনের পরনের কাপড় খোলার দৃশ্য। আর চাতকরূপী বড় ভাই নাকি তা একদৃষ্টিতে অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।